সমুদ্র

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

আমাদের উদ্দেশ্য মানুষকে ভাবতে শিখানো।

আমাদের আদর্শ- বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চা।

আমাদের সাথে যোগাযোগের উপায়

ফেসবুক গ্রুপ:

https://www.facebook.com/groups/bcb.science/

ইনস্টাগ্রাম:

http://www.instagram.com/bcb_science

টুইটার: http://www.twitter.com/bcb_science

ওয়েবসাইট: bit.ly/bcb_science

ই-মেইল: editor@bcbiggan.com

সেপ্টেম্বর ২০২০ ।। ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭

প্রথম বর্ষ ।। সংখ্যা ০৫

সম্পাদক: প্রজেশ দত্ত

সহ-সম্পাদক: টিম ব্যাঙাচি

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দেশক: সমুদ্র জিত সাহা

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী

ডিজাইন এবং লে-আউট: প্রজেশ দত্ত, রায়হান

প্রচ্ছদ অঙ্কন: মেহরাব সাবিত সিদ্দিকী

আপনিও চাইলে যোগদান করতে পারেন আমাদের টিমের সাথে, কাজ করতে পারেন ব্যাঙাচির হয়ে। ব্যাঙাচির হয়ে কাজ করতে চাইলে যোগাযোগ করুন ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানের ঠিকানায় বা সম্পাদক-প্রকাশকদের সাথে।

এছাড়া ম্যাগাজিনের জন্য লেখা পাঠাতে চাইলে ব্যবহার করুন নিচের ঠিকানাঃ

ইমেইলঃ editor@bcbiggan.com

বাঁচতে হলে ভাবতে হবে

সম্পাদকীয়

ব্যাঙাচি

সারা রাত বাস জার্নি, তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা, তারপর স্টিমারে ২-৩ ঘণ্টা কাটানোর পর যখন সেন্টমার্টিনে এলাম ট্যুরের শখ তখন অনেকখানি মিটে গেছে। জাহাজ যখন জেটিতে নামল তখন মেজাজ আরও খারাপ হলো। মারাত্মক গরম, এক চিলতে ছোট্ট একটা সমুদ্র, মায়ানমার দেখাই যায়, তার ওপর সব কুলি আর মাঝি চিল্লাচিল্লি করে সদরঘাটের মতো পরিবেশ তৈরি করেছে। বিরক্ত হয়ে হোটেলে গিয়ে সোজা ঘুম দিলাম। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, আমার ঘুমও ভাঙল। একটা রিকশা নিয়ে পিছনের বিচটাতে গেলাম। ততক্ষণে সৌন্দর্যের মেলা বসেছে প্রবাল দ্বীপটাতে : বিরাট বিরাট প্রবালের ব্রিজে উপচে পড়ছে ঢেউ, আকাশ ছেয়ে গেছে বর্ষার মেঘে, আর সেই মেঘের ফাঁকে উঁকি মারছে ডুবন্ত সূর্য। হুহু করে বাতাস বইছে, প্রবালের ব্রিজে বাতাসে হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্লাসমেইট ও কপোত কপোতীরা।

সেন্টমার্টিনে জীবনের প্রথম রাত আমার কাছে স্বপ্নের মতো। সেই সময় রাতে বিচের ওপর হাঁটলে পায়ের ছাপের ওপর পড়ে থাকত আমার ট্রেইল। চালের সাইজের গোল গোল একেকটা কণা বালুর ওপর ঝিকমিক করে জ্বলত। সেই আলোর ট্রেইল পিছনে রেখে, ২ জন ক্লাসমেইটসহ আমরা হেঁটে গেলাম পিছনের বিচ থেকে সামনের বিচে। ততক্ষণে মেঘ কেটে গেছে, হুহু করে বাতাস বইছে, রাতের আকাশে ঝলমল করছে কোটি কোটি তারা। আর কিছুক্ষণ পরপর দূরে সাগরের বুকে আছড়ে পড়ছে রকেটের মতো উল্কা।

রাত ১১টার দিকে একেবারে কমলার কোয়ার মতো কমলা রঙের একটা চাঁদ উঠল। তার আবছা আলোয় ধোঁয়াটে হয়ে উঠল রাতের সাগর। দূরে, বহুদূরে পাল তোলা ভাঙা জাহাজের মতো কী জানি একটা নড়ে উঠল। সেই কমলার মতো চাঁদ, আলোর ধোঁয়াশা, ভূতুড়ে ভাঙা জাহাজ আর বাতাসে উথাল পাথাল ঢেউ আমাকে নিয়ে গেল অন্য এক রাতে। যে রাতে স্ট্রোন্সে বিস্টের ৫৫ ফুট লম্বা পচা গলা লাশ স্কটল্যান্ডের কোনো এক দ্বীপের সমুদ্রতীরে ভেসে উঠেছিল, সেই রাতে। যে রাতে, কোনো এক অজানা কারণে ম্যারি কেলেস্টের ১০ জন যাত্রী ভূতুরে জাহাজটা ছেড়ে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়, সেই রাতে। যে রাতে জে. ডি. স্টারকি ৫৩ মিটার লম্বা ক্র্যাকেন সাইজের স্কুইড দেখার দাবি তুলেছিলেন, সেই রাতে।

চলুন ডুব দিয়ে আসি ওই কালো পানির আশ্চর্য রহস্যময় জগৎ থেকে।

-নাঈম হোসেন ফারুকী, প্রকাশক।

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা

টিম ব্যাঙাচি

বিশেষ কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া কখনোই আমরা সফল হতাম না দেশের প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক মাসিক ফ্রি ই-ম্যাগাজিন আপনাদের হাতে তুলে দিতে।

বানান সংশোধন ও সত্যতা যাচাই :

আবু রায়হান

নাবিলা তাসনিম

রাকিন শাহরিয়ার

এ আর মুবিন

রাহুল খান

সিলেকশন :

তাসনিম বিনতে সাইফ

নাসিম আহমেদ

জাহিদুর রহমান

মুস্তফা কামাল জাবেদ

জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ

সোহম চ্যাটার্জি

বানান সংশোধনে সহযোগী যোদ্ধা :

জাহিদুর রহমান

তাসনিম বিনতে সাইফ

আফীফাহ্ হক মীম

সব্যসাচী দাশ নির্ঝর

মোঃ মুশফিকুর রহমান

স্বপ্নীল জয়ধর

রাশেদা নাসরিন সুমনা

রওনক শাহরিয়ার আকাশ

সাকিব হোসেন

নাফিউল ফেরদৌস অরণ্য

রিজুফা জামান শোভা

আদিন নুর

সূচিপত্রঃ

সাগরের স্তরসমূহ

নাঈম হোসেন ফারুকী

সমুদ্রের সবচেয়ে ওপরের লেয়ারের নাম সানলিট জোন। পানির ওপর থেকে শুরু করে প্রায় ৬০০ ফুট (২০০ মিটার) পর্যন্ত জায়গা আলোর রাজ্য। সানলিট জোন হলো পুরো সমুদ্রের শক্তিঘর। হাজার হাজার পিচ্চি পিচ্চি ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন সূর্যের আলো থেকে শক্তি নিয়ে এখানে খাবার বানায় পুরা সমুদ্রবাসীর জন্য। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনদের খায় জুপ্ল্যাঙ্কটনরা, ছোট্ট ছোট্ট চিংড়ি, মাছের বাচ্চা, হাইড্রা আর প্রবালের ছানাপোনারা। তাদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে মাছের ঝাঁক। এই স্তরে তিমি থাকে, ডলফিন থাকে, প্রবাল থাকে, ও আমাদের পরিচিত প্রায় সব মাছ এখানে বাস করে।

২০০ থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতার নাম টোয়াইলাইট জোন। একদম ভোর রাতে সূর্য ওঠার আগে আগে আর সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার অনেকক্ষণ পর পৃথিবীতে যখন খুব অল্প আলো থাকে, সেই সময়টার নাম টোয়াইলাইট। নীল আলোর ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি, শক্তি তাই অনেক। একেবারে গাঢ় নীল আলো ছাড়া আর কোনো আলো এই স্তরে আসতে পারে না। মানুষের ডাইভিং রেকর্ড ৩৩২ মিটার, মোটামুটি একটা ১০০ তলা বিল্ডিংকে উলটা করে ডোবালে যা হবে তাই। এই গভীরতায় পানির চাপ ৩২ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান, এই প্রচণ্ড চাপে অক্সিজেনও রক্তে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই স্তরে ডাইভ দিয়ে বেঁচে ফিরে আসা মানুষদের তালিকা খুব ছোটো।

টোয়াইলাইট জোনে বাস করে ভূতুড়ে সব প্রাণী। তাদের কারো কারো বিশাল বিশাল চোখ, কেউ বা পুরাপুরি স্বচ্ছ, কেউ আলোর ঝলকানি দিয়ে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্ধকারের দুনিয়ায়। এই স্তরে খাবারের খুব অভাব তাই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ওপরের স্তরের বড়ো বড়ো দানবরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, খাবারের সন্ধানে ভূতের দল উঠে আসে টোয়াইলাইট জোন থেকে। তাদের গল্প আজকে না, সামনের কোনো পর্বে হবে।

আমাদের পরিচিত সাবমেরিনগুলোর সীমা টোয়াইলাইট জোন পর্যন্তই।

পানির ১০০০ থেকে ৪০০০ মিটার পর্যন্ত জায়গার নাম মিডনাইট জোন। দিনের আলোতেও সেখানে কুচকুচে কালো অন্ধকার। মধ্যরাতের দুনিয়া ক্ষুধার রাজ্য, শক্তির খুব অভাব সেখানে। দানবরা সেখানে বড়ো হয় খুব ধীরে ধীরে, বাঁচে অনেক দিন, নড়েচড়ে একেবারে আস্তে আস্তে, আর

খাবার কাছে এলে বিশাল বড়ো মুখ হা করে টুপ করে গিলে ফেলে। অস্বাভাবিক, পাগল করা পানির চাপ সেই দুনিয়ায়। ওখানে যারা থাকে তাদের শরীর হয় তরলে ভরা।

গভীর সমুদ্র খুব ঠান্ডা, তাপমাত্রা বরফের কাছাকাছি। আরও নামতে থাকলে, ৪০০০ থেকে ৬০০০ মিটার গভীরতায় আমরা এসে পৌঁছব

অ্যাবিসাল জোন এ। বেশিরভাগ গভীর সমুদ্রের তলা এই জায়গায়। এই দুনিয়ায় বাস করে ব্রেইনলেস

উদ্ভট সব দানব : নানান জাতের স্টারফিশ, টুনিকেইট, প্রোটোকর্ডাটা আর কিছু সাহসী মাছের

বাড়ি গভীর সমুদ্রের তলায়। এই জায়গায়, অনেক সময় দেখা যাবে সমুদ্রের নিচে ঘন ব্রাইনের লেক, থাকবে পৃথিবীর গভীর থেকে উঠে আসা মিথেইন

সিপ, আছে ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আর হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট। এই ভেন্টগুলোতে সূর্যের আলোর কোনোরকম সাহায্য ছাড়া কেমোসিন্থেসিস করে গড়ে উঠেছে নিজস্ব এক ইকোসিস্টেম। আজ থেকে সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে এমনই এক গভীর সমুদ্রের আগ্নেয়গিরির আশেপাশে জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম প্রাণের।

৬০০০ থেকে ১১০০০ মিটার হলো সমুদ্র খাদগুলোর গভীরতা। গ্রিক পুরাণ মতে, মাটির নিচে

আছে অন্ধকারের দুনিয়া, সেখানে রাজত্ব করে অমঙ্গল আর মৃত্যুর দেবতা হাডেস। হাডেসের নামে এই দুনিয়ার নাম হ্যাডাল জোন। এভারেস্ট পর্বতকে উলটা করে ডোবালেও এই স্তরের তলা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইখানে কী আছে আজকে আর না বলি, শুধু জেনে রাখি, এই পর্যন্ত যত মানুষ চাঁদে গিয়েছে তার চেয়ে অনেক কম মানুষ নেমেছে হ্যাডাল জোনে।

হাডেসের দুনিয়া পৃথিবীর শেষ রহস্যের জায়গাগুলোর একটা।
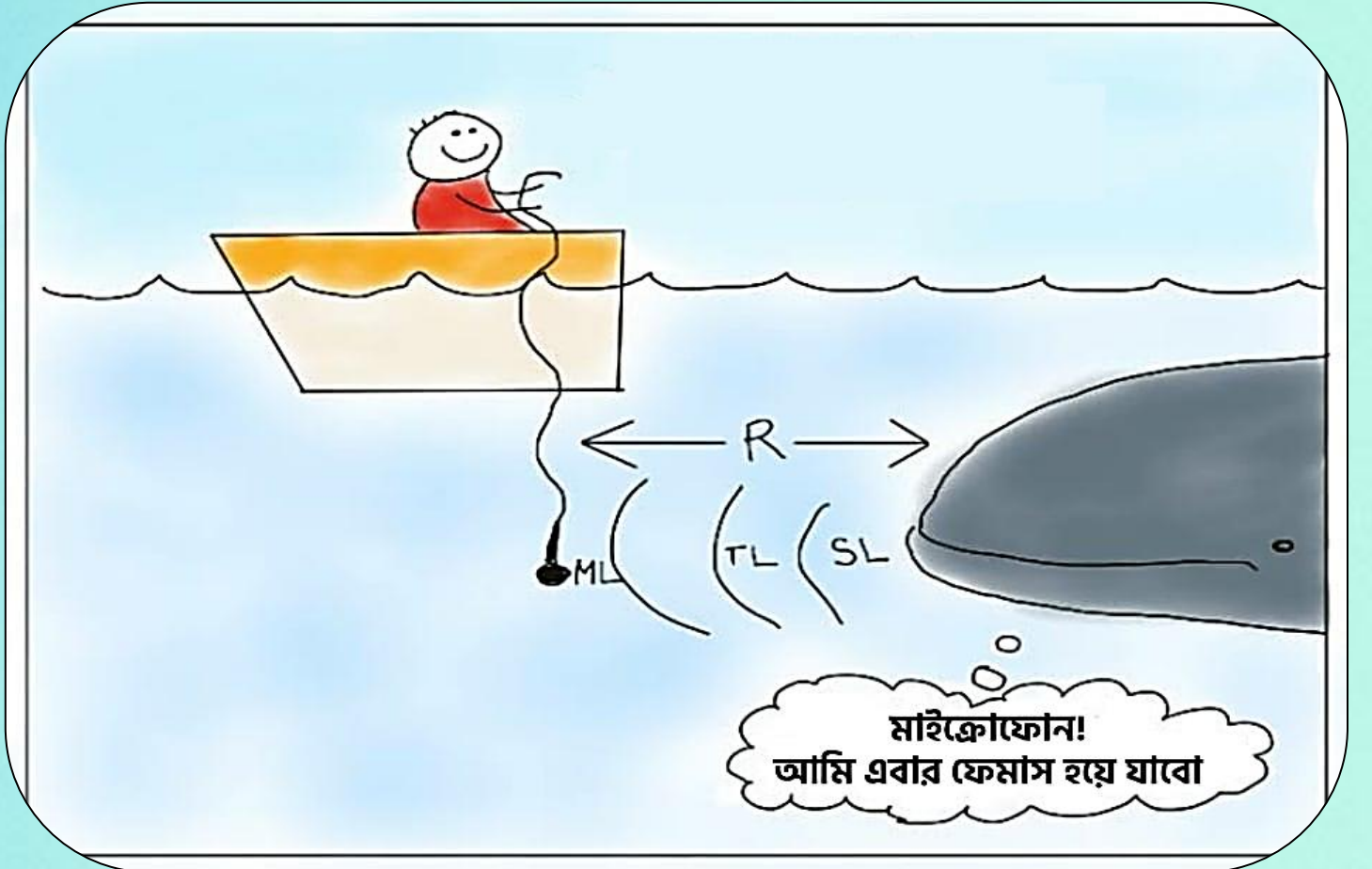
পর্তুগিজ ম্যান ও' ওয়ার

ইমদাদুল হক আফনান

এরা man-of-war, blue bottle, ভাসমান আতঙ্ক ইত্যাদি নামে পরিচিত। হাওয়াইয়ে এদেরকে 'ili mane'o, palalia ইত্যাদি নামে ডাকে। "Man o' war" নামটি এসেছে ১৮ শতকের "man-of-war" নামক যুদ্ধজাহাজের নামে। এদেরকে অ্যাটলান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের উষ্ণ ও প্রায় উষ্ণ পানিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক নাম Physalia physalis। এরা নিডারিয়া(Cnidaria) পর্বের, হাইড্রোজোয়া (Hydrozoa) শ্রেণির, সিফোনোফোরে (Siphonophorae) বর্গের, সিস্টোনেকটে (Cystonectae) উপ-বর্গের প্রাণী। এদের অনেকগুলো বিষাক্ত মাইক্রোস্কোপিক নেমাটোসিস্ট ওয়ালা কর্ষিকা (tentacles) থাকে। নেমাটোসিস্ট (nematocyst) হলো কাঁটাওয়ালা বা বিষাক্ত কুন্ডলী সুতার ন্যায় বিশেষ ধরণের কোষ। কর্ষিকা 10-30 m(প্রায় 30-100 feet) লম্বা হতে পারে। মরার পর বা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও কিছু ঘন্টা বা দিন অবধি কর্ষিকাগুলো সচল থাকে এবং জীবিত অবস্থার সমান ক্ষমতায় দংশন করতে পারে। এর বিষাক্ত দংশন বিভিন্ন প্রজাতির মাছকে প্যারালাইজড ও মারার জন্য যথেষ্ট এবং ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকেও মারতে সক্ষম। এরা কর্ষিকা ব্যবহার করে শিকারকে প্যারালাইজড করে ফেলে এবং ঘূর্ণনের মাধ্যমে পরিপাক করে নেয়। অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি গ্রীষ্মে প্রায় 10,000 মানুষকে দংশনের জন্য এরা দায়ী। সাধারণত দংশনের কারণে মানুষের চামড়ায় কশা-ঘাতের ন্যায় দাগ পড়ে যা সাধারণত 2/3 দিন স্থায়ী থাকে,অবশ্য ব্যথা 1-3 ঘন্টার মধ্যেই কমতে শুরু করে। তবে বিষ লিম্ফনোডে চলে গেলে এলার্জি, স্বরযন্ত্রের ফুলে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের ব্যথা, শ্বাস নিতে সমস্যা ইত্যাদি হতে পারে। এরা জেলিফিশের ন্যায় একক জীব থেকে ভিন্ন, কেননা এরা কলোনিয়াল জীব যারা বিভিন্ন বিশেষভাবে তবে জেনেটিক্যালি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অংশ দিয়ে গঠিত যাদের "zooids" বলে। এই "zooid" গুলা শারীরবৃত্তিকভাবে এত বেশি পরিসরে যুক্ত যে এরা এককভাবে বাঁচতেই পারে না। এরা অযৌন জননের মাধ্যমে ববংশবৃদ্ধি করে। এরা সক্রিয়ভাবে চলাচল করতে পারে না। বাতাসের ধাক্কায় বা ঢেউয়ের স্রোতে ভেসে বেড়ায়। এরা আবার Loggerhead turtle , Blanket Octopus, Blue sea slug "Glaucus atlanticus", Ocean Sunfish এর শিকারে পরিণত হয়।

টেলুরিয়াম বনাম সৈন্ধব প্রহেলিকা

মনিফ শাহ চৌধুরী

বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও পরিবেশবিদ পতামই নেপচুনের মাথায় চুলের সংখ্যা ও দুশ্চিন্তার পাহাড় একে অপরের ব্যস্তানুপাতিক। স্পয়লার : তার মাথা ভর্তি চুল নেই !

সারা জীবন লড়ে গেলেন পরিবেশের পক্ষে, কত কাঠখড় পোড়ালেন, এমনকি গ্রিন এনার্জি প্রমোট করতে যেয়ে নিজেই সোলার প্যানেল তৈরির কারখানা খুলে বসলেন, যাতে পরিবেশের ক্ষতি কমাতে কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারেন। তাহলে তার এত চিন্তা কীসের ?

সাধারণত মানুষ মনে করে সোলার শক্তি অত্যন্ত নিরীহ টাইপের এনার্জি সোর্স। পরিবেশের ক্ষতি করে না, কয়লার মতো কার্বন ছড়িয়ে বায়ুদূষণ করে না, প্রাণিজগতের ক্ষতি করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটু গভীরে গেলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়।

সোলার প্যানেল তৈরি করা হয় সিলিকন দিয়ে। তবে এটার নানান ঝামেলা আছে। প্রথমত, উৎপাদন খরচ বেশি, এরপর খুবই কম এফিসিয়েন্সি। তাই সিলিকনের বদলে টেলুরিয়াম ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে যা সিলিকন সোলার সেলের চাইলে অনেক গুণ বেশি কার্যকরী।

এই টেলুরিয়াম পাওয়া খুব দুষ্কর, অন্তত স্থলে। বিশাল বিশাল জায়গা খনন করতে হয়। কপার খনন করার সময় টেলুরিয়াম পাওয়া যায়। এই খননকাজ করার জন্য যে জায়গা বেছে নেওয়া হয় তার আশেপাশে লোকালয় থাকে, প্রাণিজগৎ থাকে, বনাঞ্চল থাকে। সেগুলো সরিয়ে ফেলতে হয়।

কিন্তু সম্প্রতি সমুদ্রের নিচে টেলুরিয়ামের খোঁজ পাওয়া গেছে যা স্থলের চাইতে ৫০,০০০ গুণ বেশি। অ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলে ছোটো ছোটো আলুর মতো পাথরের মাঝে এদের পাওয়া যায়। সমস্যা হচ্ছে সমুদ্রের এত নিচে এদের মাইন করার চেষ্টা ঢালাওভাবে কখনো করা হয়নি।

পতামই জানেন যে, সৌরশক্তির কার্যকর ব্যবহার করতে হলে ক্যাডমিয়াম-টেলুরিয়াম প্যানেলের বিকল্প নেই। এধরনের প্যানেল আলোর ৯০% শোষণ করতে পারে। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে

বড় বাধা এখন পর্যন্ত ছিল টেলুরিয়ামের দুষ্প্রাপ্যতা। তবে সমুদ্রতলে আবিষ্কৃত টেলুরিয়ামের আলুর খনি তার মতো ব্যবসায়ীদের জন্য সাত রাজার ধনের চেয়ে কম নয়।

গভীর সমুদ্রে মাইনিং করার উদ্দেশ্যে তিনি এক সুখ্যাত কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছেন। তারা তাকে বিশাল যন্ত্র তৈরি করে দেবে। কোম্পানির নাম Royal IHC Mining। কিন্তু যেহেতু তিনি একই সাথে পরিবেশযোদ্ধা, তাই তাকে ভাবতে হবে এই জায়গাগুলোতে খোঁড়াখুঁড়ি করলে কী সমস্যা দেখা দেবে প্রাণিবৈচিত্র্যে।

তিনি গ্রিন এনার্জি উপহার দিতে চান বিশ্বকে—তবে এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হাওয়া থেকে উদয় হয় না। হয় তাকে বিশাল বড়ো গর্ত করে স্থল থেকে সংগ্রহ করতে হবে কিংবা তাকে তুলনামূলকভাবে ছোটো গর্ত করতে হবে সমুদ্রতলে এবং সেখান থেকে তা উত্তোলন করতে হবে।

পতামই বিজ্ঞানী নিয়োগ করলেন এটা বোঝার জন্য যে, সমুদ্রতলে খনন কাজ করা কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ কিংবা কতটুকু লাভজনক।

প্রায় সময়ই স্থলে খনন করতে হলে গ্রাম খালি করতে হয়, বন কেটে সাফ করতে হয়, রাস্তা, রেলপথ তৈরি করতে হয় খনিজ পদার্থ তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যে পরিমাণ আকরিক পাওয়া যায় তার মাঝে মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ খুবই কম থাকে।

এর বিপরীতে যদি আমরা গভীর সমুদ্রে খনন করার কথা ভাবি, মানুষের ওপর তাৎক্ষণিক কোনো প্রভাব পড়বে না—বন কাটতে হবে না, অল্প জায়গায় খনন করলেই চলবে, আকরিকের মাঝে খনিজ কিংবা ধাতুর পরিমাণ অনেক বেশি। তবে এখানে সমস্যা হলো যে জায়গায় মাইনিং হচ্ছে সেই জায়গার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর।

এখানে আরও ব্যাপার আছে। যেখানে মাইনিং করছি, সেখান থেকে ধুলো উড়ে বহুদূর যাবে, যেখানে পড়বে সেখানের জীববৈচিত্র্য হুমকির মাঝে পড়বে। কিন্তু ঠিক কত দূরে পড়বে ?

ট্রপিক সিমাউন্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করে। তারা রিমোট চালিত একটা ছোটো জাহাজ থেকে প্রতি মিনিটে কয়েকশ লিটারের বালু মিশ্রিত পানি সমুদ্রে ঢেলে দেয় এবং একই সাথে আশেপাশের বিশাল এলাকা জুড়ে সেন্সর লাগিয়ে দেয়।
সেন্সরের ডাটা অনুযায়ী, এক কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের পর থেকে এই বালু তেমন পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ মাইনিং করা হলে সেই নির্দিষ্ট সাইট থেকে বড়োজোর এক কিলোমিটার দূর পর্যন্তই বালু ছড়াবে, যেটা আদতে এতটাও বড়ো কোনো ব্যাপার নয়।

কিন্তু যেই এক কিলোমিটার জায়গায় এটা ক্ষতি করবে সেখানে এটার প্রভাব কীরকম হতে পারে ?

ডক্টর ড্যানিয়েল জোনসের স্টাডিতে তিনি দেখিয়েছেন, যেই জায়গায় মাইনিং হবে সেখানকার বড়ো জীববৈচিত্র্য এক বছরের মাঝে পুনরুদ্ধার হলেও তা মাইনিং পূর্ববর্তী লেভেলে ফিরে আসতে প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় লাগবে।

তবে আরেকটা স্টাডি ফোকাস করেছে অণুজীবদের ওপর। প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রতলে একটা জায়গা,

যা Clarion-Clipperton Zone নামে পরিচিত। সেখানে বিশ্বের বারোটার বেশি দেশের অনুমতি আছে টেলুরিয়ামের জন্য খনন করার। সেখানে যেয়ে মেরিন বায়োলজিস্টরা *Xenophyophorea* নামের এক Protista এর নানান বৈচিত্রের প্রজাতির সন্ধান পান। উল্লেখ্য, এর মাঝে ৩৪টা প্রজাতি এমন ছিল যার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আগে কখনো জানতেন না।
এখান থেকেই ধারণা করা যায়, এমন আরও নানান বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ ধ্বংসের মুখে পড়ে যাবে যদি সেখানে খনন করা হয়। এর মাঝে এমন অনেক প্রজাতি থাকবে যার ব্যাপারে বিশ্ব জানার আগেই তা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।
নির্দিষ্ট করে *Xenophyophorea* এর ব্যাপারে বললে, যেহেতু তারা খাদ্য চেইনের একদম শুরুর দিকে অবস্থান করে, তাই তাদের ওপর খাদ্যের জন্য অনেক প্রাণী নির্ভরশীল। তাই তাদের বিলুপ্তি যে আসলে কতটা ব্যাপকভাবে আরও প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটাতে পারে তা কখনোই সহজে অনুমেয় না।

এবং আরেকটি স্বতন্ত্র স্টাডি এটা প্রমাণ করেছে যে, গভীর সমুদ্রে মাইনিং এর ক্ষেত্রে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের আশেপাশে থাকা প্রাণীদের মাঝে প্রথম বিলুপ্ত হতে পারে সি-প্যাঙ্গোলিন নামের এক শামুক প্রজাতি।

তাহলে কি টেলুরিয়াম দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে কম খরচে বিশ্বকে সোলার প্যানেল দেওয়া হচ্ছে না ? পতামই জানেন, যেমন জানি আমরা সবাই, টেলুরিয়াম গভীর সমুদ্র থেকে উত্তোলন হবেই। যতই ক্ষতি হোক, যতই প্রজাতি বিলুপ্ত হোক, কম খরচে বিদ্যুৎ সবাই চায়।

আমরা পতামইয়ের মতো নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারি যে, অন্তত এটার প্রভাব কয়লা কিংবা তেল ইন্ডাস্ট্রির মতন এত বেশি হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে এনার্জি সাপ্লাই পরিষ্কার রাখতে হলে আমাদের হাত ময়লা করতে হবে।

সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে ২ মিটার নিচে।

এখানে থাকে Salmon (স্যালমন) এবং Manatee বা (সামুদ্রিক গাভী)।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ
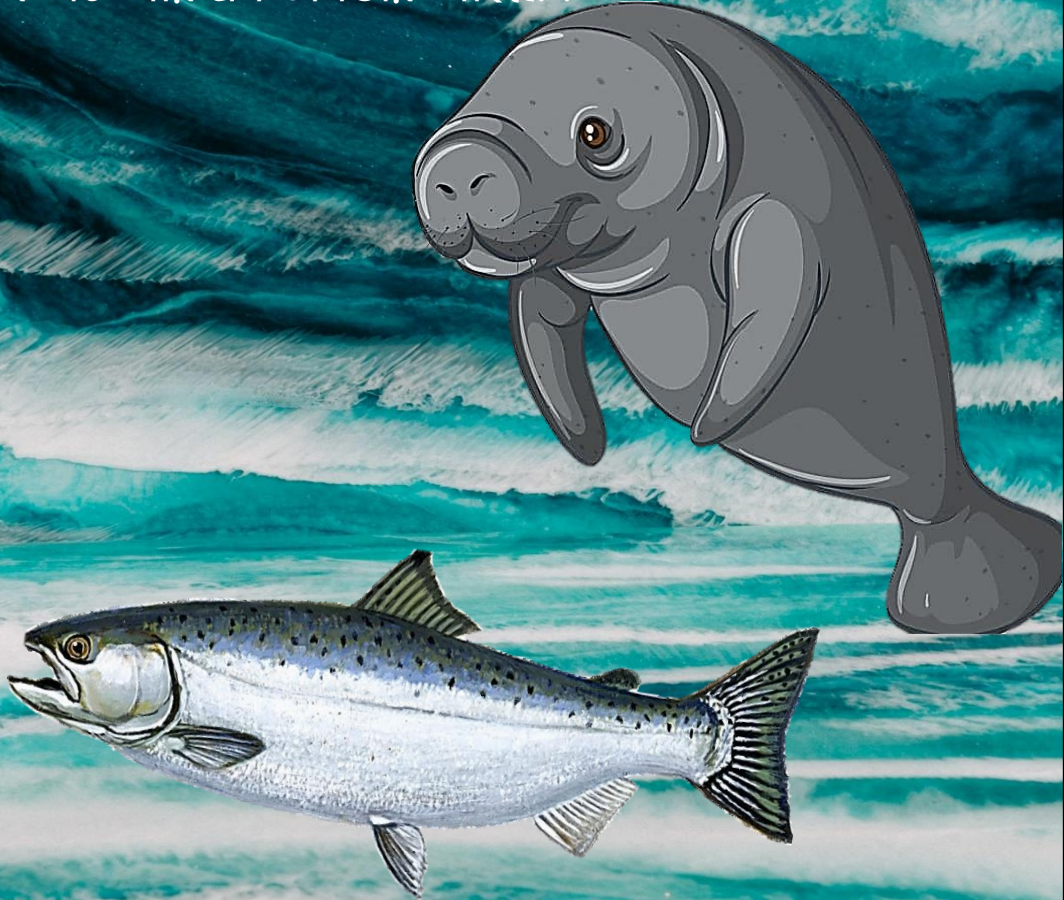
জাদুকরী সংখ্যা

এস.আর.এইচ.রবিন

বৃত্তে যে সংখ্যাটি দেখতে পাচ্ছেন তা একটি চক্রাকার জাদুকরী সংখ্যা। সংখ্যাটি ১৪২৮৫৭। এর সঙ্গে চলুন যথাক্রমে ১,২,৩,৪,৫,৬ গুণ করি।

১৪২৮৫৭ × ১ = ১৪২৮৫৭

১৪২৮৫৭ × ২ = ২৮৫৭১৪

১৪২৮৫৭ × ৩ = ৪২৮৫৭১

১৪২৮৫৭ × ৪ = ৫৭১৪২৮

১৪২৮৫৭ × ৫ = ৭১৪২৮৫

১৪২৮৫৭ × ৬ = ৮৫৭১৪২

গুণফলগুলো একটু খেয়াল করুন আর সবার ওপরের সেই চক্রে থাকা অঙ্কগুলো একটু খেয়াল করুন। কী ? কিছু ধরতে পেরেছেন? ঠিক তাই। গুণফলগুলো ওই চক্রের বাইরে যাচ্ছে না। ঘুরেফিরে সেখানেই থেকে যাচ্ছে।

এবার চলুন আপনাদের মন খারাপ করে দিই। সংখ্যাটিকে ৭ দিয়ে গুণ করি।

১৪২৮৫৭ × ৭ = ৯৯৯৯৯৯

এখানে আর জাদুকরের জাদু খাটল না। ভাগ্যবান সংখ্যা ৭ দিয়ে গুণ করে কিনা পেলাম ছয়টা নয়! চলুন, এখানেও কিছু জাদু খুঁজি। পুরো সংখ্যার অঙ্কগুলো নিজেদের মধ্যে যোগ করি।

১+৪+২+৮+৫+৭ = ২৭

এবার ২৭ কে নিজেদের মধ্যে যোগ করে পাই,

২+৭ = ৯

কী ব্যাপার? কিছু ধরতে পারলেন? আমরা ৯ পেয়েছি। আর মূল সংখ্যাটা হলো ছয় অঙ্কের। অর্থাৎ, ছয়টা নয় কত সুন্দরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মনে হচ্ছে, এই জাদু আপনাদের পছন্দ হয়নি। তবে জাদু কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এই ৭ সংখ্যার চেয়ে বড়ো যে-কোনো সংখ্যা দিয়ে এই জাদুকরী সংখ্যাকে গুণ করলে পুনরায় সেটি পাওয়া সম্ভব। এর জন্য আমাদের একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

পদ্ধতি: ১৪২৮৭৫ কে সাতোর্ধ যে-কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল আপনি পাবেন, তার ডান দিকের শেষ ছয় ঘর আলাদা করে রাখুন। এরপর বাম দিকের যে অবশিষ্ট সংখ্যা থাকে সেটিও

আলাদা করুন। এবার এই দুই আলাদা সংখ্যা যোগ করে দিলেই জাদু! চলুন, উদাহরণ দিয়ে দেখাই।

▪১৪২৮৭৫ × ৮ = ১১৪২৮৫৬

এখানে,

গুণফলের শেষ ছয় ঘর = ১৪২৮৫৬

অবশিষ্ট সংখ্যা = ১

দুটোর যোগফল = ১৪২৮৫৬ + ১ = ১৪২৮৫৭

এবার একটু বড়ো সংখ্যা দিয়ে গুণ করে দেখি।

▪১৪২৮৫৭ × ৬৫০ = ৯২৮৫৭০৫০

এখানে,

গুণফলের শেষ ছয় ঘর = ৮৫৭০৫০

অবশিষ্ট সংখ্যা = ৯২

দুটোর যোগফল = ৮৫৭০৫০ + ৯২ = ৮৫৭১৪২

চক্রাকার সংখ্যাটিকে বর্গ করলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। চলুন, দেখা যাক।

▪১৪২৮৫৭² = ১৪২৮৫৭ × ১৪২৮৫৭ = ২০৪০৮১২২৪৪৯

এখানে,

গুণফলের শেষ ছয় ঘর = ১২২৪৪৯

অবশিষ্ট সংখ্যা = ২০৪০৮

দুটোর যোগফল = ১২২৪৪৯ + ২০৪০৮ = ১৪২৮৫৭

সুতরাং, বারবার আমরা পাচ্ছি সেই চক্রাকার সংখ্যা ১৪২৮৫৭। ওহ ! একটু দাঁড়ান।

১৪২৮৫৭ সংখ্যাটির,

শেষ তিন অঙ্কের বর্গ = ৮৫৭² = ৭৩৪৪৪৯

প্রথম তিন অঙ্কের বর্গ = ১৪২² = ২০১৬৪

এবার,

শেষ তিন অঙ্কের বর্গ - প্রথম তিন অঙ্কের বর্গ = ৭৩৪৪৪৯ - ২০১৬৪ = ৭১৪২৮৫

কী রে ভাই! আবারও সেই সংখ্যা। কিন্তু এই সংখ্যার জাদু যে এখনও শেষ হয়নি! শুরুতে আপনাদের মন খারাপ করে দিয়েছিলাম ভাগ্যবান সংখ্যা ৭ দিয়ে গুণ করে। এবার চলেন, পৃথিবীর যে-কোনো সংখ্যাকে সেই ৭ দিয়ে ভাগ করি।

১ ÷ ৭ = ০.১৪২৮৫৭

২ ÷ ৭ = ০.২৮৫৭১৪

৩ ÷ ৭ = ০.৪২৮৫৭১

৪ ÷ ৭ = ০.৫৭১৪২৮

৫ ÷ ৭ = ০.৭১৪২৮৫

৬ ÷ ৭ = ০.৮৫৭১৪২

৭ ÷ ৭ = ০.৯৯৯৯৯৯ = ১

৮ ÷ ৭ = ১.১৪২৮৫৭

৯ ÷ ৭ = ১.২৮৫৭১৪

৮২২ ÷ ৭ = ১১৭.৪২৮৫৭১

এভাবে ৭ বাদে যে-কোনো সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে আপনি আমাদের এই জাদুকরী সংখ্যার দেখা পাবেন। কষ্ট করে পুরোটা পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

ওরু, তুই হানিতে থাকুইন্না ডলফিন নারে?

হয়

আই পান্ডা আল্লা অইচু?

অ্যাহ্?

জীবনোৎপাত ...

আশরাফুজ্জামান খালিদ

সব আগ্নেয়গিরি কিন্তু মাটির ওপরে থাকে না। কিছু কিছু সাগরের নিচেও থাকে। কিছু নিষ্ক্রিয়, কিছু সক্রিয়। সক্রিয়গুলোর কয়েকটা মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। তবে আমরা আজকে সেগুলো সম্পর্কে জানব না। আমরা জানব তাদের জাতভাই সম্পর্কে, যেগুলো সমুদ্রের নিচে লাভার স্রোত বের না করলেও তার রহস্য আগ্নেয়গিরির চেয়ে কোনোমতেই কম নয়।

সমুদ্রের তলদেশ সমতল নয়। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। আবার কোথাও এমন জায়গা আছে যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই অল্প নিচেই আছে লাভার স্রোত। সেসব জায়গায় মাঝে মাঝেই কিছু ফুটো দিয়ে পানি নিচে লাভা স্রোতের খুব কাছে চলে যায়। এরপর গরম হয়ে আরেকটি ফুটো দিয়ে তীব্র বেগে আবার ওপরে উঠে আসে। তখন এর তাপমাত্রা ৬০০ থেকে ৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মতো, যা পানির স্ফুটনাঙ্কেরচেয়েও বেশি। কিন্তু প্রবল চাপে পানি বাষ্প হতে পারে না। ১৯৭৭ সালে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের নিচে সাবমেরিন দিয়ে অভিযান এর সময় সমুদ্রের প্রায় ২৬০০ মিটার নিচে বিজ্ঞানীরা গ্যালাপাগস রিফ্ট আবিষ্কার করেন।

পানিগুলো কিন্তু একা ওপরে উঠে আসে না, আরও কিছু নিয়ে আসে। তাদের সাথে উঠে আসে কিছু খনিজ পদার্থ, যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়।

I. White Smoker : বেরিয়াম (Be), ক্যালসিয়াম (Ca), সিলিকন (Si) যেগুলোতে থাকে সেগুলো সাদা রং ধারণ করে।

II. Black Smoker : এগুলোতে বেশিরভাগ সময় ফেরাস সালফাইড থাকে। তাই কালো দেখায়।

সমুদ্রের মিডনাইট জোন ঘন কালো অন্ধকার, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের ১০০০মি. নিচ থেকে শুরু হয়। আর হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট সেখানে থাকে ২০০০ মি. নিচে। এখানে কিন্তু কোনো সবুজ উদ্ভিদ নেই। অনেকেই বলবে যেখানে এত ভয়ংকর হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট আছে, সেখানে কোনো সবুজ উদ্ভিদ কী, উদ্ভিদই-বা থাকবে কীভাবে ! কিন্তু সেটা মূল কারণ নয়। মূল কারণ সূর্যের আলো। সূর্যের আলোর খুব কম অংশই এখানে প্রবেশ করে।

“যেহেতু সূর্যের আলো নেই, তাই সবুজ উদ্ভিদের জন্য খারাপ খবর। ফটোসিন্থেসিস করা যাবে না, তাই তারও এখানে থাকা চলবে না। আর যেহেতু

সবুজ উদ্ভিদ নেই তাই অন্য প্রাণীগুলোও থাকবে না।”

এটাই তো হওয়ার কথা, তাই না ? অর্থাৎ, সেখানে কোনো ইকোসিস্টেমই থাকার কথা না। তাই না ?

কিন্তু যখন হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট আবিষ্কার করা হয়, তখন বিজ্ঞানীরা দেখেন হাইড্রোথার্মাল ভেন্টে মিডনাইট জোনের চেয়ে প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি প্রাণী থাকে !

কীভাব ?

কেমোসিন্থেসিস (Chemosynthesis) প্রক্রিয়ায়।

মজার ব্যাপার হলো, হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক আগেই Wilhalm Pfeffer ১৮৯৭ সালে এটা প্রস্তাব করেছিলেন, যা পরে প্রমাণিত হয়। যাহোক,এত এত প্রাণী এখানে জীবিত থাকার কারণ হচ্ছে কেমোসিন্থেটিক ব্যাকটেরিয়া। তাদের কাজ হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন করা। সূর্যের আলোর সাহায্যে নয়, কেমিক্যাল রিয়েকশন এর সাহায্যে।

জিনিসটা ঘটে এভাবে:

হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট থেকে আসা হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2) এবং অল্প অক্সিজেনের (O2) সবগুলো জিনিস কেমোসিন্থেটিক ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রহণ করে এবং তারা এগুলো থেকে গ্লুকোজ, পানি ও সালফার উৎপন্ন করে।

$$18H_2S + 6CO_2 + 3O_2 \text{-------} C_6H_{12}O_6 + 12H_2O + 18S$$

বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া থাকে জায়ান্ট পামে ওয়ার্ম এর ভিতর। ওয়ার্ম মানে হচ্ছে কৃমি। জায়ান্ট বলতে প্রায় একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সমান। লম্বায় ৯ থেকে ১.৫ মি. পর্যন্ত হতে পারে। ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে কৃমিগুলোর ট্রপোসোমের-এ। প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে, প্রায় কৃমিগুলোর ওজনের অর্ধেক। ব্যাকটেরিয়াগুলো লার্ভা অবস্থায় কৃমির শরীরে প্রবেশ করে। কৃমির রক্তে প্রচুর হিমোগ্লোবিন থাকে। তাতে H2S সহ আরও অনেক যৌগ উঠে বসে যা শরীরের সব জায়গায় ঘুরে আসে। শেষে যে সালফার উৎপন্ন হয়, তা ওই ট্রপোসোমের মধ্যেই থাকে। যদি ট্রপোসোমকে কাটা হয় তাহলে সালফারের হলুদ রঙের বড়ো বড়ো স্ফটিকগুলো খালি চোখেই দেখা যায়। ঘিনঘিনে ব্যাপার !

ভাবছেন, এত তাপমাত্রায় প্রাণীগুলো থাকে কীভাবে?

এটাই ওই প্রাণীগুলোর বৈশিষ্ট্য, তারা অসম্ভব রকমের তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। কৃমিগুলো ৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায়ও সুন্দর ঘুরাঘুরি করতে পারে। এমনকি কৃমিগুলো ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার চেয়েও বেশি তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে ও বংশবিস্তার করতে পারে। কী নেই ওখানে—পোকামাকড়, চিংড়ি, কাঁকড়া, জেলিফিশ, অক্টোপাস আর বড়ো বড়ো কয়েক ধরনের কৃমি।

পৃথিবীর জীবজগৎ অনেকবারই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক এক্সটিংশন ইভেন্টে সমুদ্রের প্রায় ৯৬% প্রাণী, ডাঙার প্রায় ৭০% প্রাণীর বিলুপ্তি হলেও হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের প্রাণীগুলো বেঁচে গিয়েছিল। এছাড়া ভবিষ্যতের কোনো দুর্যোগের সময়েও প্রাণীগুলোর বেঁচে থাকার ভালো সম্ভাবনা আছে। তারা হয়তো জানবেই না যে কিছু হয়েছে। তারা হয়তো সূর্য যে আছে, এই কথাটাও জানে না। সূর্য থাকুক আর না থাকুক, তাদের কিছু আসে যায় না। যদি কোনো কারণে সূর্য ধ্বংস হয়েও যায়, পৃথিবী যদি কোনো কারণে আস্ত থাকে, আমরা হয়তো

মারা যাব। কিন্তু এরা বেঁচে থাকবে, হয়তো তারা জানবেও না। এছাড়া সমুদ্র ভাইয়ের লেখা 'গোল্ডিলক জোনের বাইরে প্রাণের সম্ভাবনা' লেখাতেও তিনি দেখিয়েছেন হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের জন্য শনির একটা উপগ্রহতে প্রাণের সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ওখানে পাওয়া গেছে জৈব যৌগ। DNA, RNA, প্রোটিনসহ আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো জৈব যৌগের তৈরি, অর্থাৎ জীবন তৈরির জন্য কার্বন বন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর কার্বন বন্ডের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে মিথেন(CH4)। তাই জৈব যৌগ জীবন সৃষ্টিতেখুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীর ক্ষেত্রেও এমন দেখা গিয়েছে। অ্যাটলান্টিক ম্যাসিফ-এর The Lost City-তে প্রথম প্রাণের জন্ম হয়েছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। হয়তো সৌরজগতের কোনো একটি গ্রহ বা গ্রহের চারপাশে ঘোরা উপগ্রহের বা মহাবিশ্বের অন্য কোথাও এরকমই অন্য কোনো এক জায়গায় প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে, আর আমরা তা জানবও না।

এখন আমরা সমুদ্রের ৯৩ মিটার গভীরে এসেছি, আর এখানে দেখা মিলবে Staghorn Coral (হরিণের শিংয়ের ন্যায় কোরাল) এবং striped fish (ডোরাকাটা মাছ)।

লেখক-টি আর এস তানভীর আহমেদ

প্রশান্ত মহাসাগরের জীববৈচিত্র্য

ইমদাদুল হক আফনান

পৃথিবীর ৫টি মহাসাগরের মধ্যে সব থেকে বড়ো এবং গভীর মহাসাগর হলো প্রশান্ত মহাসাগর। এটি উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মহাসাগর, পূর্বে আমেরিকা এবং পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এক্সপ্লোরার Ferdinand Magellan ১৬ শতাব্দীতে এই মহাসাগরের নাম দেন 'Pacific'। এই মহাসাগরের পানির ধীরতার জন্য এই নাম দিয়েছিলেন। 'Pacific' শব্দের অর্থ 'peaceful' বা শান্তিপূর্ণ। পৃথিবীর মোট সার্ফেসের প্রায় ৩০% জুড়ে প্রশান্ত মহাসাগর বিস্তৃত। এর অ্যারিয়া ১,৬৫,২৫০,০০০ বর্গকিলোমিটার। গড় গভীরতা ৪,২৮০ মিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা ১১,০৩৪ মিটার বা ৩৬,২০১ ফুট (মারিয়ানা ট্রেঞ্চ)। নিচে প্রশান্ত মহাসাগরের তিনটি জীবের পরিচয় তুলে ধরা হলো:

Laysan albatross:

অ্যালবাট্রোজ অর্থ মানসিক বোঝা বা অভিশাপ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Phoebastria immutabilis*. পৃথিবীর সব থেকে বড়ো পাখাওয়ালা পাখিদের একটি হলো অ্যালবাট্রোজ। জীবিত পাখিদের মধ্যে এরাই সব থেকে বড়ো ডানার অধিকারী। লায়সান অ্যালবাট্রোজ, এর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে তুলনামূলক ছোটো ডানাওয়ালা। এই প্রজাতির ৯৯.৭% এর বাসস্থান উত্তর-পশ্চিম হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। লায়সান প্রজাতির সবচেয়ে বড়ো ডানার রেকর্ড করা হয়েছে ৬ ফুট। এরা ১২-৪০ বছর বাঁচে। ডানা সাধারণত ১.৯৫-২.০৩ মিটার লম্বা হয়। পুরুষদের ভর ২.৪-৪.১ কেজি এবং মহিলাদের ভর ১.৯-৩.৬ কেজি হয়ে থাকে। এদের ডানার ওপরের অংশ, লেজ এবং পশ্চাতের ওপরের অংশ কালচে ধূসর হয়। মাথা, পশ্চাতের নিচের অংশ ও বক্ষের অংশ সাদা হয়, চোখের নিচে কালো দাগ থাকে।

Fur seal:

pinniped এর নয়টি প্রজাতির একটি হলো ফুর সিল। এটি Arctocephalinae সাব-ফ্যামিলি এবং Otariidae ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত। ট্রু সিলদের অপেক্ষা সি লায়নের সাথে এর বেশি মিল রয়েছে। সম্মুখ ফ্লিপার অংশ তুলনামূলকভাবে লম্বা ও পেশিবহুল। Pinniped এর বাকি ৮টি প্রজাতিকে Southern Fur Seal বলে। Northern Fur Seal ভিন্ন গণের এবং উত্তর প্রশান্তে থাকে। এরা জীবনের ৯০% সময় সাব-পোলার, নিরক্ষীয় ও নাতিশীতোষ্ণ পানিতে কাটায়। Northern Fur Seal ১০,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। এদের ব্রিডিং সিজন নভেম্বরে শুরু হয়ে ২/৩ মাস থাকে। Northern Fur Seal এর ব্রিডিং জুনে শুরু হয়। এরা ১.৯ মিটার অবধি লম্বা হয়। ভর ৩৯-১৩০ কেজি হয়।
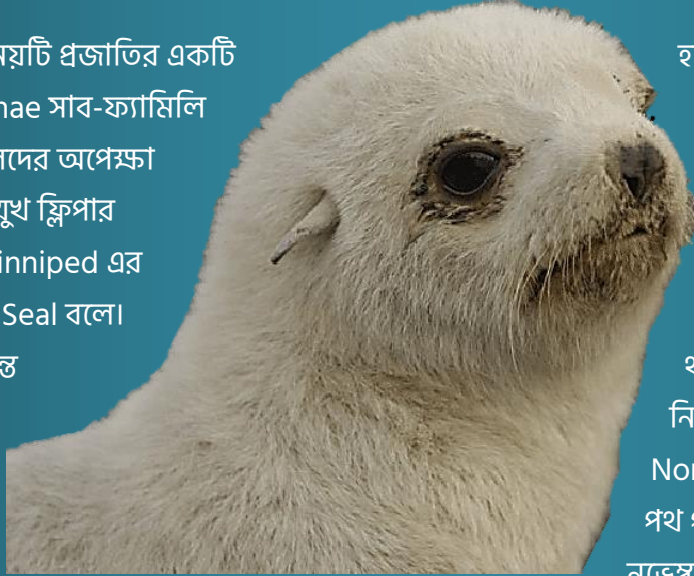
Bellus lyretail:

এরা প্রধানত পশ্চিম প্রশান্তে থাকে। পপুলেশনের একটা ছোটো অংশ ইন্দো-প্রশান্তে থাকে। এরা Pomacanthidae ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত। এদের বিশেষ ধরনের মেরুদণ্ডের কারণে এদেরকে বাটারফ্লাই ফিশ থেকে আলাদা করা যায়। গ্রিক শব্দ 'Poma' অর্থ আবরণ আর 'Akantha' অর্থ কাঁটা বা কণ্টক। ল্যাটিন শব্দ 'bellus' অর্থ সুন্দর। এদের মুখ ছোটো। বক্ষে তুলনামূলক বড়ো পাখনা আর অর্ধচন্দ্রাকার লেজ থাকে। ১০-১৫ বছর বাঁচে। লম্বায় ৭-১৮ সে.মি. হয়। সাধারণত ৫০-১০০ মিটার গভীরে এরা থাকে।

A Cookiecutter Shark

জয়শ্রী রায় পূজা

Cookiecutter Shark... উমম.... নাম দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়, তাই না ?
সমুদ্রের ৩২০০ ফিট নিচে বাস এক রহস্যময় প্রাণীর, যে কিনা দাঁত দিয়ে গোলাকার বিস্কিট আকৃতির মতো করে মাংস কেটে নিতে পারে তার থেকে আকারে বড়ো কোনো প্রাণীর, এমনকি মানুষেরও। বিষয়টা রহস্যময় না ? চলুন জেনে আসা যাক এই প্রাণীর বংশপরিচয়। বংশপরিচয় জেনেই না হয় বাকি গল্পটা বলব।

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Chondrichthyes
Order: Squaliformes
Family: Dalatiidae
Genus: *Isistius*
Species: *I. brasiliensis*
Binomial name: *Isistius brasiliensis*

Chordata পর্বের অন্তর্ভুক্ত Cookiecutter Shark নামের এই প্রাণীটি দেহের বিশেষ আকৃতির জন্য Cigar Shark নামেও পরিচিত। সাধারণত সারা পৃথিবীর উষ্ণ সামুদ্রিক জলে এদের বাস, বিশেষ করে দ্বীপের কাছাকাছি এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগর, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এদের বাস। এরা সাধারণত দিনের বেলা সমুদ্রের ৩.২ কিলোমিটার গভীরে থাকে এবং রাতে প্রায় ৩ কিলোমিটার উপরে উঠে আসে শিকারের খোঁজে। এরা কিন্তু শিকারি মাছকেই শিকার বানিয়ে ফেলে।

এদের নলাকার দেহটি ৪২ সে.মি. থেকে ৫৬ সে.মি. লম্বা। এদের চোঙের মত দেহটির সাথে আছে একটি ভোঁতা নাক, বড়ো বড়ো দুটো চোখ, দুটো ছোটো ছোটো পৃষ্ঠদেশীয় পাখনা আর বড়ো একটি লেজ। এদের কলার আবৃত কানকো ব্যতীত বাকি দেহ আলো বিচ্ছুরণকারী ফটোফোরস দ্বারা আবৃত। পাশ থেকে দেখে মনে হবে, ছোট্ট পাখনা আর বড়ো সবুজ চোখের সরু বাদামি রঙের হাঙর। কিন্তু উঁহু ! দেখে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। এরা ছোটো হলেও এদের ক্ষমতা কিন্তু কম নয়।

Cookiecutter Shark এর ওপরের চোয়ালে রয়েছে ৩০ থেকে ৩৭ টি সোজা সোজা দাঁত এবং নিচের চোয়ালে রয়েছে ২৫ থেকে ৩৬টি বড়ো বড়ো ত্রিকোণ আকৃতির দাঁত যা দিয়ে একটি কুকিকাটার শার্ক খুব দ্রুতই তার শিকারের শরীর থেকে মাংস কেটে নিতে পারে।

ধরুন, আপনি সাঁতার কাটতে সমুদ্রে নামলেন। হুট করে দেখলেন, আপনার চারপাশের জল লাল হতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি তীরে উঠে দেখলেন

আপনার পায়ে কে যেন খুব যত্ন করে কুকির মতো ডিজাইন করে দিয়েছে। ভয়ংকর না বিষয়টি ? যদিও এর সম্ভাবনা খুব কম। কারণ এরা দিনের বেলা নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে বের হয় না। তবে রাতের বেলা অনেক ডুবুরি এ মাছের শিকার হয়েছে। Cookiecutter Shark এর বিশেষত্ব হলো এরা নিজের থেকে বড়ো আকারের প্রাণীই শিকার হিসেবে বেছে নেয়। উঁহু ! এটা ভেবে বসবেন না যেন বড়োদের আক্রমণ করলে ছোটোরা এর থেকে নিরাপদ। স্কুইডের মতো ছোটো প্রাণীও ছাড় পায় না Cookiecutter Shark এর হাত থেকে। সামুদ্রিক প্রায় সব ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং মাছের দেহে এদের আক্রমণের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সাবমেরিন, পানির নিচের কেবলগুলোও ছাড় পায়নি এদের দাঁতের নিখুঁত শিল্পকর্ম থেকে। এদের দেহের আলো বিচ্ছুরণকারী ফটোফোরস এদের শিকারকে এদের দিকে আকৃষ্ট করে। আলো দেখে শিকার করতে এসে নিজেরাই শিকারে পরিণত হয় তিমি, হাঙরসহ বিভিন্ন প্রজাতির শিকারি মাছ এবং সামুদ্রিক প্রাণী।

Cookiecutter Shark এর আয়ুষ্কাল এখনো জানা যায়নি। এরা নির্জনে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। প্রজনন ঋতুতে এই প্রজাতির নারী সদস্যরা ১২ থেকে ২২ মাসের গর্ভকাল শেষে ৬ থেকে ১২টি বাচ্চা প্রসব করে।

হাঙরের এই প্রজাতিটি খুব বেশি পরিচিতি পায়নি। ইনফ্যাক্ট The International Union for Conservation of Nature-ও এদেরকে কম গুরুত্বের সাথে তালিকাভুক্ত করেছে।

আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল।

কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া

আশরাফুজ্জামান খালিদ

ড. জোসেফ ও ড. সারাহ্ সাবমেরিনের শক্তিশালী লাইট দিয়ে ২৭০০ মি. নিচে প্রবল চাপে হাইড্রোথার্মাল ইভেন্টের কেমোসিনথেসিস বিক্রিয়ায় উৎপন্ন ইকোসিস্টেম পর্যবেক্ষণ করছিলেন, যার কিছু অংশ তারা পরীক্ষার জন্য নেওয়ার কথা ভাবছেন। গবেষণাগারে বিশাল টিউব ওয়ার্ম এর ট্রোপোসোমের মধ্যে হলুদ রঙের সালফারের কণা লক্ষ করায় ভুলে খালি হাতেই ট্রোপোসোমের কিছু অংশ তুলে নেওয়ায় ড. জোসেফ, ড. সারাহ্কে হাত ধুতে অনুরোধ করলেন। বিবিসির খবর হচ্ছে : 'WHO' নতুন একটি ব্যাকটেরিয়াকে মহামারী বলে ঘোষণা করেছে, মিউটেটেড কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া ত্বক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে মানুষের কিডনির বিষাক্ত পদার্থগুলো ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন এবং সালফার তৈরি করে যা কিডনির কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, ড. সারাহ্ টিভিতে খবরটি দেখতে দেখতে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করলেন।

নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস : সমুদ্র

রুমানা আফরোজ

সমুদ্রের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ অংশ জুড়ে থাকা এই বাস্তুতন্ত্রের জীব সমষ্টি নিয়ে আমাদের আগ্রহ যে সুবিশাল, তা কারও অজানা নয়। পৃথিবীর প্রথম প্রাণের স্পন্দন, দৈত্যাকার প্রাগৈতিহাসিক জীবের আবাসস্থল, নান্দনিক প্রবাল প্রাচীর আর সেখানে বাস করা অসাধারণ সব জীব, সব মিলিয়ে এত বৈচিত্র্যময় আয়োজন হয়তো স্থলভাগেও নেই। প্রাত্যহিক জীবনে সমুদ্রের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সবার কিছু ধারণা অবশ্যই আছে। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের ৭০-৮০ শতাংশই আসে সামুদ্রিক শৈবাল থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততম পথ, মাছের জোগানদাতা, বৃষ্টির পানির একটি বড়ো উৎস, বিজ্ঞানীদের গবেষণাক্ষেত্র, লবণ তৈরি কিংবা তেল ও গ্যাসের উৎস, কেউ জিজ্ঞেস করলে এগুলো আমরা অনায়াসেই বলতে পারব। কিন্তু সমুদ্র যে নবায়নযোগ্য শক্তির এক বিরাট উৎস, সে বিষয়ে হয়তো আমাদের অনেকেরই খুব বেশি জানা নেই।

অবশ্য সমুদ্রকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খুব বেশি দিনের নয়, এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। বৃহৎ পরিসরে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এখনো সাধিত হয়নি। তাই বলে যে আমরা এ বিষয়ে আগ্রহী হব না, এমনটা ভাবা অনুচিত। নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক শক্তিসমূহের মধ্যে সামুদ্রিক বায়ুপ্রবাহ, স্রোতধারা ও সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রার পার্থক্য (temperature gradient) অন্যতম। এখন আমরা এসব বিষয়ে কিছু তথ্য জানব।

বায়ুপ্রবাহ : বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে টারবাইন ঘুরিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তা সবাই আমরা জানি। ফাঁকা স্থান ও সমুদ্র সমতল থেকে খানিকটা উচ্চতায় টারবাইন স্থাপন করে দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। সমুদ্র কিন্তু বায়ুপ্রবাহের খুবই ভালো একটা উৎস। আমরা জানি, পানির তাপধারণ ক্ষমতা স্থলভাগের থেকে বেশি। তাই স্থলভাগের ওপর আসা সূর্যকিরণের তাপ স্থলভাগ সমুদ্রের মতো ধরে রাখতে পারে না, বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। তাপমাত্রা বাড়লে গ্যাসের প্রসারণ ঘটে এবং চাপ কমে যায়। কিন্তু তখন সমুদ্র সংলগ্ন বাতাসের চাপ তুলনামূলক বেশি থাকে। বায়ু সবসময় উচ্চ চাপের এলাকা থেকে নিম্নচাপের এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। তাই সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। উভয় অঞ্চলের তাপমাত্রার পার্থক্য যত বেশি হবে, এই বায়ুপ্রবাহও তত শক্তিশালী হবে। তাই সমুদ্র উপকূলে টারবাইন স্থাপন করে বেশ ভালোভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

আবার সমুদ্রের বুকে ভাসমান টারবাইনও স্থাপন করা যায়। উপকূলীয় টারবাইনের চেয়ে সামুদ্রিক ভাসমান টারবাইন এর রক্ষণাবেক্ষণ একটু কষ্টকর। কারণ সমুদ্র কখনো শান্ত, আবার কখনো ভীষণ উত্তাল। তবে একটা সুবিধা আছে, ভাসমান টারবাইনকে বায়ুপ্রবাহ অনুসারে যে-কোনো দিকে ঘোরানো যায় । আর স্থলভাগের টারবাইন সাধারণত নির্দিষ্ট দিক (fixed direction) হয়। ভাসমান টারবাইন প্রযুক্তিটি একেবারেই নতুন, খুব কম স্থানেই আছে। স্কটল্যান্ডে এরকম একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। সামুদ্রিক টারবাইনের অসুবিধাসমূহের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ, উড়ন্ত পাখি মারা যাওয়া, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক নয়েজ এর আধিক্য (যার ফলে স্যাটেলাইট বা রাডার সিগন্যাল বাধাগ্রস্ত হতে পারে), স্রোতের উচ্চতা কমে যাওয়া, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি কিংবা সৈকত এলাকার স্বাভাবিক জনজীবনকে ব্যাহত করা ইত্যাদি রয়েছে। তাই সকল সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করেই এ প্রজেক্ট নেওয়া উচিত।

স্রোত : টারবাইন প্রযুক্তির সাথে যদি স্রোতকে তুলনা করা হয়, তাহলে বলতে হবে স্রোতকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তিটি এখনো শৈশবেই রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে বেশ ভালোই। একটু আগে আমরা জেনেছি কী কারণে বায়ুপ্রবাহ হয়, কিছুটা একই কারণে স্রোতও সৃষ্টি হয়, পাঠককে এ পর্যায়ে অনুরোধ করছি একটু চিন্তা করে কারণটি বের করতে কিংবা ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে (তাহলে আমাদের চিন্তা করার ও জ্ঞান আহরণ করার ক্ষমতা বাড়বে)।

স্রোতকে ব্যবহারের কিছু সম্ভাব্য প্রযুক্তি : পানির তলদেশের চাপের পার্থক্য (Submerged Pressure Differential) : পানির নিচে স্থাপিত একই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে চাপের পার্থক্য ঘটে, কারণ স্রোতের কারণে পানির স্তরের উচ্চতার অর্থাৎ পানির পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে; সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্রের অভ্যন্তরের মোটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

বাঁধের মাধ্যমে (Using Dam) : সাধারণ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে যেভাবে পানিকে আটকে রেখে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, এই প্রক্রিয়াটাও তেমনই।

ঘুরন্ত ভর (Rotating Mass) : ভরবিশিষ্ট ভাসমান একটি যন্ত্র স্রোতের তালে দুলতে থাকে, সেই দোলনকে কাজে লাগিয়ে অভ্যন্তরীণ মোটর ঘোরানো হয়। কিংবা পানির অভ্যন্তরে সরাসরি মোটরও স্থাপন করা সম্ভব। অবশ্য এজন্য খুবই শক্তিশালী স্রোত প্রয়োজন। সমুদ্রের তলদেশের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে পাওয়া শক্তিও ব্যবহার করা যাবে।

এ প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকসমূহের মধ্যে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের ক্ষতি, প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস, তীরে আগত স্রোতের শক্তিক্ষয় ইত্যাদি বিবেচ্য। যাহোক, সমুদ্রকে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন প্রযুক্তি এখনও এতটা উন্নত হয়নি যে তা বাণিজ্যিকভাবে বড়ো একটা স্থান দখল করে নিবে।

এ বিষয়ে প্রয়োজন প্রচুর গবেষণা আর আগ্রহ। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শক্তির উৎস হিসেবে সমুদ্রের অপার সম্ভাবনার বিষয়ে আমাদের এখনই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

রওনা দিলাম ৬৩ মিটার নিচ থেকে। ২৪ মিটার নিচে এসে থামলাম। এখানে দেখা পাওয়া যাবে—Pilchard (হেরিং মাছ) এবং Polar bear-এর (মেরু সাদা ভাল্লুক)।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ

অঙ্কন: সমুদ্র জিত সাহা

অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের জীববৈচিত্র্য

ইমদাদুল হক আফনান

এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। এর নাম এসেছে গ্রিক মিথোলজি থেকে। গ্রিক মিথোলজিতে "Atlantic" অর্থ "sea of atlas"। এর অ্যারিয়া ৬,০৬,৪৬০,০০০ বর্গকিলোমিটার। অ্যাভারেজ গভীরতা ৩,৬৪৬ মিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা ৮,৩৭৬ মিটার বা ২৭,৪৮০ ফুট (পুর্তো রিকো ট্রেঞ্চ) । এটি পশ্চিমে আমেরিকা এবং পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকার মাঝে বিস্তৃত।

Walrus:

অ্যাটল্যান্টিক ওয়ালরাসের বৈজ্ঞানিক নাম *Rosmarus rosmarus* (Linnaeus, 1958)। ওয়ালরাস তার ফ্যামিলি 'Odobenidae' এবং গণ *Odobenus* এর একমাত্র জীবিত প্রজাতি। পুরুষ ওয়ালরাসদের গড় ভর ৯০০ কেজি আর নারীদের গড় ভর ৫৬০ কেজি। সদ্য জন্ম হওয়া ওয়ালরাস ১-১.৪ মিটার লম্বা হয় এবং ভর ৩৩-৮৫ কেজি হতে পারে। এদের বডি শেইপের সাথে সি লায়ন এবং সিলের মিল আছে।

Atlantic Bluefin Tuna:

এদের বৈজ্ঞানিক নাম *Thunnus thynnus*। এরা 'Scombridae' ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত। মাথা মোচাকার, মুখ লম্বা হয়। মাথায় 'Pineal window' থাকে যার ফলে কয়েক হাজার মাইল রেইঞ্জে ন্যাভিগেইট করতে পারে। শরীরের ওপরে ডার্ক ব্লু আর নিচে ধূসর হয়। ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্যের থেকে আলাদা করা যায় বক্ষের তুলনামূলক ছোটো পাখনা দেখে। এরা ১৫-৩০ বছর বাঁচে। ভর ২২০-২৫০ কেজি হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত ভর হলো ৬৮০ কেজি। গড়ে ৬.৫ ফুট লম্বা হয়ে থাকে।

অমর প্রাণীরা

নাঈম হোসেন ফারুকী

১।

আপনার বয়স হয়েছে অনেক। এক জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন, শিখেছেন।

ইদানীং খাবারের খুব অভাব। গ্রামে দুর্ভিক্ষ চলছে। যুবকরাই খাবার পায় না, বুড়োদের কে দেখবে ? তার ওপর কিছুদিন আগে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, বাম পা-টা অচল হয়ে গিয়েছে।

ছোটোবেলায় অনেক স্বপ্ন ছিল, ডাক্তার হবেন জুকারবার্গআর বিল গেটসের দেখাদেখি ভার্সিটি ড্রপআউট হতে গিয়ে এখন হয়েছেন ঝালমুড়িওয়ালা।

সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করা দরকার।

তাই আপনি ফিরে গেলেন আপনার গুহায়। সেখানে রাখা আছে অ্যান্টি এইজিং মেশিন, আপনি ঢুকলেন সেখানে। মেশিনে শুয়ে থাকলে আস্তে আস্তে আপনার বয়স কমবে। আপনি বৃদ্ধ থেকে যুবক হবেন, তারপর কিশোর, শেষ পর্যন্ত একেবারে শিশু। তারপর বের হয়ে এসে পুরোটা জীবন নতুন করে শুরু করতে পারবেন।

এই কাজ আপনি পারবেন। কারণ আপনি মানুষ না। সমুদ্রের অমর জেলিফিশ Turritopsis dohrnii.

জেলিফিশদের জীবন এমনিতেই চরম উদ্ভট। ডিম ফুটে স্বাভাবিকভাবে অন্য প্রাণীদের মতো জেলিফিশের জন্ম হয় না। জন্ম হয় ছোটো, চ্যাপটা অণুজীবের মতো একটা প্ল্যানুলা লার্ভা। ওই লার্ভা কিছুদিন খায়দায়, ঘুরে বেড়ায়, তারপর একসময় শক্ত কোনোকিছুর সাথে লেগে যায়। ওইখান থেকে জন্মায় হাইড্রার মতো অদ্ভুত একটা জীব, নাম তার পলিপ। দেখতে গাছের মতো, ডালপালা আছে, এক জায়গায় লেগে থাকে, হাঁটাহাঁটি করে না। আবার কোষগুলো প্রাণিকোষ, নড়াচড়া করে, শিকার ধরে খায়।

গাছ বড়ো হলে কী হয়? ফুল ধরে, রাইট ? পলিপ বড়ো হলে ওইখান থেকে ফুলের মতো মেডুসা বের হয়। একটা গাছ, তাতে অনেকগুলো ফুল। একটা পলিপ থেকে অনেক মেডুসা। পলিপ গাছের ফুল, ওই মেডুসাগুলোই হলো আমাদের পরিচিত গোল গোল, থলথলে জেলিফিশ। গ্রিক দানব মেডুসার মাথা ভর্তি সাপ ছিল, আর তার চোখের দিকে তাকালে মানুষ পাথর হয়ে যেত। জেলিফিশদের

চোখ নেই, কিন্তু তার সুন্দর থলথলে শরীরটার চারপাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সাপের মতো অসংখ্য টেন্টাকল। প্রতিটাই মারাত্মক বিষাক্ত, ধরলে সাপের মতোই ছোবল দেবে।

একসময় মেডুসা বড়ো হবে। ছেলে মেডুসা মেয়ে মেডুসা বিয়ে করবে। ডিম পাড়বে। ডিম থেকে জন্ম হবে নতুন লার্ভার। সেখান থেকে জন্ম হবে নতুন পলিপ গাছের। তারপর বয়স হলে মেডুসা মারা যাবে। যদি না ...

যদি না সে অমর জেলিফিশ টুরিটপ্সিস হয়। সে মরবে না। খাবারের অভাব দেখলে সে হাত পা গুটিয়ে ছোটো হয়ে ফিরে যাবে শিশুকালের পলিপ অবস্থায়। ঠিক যেন প্রজাপতি আবার ফিরে গেল তার শুঁয়োপোকা দশায়। মুরগি ছোটো হয়ে ডিম হয়ে গেল।

তারপর সেখান থেকে আবার জন্ম হলো নতুন মুরগির, নতুন জেলিফিশের।

এইখানে একটা ক্যাচ আছে। ফুল ছোটো হয়ে যদি গাছ হয়ে যায়, ওই গাছ থেকে তো অনেকগুলো ফুল ফুটবে, একটা না। কোন ফুলটা আসল ফুল?

২।

এটা একটা দুঃস্বপ্নের গল্প।

Turritopsis

দস্তয়ভস্কি অনেক বড়ো ভুল করেছে। ড্রাগ লর্ড অ্যালবার্ট যখন ছেলেটার বুকে ছুরি চালিয়েছিল, আড়াল থেকে সব দেখে ফেলেছে সে।

তাকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না।

দস্তয়ভস্কিকে নিয়ে আসা হয়েছে জনমানবশূন্য জঙ্গলে। পাঁচজন মানুষ পাঁচ দিক থেকে চেপে ধরে তাকে হত্যা করল। তারপর লাশটা পাঁচ টুকরা করে, পাঁচটা বস্তায় ভরে পুঁতে ফেলল মাটিতে।

মৃত্যুর সময় তার কষ্ট হয়েছিল খুব, মুখ বাঁধা ছিল তাই চিৎকারও করতে পারেনি। করলে সে জোর গলায় জানিয়ে দিত : “আমি আবার আসব”।

কিছুদিন পরের কথা।

দস্তয়ভস্কির কাটা লাশ বড়ো হলো গর্তে।

ডান পা-টায় জন্ম হলো নতুন পেট বুক মাথা আর বাম পা।

বাম পা পেল একই রকম নতুন আরেকটা দেহ।

কাটা মাথাটার নতুন হাত, পা, বুক, পেট গজালো, সেও হলো আরেকটা মানুষ।

দস্তয়ভস্কি ফিরে এল পাঁচ কপি হয়ে। এই কাজ তার দ্বারা সম্ভব হয়েছে, কারণ সে-ও মানুষ না। সে হচ্ছে অমর ফ্ল্যাট ওয়ার্ম প্ল্যানেরিয়ান।
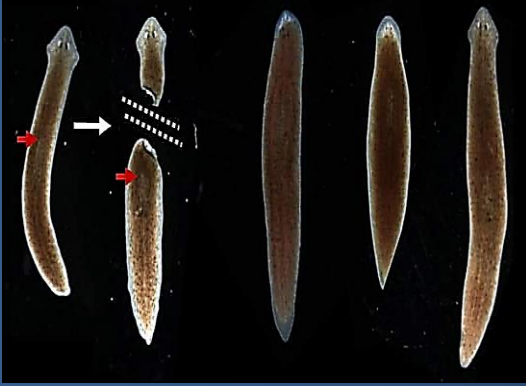
Planerian

প্ল্যানেরিয়ান হলো নিরীহ চেহারার একটা চ্যাপটা ক্রিমি। ক্রিমি হলেও সে বেশ স্বাধীনচেতা, নদী-সমুদ্রে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায়, পেটের ভেতর বন্দি জীবন তার পছন্দ নয়। এরা বুড়ো হয় না। জরা-মৃত্যু এদের স্পর্শ করে না। এদেরকে কুচিকুচি করে কাটলে প্রতিটা টুকরা বাকি অঙ্গগুলো তৈরি করে নেয়। মাথা কেটে ফেলে দিলে কাটা মাথাটায় জন্ম হয় নতুন পেট আর লেজ, লেজে জন্ম হয় নতুন মাথা।

মানুষের বয়স বাড়ার অন্যতম কারণ হলো-

প্রতিবার কোষ বিভাজনের সময় DNA-র শেষ অংশ টেলোমিয়ারের একটা অংশ হারিয়ে যায়। হারাতে হারাতে যখন DNA খুব ছোটো হয়ে যায়, ওই কোষ আর বিভাজিত হতে পারে না। টেলোমারেজ এনজাইম টেলোমিয়ারের ওই ভাঙা অংশ ঠিক করে দেয়। মানুষের জীবনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে টেলোমারেজ অনেক পরিমাণে থাকে, পরে আস্তে আস্তে কমে যায়। যেই হারে কোষ মরে সেই হারে কোষের জন্ম হয় না। মানুষ তাই আস্তে আস্তে বুড়িয়ে যায়।

প্ল্যানেরিয়ান সেরকম না। তার টেলোমারেজের কোনোদিন কমতি হয় না। তাই তার মাথা কেটে ফেললেও নতুন করে মাথার জন্ম হয়।

৩।

ভবিষ্যতে মানুষ কি অমর হবে ? জেলিফিশদের মতো বুড়ো থেকে শিশু হতে পারবে ? অথবা প্ল্যানেরিয়ানদের মতো বার্ধক্যকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারবে ? উল্লারিনের মতো হাত কাটলে কি নতুন হাত গজাবে ? মাথা কাটলে মাথা ?

মানুষ অনেক জটিল প্রাণী প্ল্যানেরিয়ানের তুলনায়। তারপরও গবেষণা চলছে। দেখা যাক।

৪।

এই যে অমর প্রাণীরা, এরা কি হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকে ? আসলেই মরে না ?

না। এরা মরে অন্য প্রাণীর শিকার হয়ে।

ভবিষ্যতে সত্যি যদি মানুষ অমর হয়, আর একের পর এক বাচ্চা দিতে থাকে, তাদের মৃত্যু কীভাবে ঘটানো হবে, ভাবলে ভয় লাগে।

৫।

মাথা কেটে ফেলার পর যে নতুন মাথাটা জন্মায় সেটাতে তো আগের কোনো স্মৃতি থাকার কথা না, সে তো একেবারে নতুন মানুষ, সরি প্ল্যানেরিয়ান, রাইট?

না, নতুন মাথাটা আগের স্মৃতি মনে রাখে।

কীভাবে, কেউ ঠিক জানে না।

গবেষণা চলছে।

৬।

গভীর সমুদ্রের আশ্চর্য জগতে আরও একবার স্বাগত!

আবার যাত্রা শুরু। এবার সোজা ১০ মিটার নিচে নামব। অর্থাৎ, ২৪ থেকে ৩৪ মিটার। এই ১০ মিটারের মধ্যে দেখা মিলবে Barramundi (ভেটকি সদৃশ মাছ) এবং Clown Fish (রঙিন মাছ)। এই ক্লাউন ফিশগুলো কিন্তু আমরা অ্যাকুরিয়ামে রেখে পালি।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ

ব্যাঙাচি

লিফি সি ড্রাগন
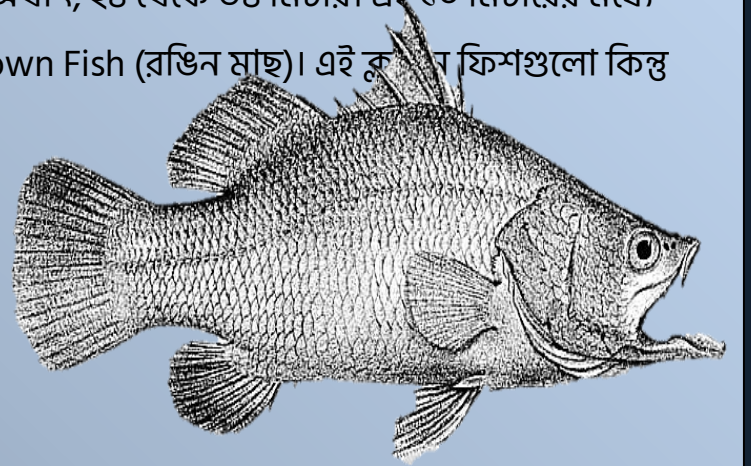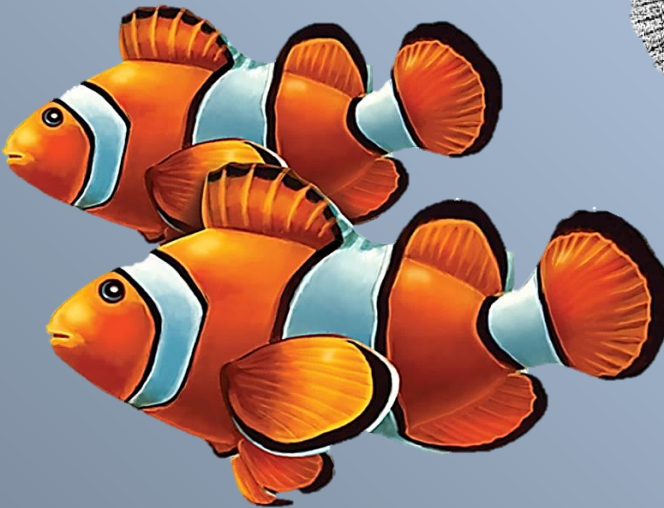
লিটন মির্জা

আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই লিফি সি ড্রাগনের সাথে। কী ? নাম শুনে আবার ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ? নিশ্চয়ই ভাবছেন, ওরে বাবা ! ড্রাগন ? এর মুখ দিয়ে কি আবার আগুন বের হয় নাকি ? না বন্ধুরা, চিন্তার কোনো কারণ নেই।

নাম ড্রাগন হলেও এটি খুবই ছোট্ট আর নিরীহ প্রাণী। আকারে ২০-২৪ সে.মি. এর চেয়ে বড়ো হয় না। আসলে এটির নামকরণ করা হয়েছে চীনের পৌরাণিক কাহিনিতে বর্ণিত এক কাল্পনিক ড্রাগনের নামে। কেননা এটি দেখতে সত্যি সত্যিই সেই ড্রাগনের মতো। আর সমুদ্রে থাকে বলে এর নাম সি ড্রাগন।

সি ড্রাগনের পুরো গা থেকেই পাতার মতো কিছু অংশ বেরিয়ে থাকে, এজন্যই এটির নাম লিফি সি ড্রাগন। তবে এসব পাতার মতো অংশ কিন্তু এর শরীরেরই এক একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এগুলোর সাহায্যে এরা সমুদ্রের তলদেশ আঁকড়ে ধরে রাখে, চলাফেরা করে আর খাবার খায়। তবে অদ্ভুত অথচ মজার ব্যাপারটা কি জানেন ? লিফি সি ড্রাগনের খাবার খাওয়ার পদ্ধতিটা কিন্তু একেবারেই সাধারণ নয়। কেননা মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণীদের মতো এদের দাঁত কিংবা পাকস্থলি কোনোটাই নেই। তাহলে ওরা খাবার খায় কীভাবে ? আর খায়-ই বা কী ? আসলে এরা এক বিশেষ পদ্ধতিতে খাবার খায়। আর সে পদ্ধতিতে খেতে ওদের না লাগে মুখ, না লাগে পাকস্থলি। এদের খাদ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিকণা আর বিশেষ এক ধরনের চিংড়ি। আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, সমুদ্রে সি ড্রাগন খুঁজে পাওয়া কিন্তু খুবই কঠিন। কেননা এদের গায়ে থাকে সবুজ, কমলা, সোনালিসহ আরও হরেক রঙের পাতার মতো সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যে কারণে এদেরকে অনেকটা ছদ্মবেশী বলেই মনে হয়। কেমন অদ্ভুত কথা বলেন তো !

দেখা গেল, আপনি অনেক কষ্ট করে সমুদ্রের নিচে গেলেন লিফি সি ড্রাগন দেখতে। অথচ এদের খুঁজেই পেলেন না। তখন তো আপনার নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ হবে, তাই না ? তবে একদম মন খারাপ করার

কিছু নেই। কেননা এরা যখন চলাফেরা করে অথবা খাবার খেতে বেরোয় তখন এদের অদ্ভুত দেহের কারণে খুব সহজেই চোখে পড়ে যায়।

কল্পনা করেন, সমুদ্রের স্বচ্ছ পানিতে এরকম বাহারি রঙের অসংখ্য সি ড্রাগন ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে কতই না সুন্দর লাগবে ! তবে সমুদ্রের এ সৌন্দর্য আপনি কিন্তু সব জায়গায় দেখতে পাবেন না। এদের দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়। কারণ, শুধু অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ আর পশ্চিম উপকূলেই এদের দেখা মেলে। আর সবচাইতে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এই লিফি সি ড্রাগনের জন্য প্রতি বছর দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় সরকারিভাবে এক উৎসবও পালিত হয়। অর্থাৎ, বুঝতেই পারছেন, দেখতে কিম্ভূতকিমাকার হলেও এদের গুরুত্ব কিন্তু নেহায়েত কম নয়!

আবারও নিচে নামা শুরু। ৪০ মিটার নিচে যখন পৌঁছব, তখন দেখব মখমলের মতো নরম কাঁকড়া, যাকে বলে velvet crab। প্রতি বছর হাজার হাজার কেজি এই কাঁকড়া মানুষ সমুদ্র থেকে তুলে নিজেদের খাবার এবং বপ্তানিতে কাজে লাগায়।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।
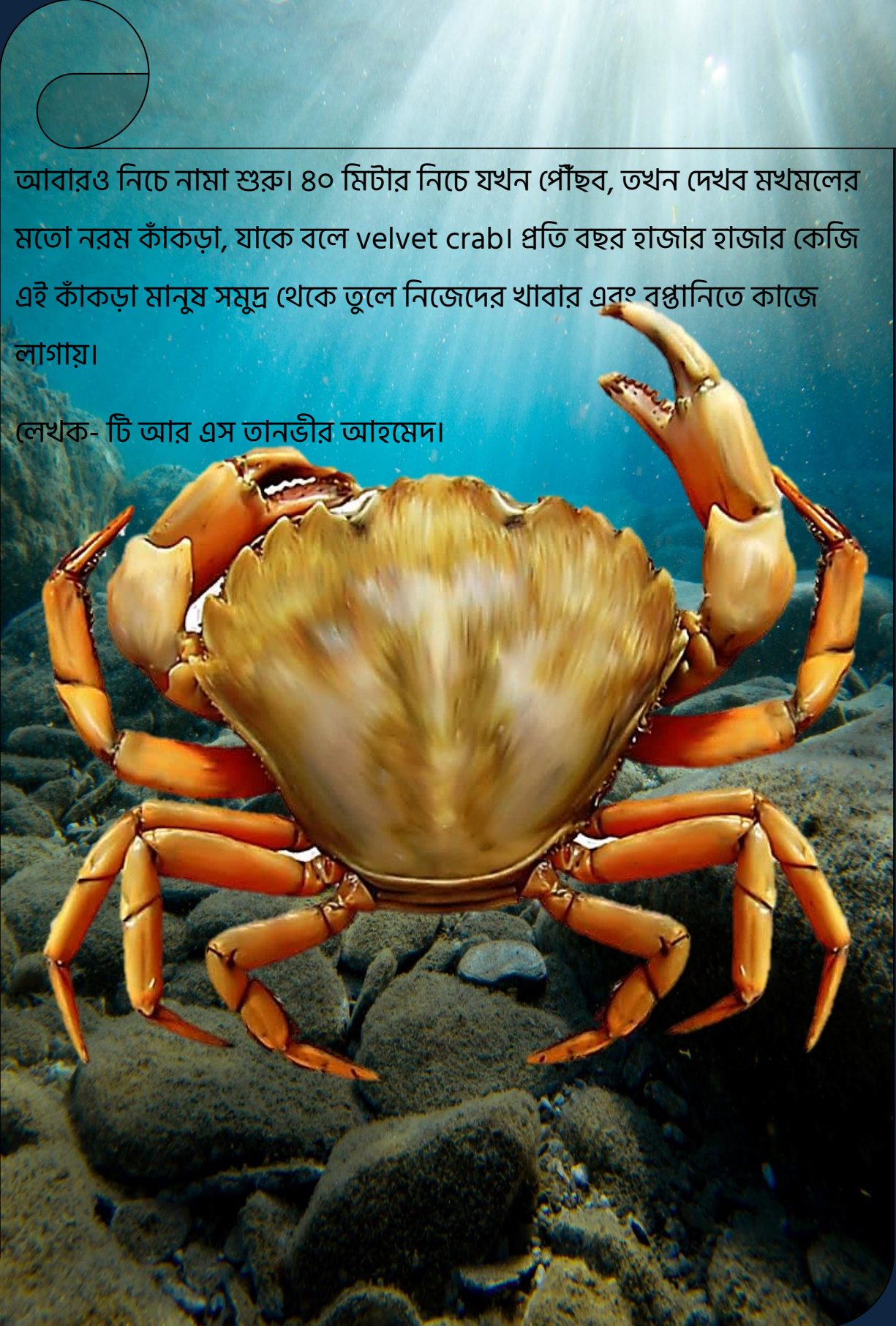
৪০ মিটার থেকে ৪২ মিটার। এই গভীরতার মধ্যে দেখা মেলে তীব্র নীল মাছ বা Blue Tang।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ

ন্যাভিগেশন

মাহতাব মাহদী

"If you want to learn to pray, go to sea."

—Portuguese proverb

"...অথবা খুব বিশাল সমুদ্রের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার মতো..."

এভয়েড রাফার কষ্ট গানের এই লিরিক্স দিয়ে বোঝা যায় কষ্ট আসলে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার মতোই। আপনার মনে কখনও প্রশ্ন জাগে না ? যেখানে আমরা নিজেদের পাড়ার মধ্যেই হারিয়ে যাই, এই বিশাল সমুদ্র, মহাসমুদ্রে আমরা হারাই না কেন ? হারিয়েছিলাম একসময়। অনেক দক্ষ নাবিক, ক্রু, জাহাজ হারিয়েছিলাম। কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এই সমস্যা সমাধানের পথ বের করে নিয়েছি। সেটা অবশ্যই এক দিনে হয়নি, কয়েক শতাব্দী লেগেছে !

ন্যাভিগেশন ব্যতীত আমরা খুব সম্ভবত সমুদ্রের কাছে হারিয়ে যাব। ন্যাভিগেশনের সাহায্যে প্রাচীন-প্রাথমিক সভ্যতার পক্ষে নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করা, বাণিজ্য রুট স্থাপন এবং বিশ্বের অন্য পাশের লোকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। ন্যাভিগেশন মৎস্যজীবীদের বিদেশের সমুদ্র বন্দরে নিরাপদে যাত্রা করার জন্য এবং তাদের বাড়ি ও বাণিজ্য জাহাজগুলো খুঁজে পাওয়ার সুবিধা দেয়। আজ অনেক নিখুঁত ও সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ন্যাভিগেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে জাহাজ, বিমান এবং ট্রাককে নির্দেশ দিয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি।

ম্যারিন ন্যাভিগেশন প্রাচীন পদ্ধতিতে তারার সাথে ন্যাভিগেট করা থেকে বর্তমানে স্যাটেলাইটের সাথে জাহাজের অবস্থান সন্ধান করা পর্যন্ত অনেক দূর এগিয়েছে। আসুন আমরা ন্যাভিগেশনের আকর্ষণীয় ইতিহাস এবং সামুদ্রিক ন্যাভিগেশনের সরঞ্জামগুলো সম্পর্কে জানি, যা আমাদের আজ এই আধুনিক ন্যাভিগেশন সিস্টেমে নিয়ে এসেছে।

এই আর্টিকেলে সব বিষয়ই খুব ছোটো ছোটো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব যাতে আপনি সাগরের ন্যাভিগেশন সিস্টেম এর সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত হতে পারেন। বিস্তারিত জানতে হলে আর্টিকেলের শেষে উল্লেখ করা কিছু আর্টিকেল বা বই পড়তে পারেন।

এখানে যা যা নিয়ে আলোচনা করব :

A) ন্যাভিগেশনের সূচনা: কেন দরকার হলো ন্যাভিগেশন ? কীভাবে শুরু হলো ?

B) প্রাচীন ন্যাভিগেশন পদ্ধতির আদ্যোপান্ত:

১) সূর্য দেখে দিক নির্ণয়
২) তারার সাহায্যে ন্যাভিগেট করা
৩) সামুদ্রিক পাখিদের অনুসরণ
৪) আবহাওয়া ও বাতাস পর্যবেক্ষণ
৫) Dead reckoning (মৃত হিসাব)

C) ব্যাসিক ন্যাভিগেশন যন্ত্রপাতি(যা এখনও ব্যবহার করা হয় মাঝে মাঝে):

১) গভীরতা ও গতি পরিমাপের সরঞ্জাম
২) ম্যারিনার্স কম্পাস
৩) ন্যাভিগেশন চার্ট
৪) জ্যোতির্বিদীয় ন্যাভিগেশন সিস্টেম
5) ক্রোনোমিটার দ্বারা ন্যাভিগেট
(প্রাচীন ন্যাভিগেশনের শেষ ধাপ)

A) ন্যাভিগেশনের সূচনা : কেন দরকার হলো ন্যাভিগেশন ? কীভাবে শুরু হলো ?

সমুদ্রে ন্যাভিগেশনের প্রথম দিনগুলোতে নাবিকেরা উপকূল রেখার ওপর দিয়ে ভ্রমণ করতেন এবং সর্বদা স্থলে দৃষ্টি রাখতেন, অর্থাৎ তীরের কাছাকাছি থাকতেন। নাবিকরা সমুদ্রের দিকে তাদের অগ্রগতি অনুমান করতেন এবং তাদের ভৌগোলিক অবস্থান অনুমান করার জন্য উপকূলে ল্যান্ডমার্কগুলোর (স্থলচিহ্ন) মধ্যে দূরত্বের বিবেচনা করতেন। চেনা যায় এমন চিহ্নগুলি ব্যবহার করে জেলেরা ভালো ফিশিং-এর জায়গাগুলোতে ফিরে যেতে পারতেন এবং ব্যবসায়ীরা দূরবর্তী বন্দরগুলোতে যেতে পারতেন।

কিন্তু এই ভিজ্যুয়াল ন্যাভিগেশন কৌশলটি ব্যবহার করার ফলে সমুদ্র ভ্রমণ তীরের কাছাকাছি সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কুয়াশাচ্ছন্ন দিনগুলোতে বা আলো কম ছিল এমন সময় ভ্রমণ চ্যালেঞ্জিং হয়ে যেত। নাবিকরা কেবল জাহাজ থেকে দূরের বালুচর অনুসরণ করতে পারতেন। সেসময় নাবিকেরা সমুদ্রের স্রোত এবং বাতাসের ওপর নির্ভর করে অনুমানের ওপর গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করতেন।

সময়ের সাথে সাথে নাবিকরা গভীর বিশাল সমুদ্রের পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য ন্যাভিগেশনের নতুন পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবন করেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীনকালের প্রাথমিক ন্যাভিগেটররা সূর্য, তারা এবং তাদের আশেপাশের অন্যান্য উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে (আশ্চর্যজনকভাবে) সঠিক ন্যাভিগেশন কৌশল তৈরি করেছিলেন, যা এখনও কার্যকর এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহারও করা হয় বটে।

সেগুলোর কিছু পদ্ধতি-ই নিচে আলোচনা করা হলো :

“To reach a port we must set sail –

Sail, not tie at anchor

Sail, not drift.”

B) প্রাচীন ন্যাভিগেশনাল পদ্ধতি:

১) সূর্য দেখে দিক নির্ণয়

সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। কোনো জাহাজের দিক নির্ধারণের অন্যতম সহজ পদ্ধতি হলো আকাশ জুড়ে সূর্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ। নাবিকরা সূর্যের অবস্থান পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের রুটকে গাইড করে। দুপুরে ও বিকালে সূর্যের ছায়া পর্যবেক্ষণ করে উত্তর ও দক্ষিণ নির্ধারণ করতে পারত এবং এখনও পারে।

২) তারার সাহায্যে ন্যাভিগেট :
রাতে যখন সূর্য ডুবে যেত, নাবিকরা তখন তারাগুলো ন্যাভিগেশনে ব্যবহার করত। তারাগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিমে আকাশের দিকে চলে এবং কিছু তারা, যারা হরাইজন বা দিগন্তের নিচে তাদের রাতের পথ শুরু করে এবং শেষ করে যাদের ধ্রুবতারা বলে। নাবিকরা যেভাবে সূর্যের গতিবিধি দেখেছিলেন সেভাবে রাতে তারাদের নড়াচড়া দেখে তাদের ধ্রুব তারা নামকরণ করেন। নাবিকরা তাদের অবস্থান ট্র্যাক করতে আকাশের তারাগুলোর সাহায্য নিতেন।

আকাশে রাতে যত উজ্জ্বল বস্তু দেখা যায়, সব কিন্তু তারা নয়। কিছু গ্রহও আছে। তারা ও গ্রহের মধ্যে পার্থক্য করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, তারাগুলো আকাশে মিটিমিটি করে, যা গ্রহগুলো করে না। রাতের আকাশের প্রধান দুটি উজ্জ্বল বস্তু, যা আমরা দেখি তা কিন্তু তারা নয়, এগুলো গ্রহ। এরা হচ্ছে শুক্র ও বৃহস্পতি। তারার ক্ষেত্রে আমরা কী দেখি ? সন্ধ্যায় পূর্ব দিক থেকে উঠে রাতে পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছে, তাই তো ? এখন যদি প্রতিটি তারাই এভাবে একদিক থেকে উঠে অপরদিকে অস্ত যায় একইভাবে, আপনার পক্ষে কি কোনো নির্দিষ্ট তারা নির্ণয় করা ও তা দ্বারা দিক নির্ণয় করা সম্ভব ? কখনোই না। তার মানে, অবশ্যই কিছু তারা আছে যেগুলো একদিকে নির্দিষ্ট থাকে। নাহলে তারা চিনবই বা কীভাবে আর দিকই বা কীভাবে নির্ণয় করব ? এই তারকার নাম ধ্রুবতারা। ইংরেজিতে বলে পোলারিস (Polaris) বা মেরু তারা (Pole Star)। এই তারাটা উত্তর দিকে থাকে।

দেখুন, ধ্রুবতারা থাকে উত্তর আকাশে। অর্থাৎ যেদিকে আপনি ধ্রুবতারা খুঁজে বের করবেন, তার বিপরীত দিকটা দক্ষিণ, ডানে পূর্ব, বায়ে পশ্চিম। এই তো কাজ হয়ে গেল !

তো, খুব সুন্দর আপনি ধ্রুবতারা বের করলে দিক নির্ণয় করতে পারবেন অর্থাৎ সফলভাবে ন্যাভিগেশন করতে পারবেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাতে তো আকাশে আপনি অনেক তারা দেখতে পারবেন। এখন আপনি কীভাবেই-বা

ধ্রুবতারা খুঁজে বের করবেন আর কীভাবেই-বা খুঁজবেন উত্তর দিক ? এখানে আপনাকে হেল্প করবে সপ্তর্ষিমণ্ডল বা Ursa Major।

সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) মূলত একটি তারামন্ডল (Constellation)। এর মধ্যে প্রধান সাতটি তারকা একটি চামচের মতো আকৃতি তৈরি করেছে। এই সাতটি তারকাকে উত্তর আমেরিকায় বলে বিগ ডিপার (The Big Dipper) আর ইউরোপে বলে লাঙল (Plough)। এই সাতটি তারকা খুঁজে পাওয়া মোটামুটি সহজ। সাতটি তারকার ৩ টি মিলে চামচের বাঁট আর বাকি চারটি তৈরি করেছে মাথা। ছবিতে দেখুন।। প্রথম ছবিতে খুঁজে নেবার চেষ্টা করে ২য় ছবি থেকে মিলিয়ে নিন।
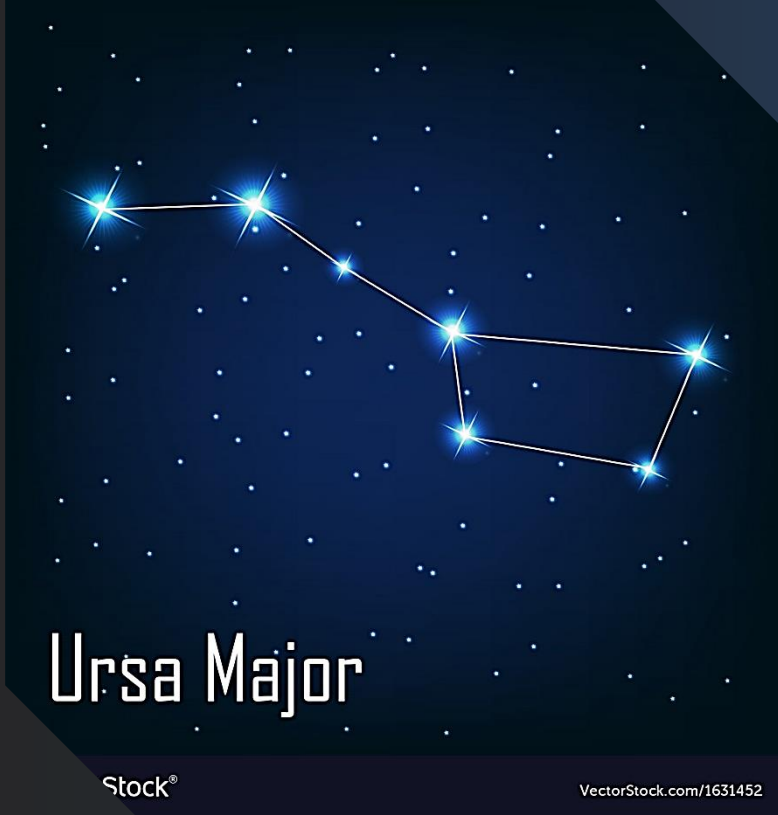
সপ্তর্ষিমণ্ডলের শীর্ষের যে চারটি তারকা মিলে বাটির ন্যায় আকৃতি গঠন করেছে, সেদিকে তাকান। মাথার ডানদিকে যে দুটো তারা আছে (যেদিকে চামচের হাতল নেই) সেই দুটো তারা কাল্পনিকভাবে

যোগ করে আরো একটি সরলরেখা আঁকুন। সামনের দুই তারকা মিলে যে দৈর্ঘ্য হয়, তার চাইতে আরো ৬ গুণ বেশি দূরত্বে যান, একটি মাত্র উজ্জ্বল বস্তু দেখতে পারবেন, যেটা মিটমিট করে না। এটাই হচ্ছে আপনার শুক্রগ্রহ বা শুকতারা।

এই তো পেয়ে গেলেন সপ্তর্ষিমণ্ডল। এখন ?
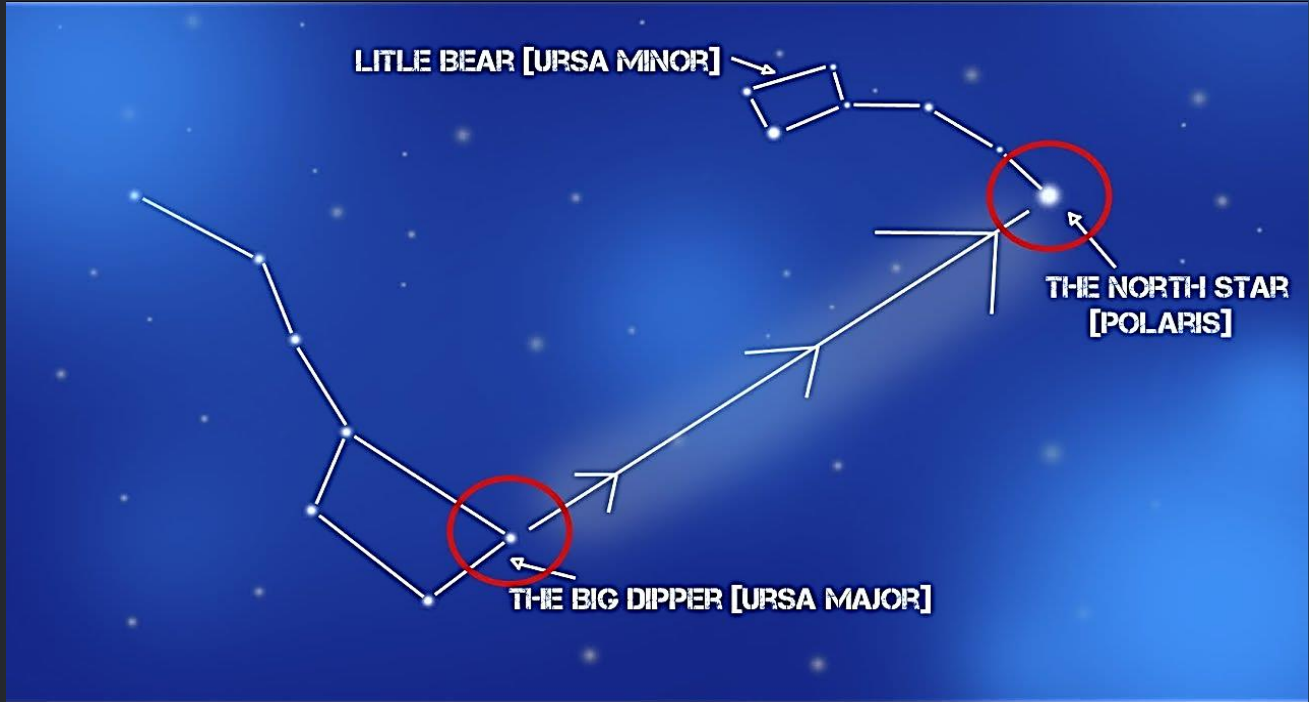
এই তো পেয়ে গেলেন। কঠিন লাগছে ? প্রথম প্রথম একটু কঠিন লাগতেই পারে, চর্চা করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে মনে রাখবেন, এটা কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলের অংশ নয়। শুধুমাত্র ধ্রুবতারা চেনার একটা মাত্র উপায় হিসেবে আমরা সপ্তর্ষিমণ্ডল ব্যবহার করেছি। আরেকটা সপ্তর্ষিমন্ডল আছে, আকারে ছোটো কিন্তু দেখতে এর উলটো, সেটা দিয়েও ধ্রুবতারা বা পোলার স্টার নির্ণয় করা সম্ভব। নিচের চিত্রটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে, পোলার স্টার আসলে ছোটো সপ্তর্ষিমণ্ডল যার আসল নাম LITLE BEAR এর একটা অংশ। ঠিক এভাবেই তারার সাহায্যে ন্যাভিগেট করা হতো ।

আপনাকে অভিনন্দন ক্যাপ্টেন, আপনিও সফলভাবে আপনার জাহাজ ন্যাভিগেট করতে পারবেন !

৩) সামুদ্রিক পাখিকে অনুসরণ:

অনেক দিন আগের একটি ঘটনা। একটি জাহাজ তার পথ হারিয়ে ফেলেছে। অনেক চেষ্টা করেও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এমন সময় একজন ক্রু একটি পাখি দেখেন যার মুখে সম্ভবত একটি মাছ ছিল এবং এটি তা খেতে খেতে জমির দিকে ফিরে যাচ্ছিল। তখন সামুদ্রিক পাখিটিকে লক্ষ্য করে নাবিকেরা স্থলবন্দর খুঁজে পেয়েছিলেন। ব্যাস ! তৈরি হয়ে গেল ন্যাভিগেশনের আরেক অধ্যায় ! ন্যাভিগেশনের এই পদ্ধতিটি উত্তর অক্ষাংশে কার্যকর ছিল যেখানে গ্রীষ্মে একাধিক মাস তারাগুলো দেখা যেত না। কখনো কি ভেবে দেখেছেন যে, পাখিরা কীভাবে দিক নির্ণয় করে ? এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেকরকম থিওরিও এসেছে। তবে সম্প্রতি হয়ে

যাওয়া এক গবেষণায় জানা গিয়েছে এক নতুন তথ্য।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, “পাখিরা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র বুঝতে পারে, যা তাদের দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করে।” অবশ্য এই ধারণা নতুন। আগে গবেষকরা ভাবতেন, পাখির ঠোঁটে আয়রনসমৃদ্ধ কোষ থাকে যা ক্ষুদ্র কম্পাস হিসেবে কাজ করে। তবে নতুন গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, পাখির চোখে বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকে, যার কারণে চৌম্বকক্ষেত্র দেখতে পায় তারা।

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় মূলত কোয়ান্টাম মেকানিজম কাজে লাগিয়ে। প্রোটিনের কোয়ান্টাম ইন্টার‍্যাকশন বা প্রতিক্রিয়া পাখিদের চৌম্বকক্ষেত্রের অবস্থান সম্পর্কে জানান দেয়। আগের তত্ত্ব বলে, পাখিরা আকাশে ওড়ার সময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করে চৌম্বকক্ষেত্র দেখে।

অ্যাভিয়ান প্রাণীদের ক্ষেত্রে, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের অবস্থান অনুযায়ী তাদের চোখে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এসব প্রতিক্রিয়া পাখির চোখের বিভিন্ন রঙে চৌম্বকক্ষেত্রের সম্ভাব্য চিত্র তৈরি করে। তবে এই চিত্রগুলো খুব নির্দিষ্ট করে কোনো অবয়ব বোঝায় না। শুধু চৌম্বকক্ষেত্রের নড়াচড়া অনুযায়ী সাদা ও কালো রঙের ছায়ার মতো হয়।
যখন আলোককণা পাখির চোখে প্রবেশ করে তখন এটি ক্রিপ্টোক্রোমসে (রেটিনায় আলো-সংবেদনশীল বিশেষ প্রোটিন ক্রাই ফোর, Cry4) পড়ে। ফলে এটি তাড়িত হয় আর কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গল তৈরি করে। এটি এমন একটি অবস্থা যখন ইলেক্ট্রনগুলো আংশিকভাবে আলাদা হয়। তবে এ অবস্থাতেও একে অন্যের সাথে যোগাযোগ ও প্রতিক্রিয়া করতে পারে এসব ক্রিপ্টোক্রোমস।
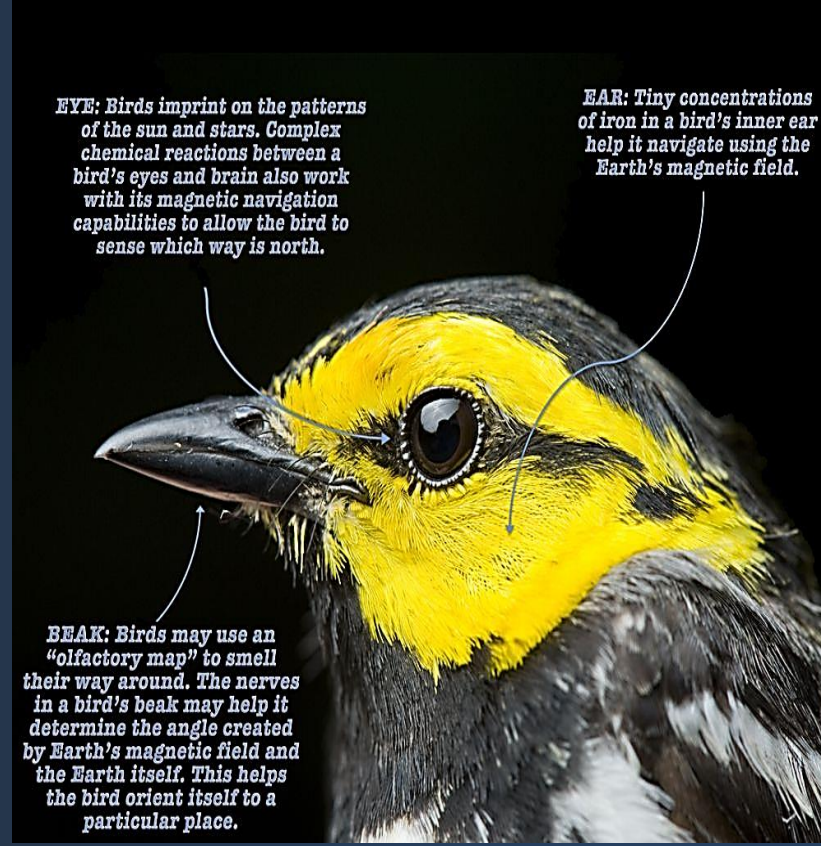
মানুষের চোখে ফটোরিসেপটিভ কোনগুলো তিন ধরণের হয়। প্রতিটি কোন লাল, সবুজ ও নীল রঙের আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয় যাকে ট্রাইক্রোমাটিক কালার ভিশন বলে। এই অতিরিক্ত একটি কোনের কারণে পাখিরা আলোকরশ্মি ছাড়াও আল্ট্রাভায়োলেট ফ্রিকোয়েন্সিও দেখতে পায়।

এভাবেই পাখিরা দিক নির্ণয় করে স্থলপথ খুঁজে পায় এবং তাদের দেখে আগেকার নাবিকরা দিক নির্ণয় করতে পারতেন।

৪) আবহাওয়া ও বাতাস পর্যবেক্ষণ :

নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোতে প্রাচীনকালের ন্যাভিগেটররা বাতাস এবং পানির স্রোতের ভিত্তিতে তাদের দিক নির্ধারণ করতে পারতেন। ভূমধ্যসাগরে নাবিকরা গরম দক্ষিণ বাতাস এবং ঠান্ডা উত্তর বাতাসের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। অবশেষে আট ধরনের প্রধান বাতাসের নামকরণ করা হয়েছিল এবং এই বাতাসের দিকগুলি পূর্ব দিকের সমুদ্রের চার্টগুলোতে চিহ্নিত wind rose (যেখানে সব বাতাস একসাথে এক বিন্দুতে মিলিত হয়) বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

কিছু নাবিক ও দক্ষ পাইলট সমুদ্রের ওপরে তাদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বাতাসের দিক এবং প্রকার (মূলত তাপমাত্রা) দেখেছিলেন। পলিনেশিয়ানের (নিউজিল্যান্ডের আশেপাশের এলাকা) নাবিকরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর মধ্যে খোলা সমুদ্রকে ভালোভাবে ন্যাভিগেট করতে আঞ্চলিক আবহাওয়ার নিদর্শনগুলো খুব ভালোভাবে অনুসরণ করতেন। প্রায় ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে, পলিনেশিয়ান নাবিকরা মার্কসাস দ্বীপপুঞ্জ থেকে হাওয়াই পর্যন্ত ২,৩০০ মাইল ভ্রমণ করতে সক্ষম হন এবং তারা দিক ঠিক রাখেন বাতাস ও আবহাওয়ার দিক ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

৫) Dead Reckoning (মৃত হিসাব) :

এটা ন্যাভিগেশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল একটা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ন্যাভিগেট করতে কিছু জিনিস জানা থাকতে হয় :

১) জাহাজের বেগ
২) জাহাজটি কোন দিকে যাচ্ছে
৩) কত সময় ধরে যাচ্ছে

জাহাজটিকে সঠিক পথে চালিত করতে ভ্রমণের সময় ন্যাভিগেটরদের রেকর্ড রাখতে হয়। জাহাজের অতীতের অবস্থানের ভিত্তিতে নাবিকরা উপসাগরের যাত্রার সময় সম্পূর্ণ সঠিকভাবে তাদের বর্তমান অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে।

তবে এই পদ্ধতিতে হিসাবটা জাহাজের আদি অবস্থানের ওপর খুব বেশি নির্ভর করে। নাবিকরা যদি তাদের গণনায় একটি ছোটো ভুলও করেন তবে তাদের পথ অনেক দূরে সরে যেতে পারে। আবার, এই প্রসেস সমুদ্রের স্রোত এবং বাতাসের জন্য আলাদা করে কোনো হিসাব করে না, তাই Dead Reckoning ব্যবহারকারী জাহাজগুলো তাদের গণনা সঠিক রাখলেও ভুল পথে যেতে পারে। আগেরকার নাবিকদের অত্যাধুনিক ন্যাভিগেশন প্রযুক্তির অভাব ছিল বলে Dead Reckoning ব্যবহার করার সময় ন্যাভিগেশনাল ভুলগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া ও তা সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন ছিল।

ব্যাসিক ন্যাভিগেশন যন্ত্রপা্তি:

প্রাচীনকাল থেকে নাবিকরা তাদের গতি, অবস্থান এবং ভ্রমণের দিক নির্ধারণের জন্য সামুদ্রিক ন্যাভিগেশন সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করতেন। যদিও এই যন্ত্রগুলো প্রথমে অনুন্নত ও প্রাচীন ছিল, পরে গণিত এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আরও উন্নত ন্যাভিগেশন সরঞ্জামের বিকাশ ঘটে, যা সমুদ্র ভ্রমণকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে।

তারা ও সূর্যের ছায়ার কোণ পরিমাপ করে আগের দিনের নাবিকদের এই অনুমান করে নিতে হতো যে দিগন্ত (হরাইজন) থেকে তারা কত দূরে ছিল এবং এর ভিত্তিতে তাদের অক্ষাংশ নির্ধারণ করতে হয়েছিল। নাবিকরা পরে অবশ্য আকাশের বিভিন্ন তারার সাহায্যে অক্ষাংশটি সহজেই নির্ধারণ করতে পারতেন, তবে ক্রনিকোমিটার (দ্রাঘিমা নির্ণয়ের যন্ত্র) আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত দ্রাঘিমাংশ সঠিকভাবে মাপা যায়নি। এই দুর্দান্ত প্রযুক্তি, সাথে মহাকাশীয় ন্যাভিগেশন (তারা) এবং সঠিক সমুদ্রের চার্টের প্রতিনিয়ত আপডেটের ফলে এবং একই সাথে বিদ্যমান সরঞ্জামগুলোর সাথে নাবিকদের দক্ষতা, অনুসন্ধানকারীদের নির্ভুলতা একসাথে বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ সম্ভব করে তুলেছিল।

১) গভীরতা এবং গতি পরিমাপের সরঞ্জাম :

ধরুন, আপনার কাছে একটা লম্বা দড়ি আছে, যার নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর একট গিঁট দেওয়া। মোট ১০০ টা গিঁট আছে দড়িতে। এরপর আপনি পানিতে ওই দড়িটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে থাকলেন। দড়ির নিচে একটা ভারী জিনিস চাপিয়ে দিলেন যাতে মাটিতে ঠেকলে বুঝতে পারেন। এরপর দেখলেন ৭০ গিঁট যাওয়ার পরে ওজনটা মাটিতে ঠেকল বলে মনে হলো আপনার। তো গভীরতা কত ? ৭০ গিঁট। ব্যাস।

ঠিক এই পদ্ধতিতেই পূর্বে গভীরতা নির্ণয় করা হতো। প্রচীনকালে জাহাজের ডেকের তলদেশে এরকম একটা দড়ি লাগানো ছিল, যাকে বলা হতো লিডলাইন। লিডলাইনের শেষের দিকে সীসার তৈরি ভারী একটা বস্তু লাগানো ছিল। জাহাজের নাবিকেরা এভাবে গভীরতা নির্ণয় করে বুঝতেন যে, ওই জায়গাটায় চলাচল নিরাপদ হবে কিনা।

ষোড়শ শতকের সময় চিপ লগের আবিষ্কার নাবিকদের তাদের আনুমানিক গতি আরও নির্ভুলভাবে গণনা করতে দেয়। চিপ লগ হলো একটা দড়ির মতো, যার নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর গিঁট বা নট দেওয়া থাকে। এর প্রান্তে থাকে একটা ভাসমান বস্তু। জাহাজ থেকে বস্তুটাকে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। একজন নাবিক দড়িটার একটা প্রান্ত ধরে থাকেন। নির্দিষ্ট সময় পরে দেখা হয় যে কত গিঁট পথ অতিক্রম করেছে। ওটাকে পরে ঘণ্টায় পরিণত করে বেগ মাপা হত এবং এখনও হয়।

ওই যে দেখলেন কত গিঁট পথ যায় তা হিসাব করে, ঐ জন্যই জাহাজের স্পিড নটিক্যাল মাইলে প্রকাশ করা হয়। পূর্বে জাহাজের স্পিড প্রকাশ করা হত Knots এ। knot এর বাংলা অর্থই হচ্ছে গিঁট

জাহাজের গতি নির্ণয়ে চিপ লগ ছিল পূর্বের সকল পদ্ধতির চাইতে উন্নত। আগে জাহাজ থেকে ধনুক ফেলে দিয়ে, পাথর ছুড়ে বা নির্দিষ্ট দূরত্ব পার হয়ে যেতে কত সময় লাগছে, তার মাধ্যমে জাহাজের বেগ বের করার চেষ্টা চলত, কিন্তু সেগুলোতে ভুলের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। চিপ লগ পদ্ধতিতে ভুলের পরিমাণ এতটাই কম যে বর্তমানেও এর পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

২) ম্যারিনার্স কম্পাস :

কম্পাস হলো প্রথম দিকের ন্যাভিগেশনাল সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি এবং এটি বর্তমানেও সামুদ্রিক ন্যাভিগেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যদিও কম্পাসটি প্রথম কে আবিষ্কার করেছিল তা জানা যায়নি। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৩ হাজার বছর আগে চীনা সেনাবাহিনী তাদের সৈন্যদের পরিচালনা করার জন্য চুম্বকীয় লোহা ব্যবহার করার গল্প রয়েছে। পৃথিবীর পশ্চিম অংশে সমুদ্রের ন্যাভিগেশনের জন্য প্রথম কম্পাস ব্যবহার হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে, আলেকজান্ডার নেকহ্যামের দ্বারা।

প্রথম দিকের ন্যাভিগেটররা আকাশের তারার সাহায্যে ন্যাভিগেশনের ওপর প্রচুর নির্ভরশীল ছিল। তবে মেঘলা দিনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ন্যাভিগেশন প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। এর জন্য তৈরি হয় ম্যারিনার্স কম্পাস। প্রথম দিকের ম্যারিনার্স কম্পাসগুলো এক টুকরা কাঠের সাথে একটি চুম্বকের ন্যায় কাঁটাকে একটি বাটিতে পানির মধ্যে রেখে দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তখনকার দিনে আজকালকার মতো কম্পাস সহজলভ্য ছিল না আর এর আকৃতিও এত ছোটো ছিল না।

৩) ন্যাভিগেশন চার্ট :

প্রাচীনকালে সব নাবিক কিন্তু ইচ্ছা করলেই সমুদ্র ভ্রমণে যেতে পারত না। কারণ তাদের কাছে যথাযথ ম্যাপ ছিল না যে কীভাবে যেতে হবে, কোন দিকে

যেতে হবে। এরপর সব নাবিক যৌথ উদ্যোগে এই ন্যাভিগেশন চার্ট বানান। এই চার্টে সমুদ্রের বিস্তারিত ম্যাপ দেওয়া ছিল, যাতে একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গায় যাওয়ার রুট ও আশেপাশের দ্বীপগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেত।

প্রথমদিকে এই পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। কারণ আগেরকার নাবিকেরা যে ল্যান্ডমার্ক ব্যবহার করতেন, তা পরে নষ্ট হয়ে যেত বা খুঁজে পাওয়া যেত না। যার ফলে সকল নাবিকই যাওয়ার সময় পুরাতন ন্যাভিগেশন চার্টটার সাথে মিলিয়ে যেসব ল্যান্ডমার্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, সেগুলো রিপ্লেস করতেন। তারপরে একই রুটে যাওয়া নাবিকেরাও একই ধারা বজায় রাখলেন। এভাবে ক্রমাগত সংশোধনের মাধ্যমেই ন্যাভিগেশন চার্টের সুফল পাওয়া শুরু করি আমরা। ন্যাভিগেশন চার্ট হচ্ছে প্রাচীন ন্যাভিগেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

৪) জ্যোতির্বিদীয় ন্যাভিগেশন সিস্টেমগুলো:

বিশ্বজুড়ে সমুদ্রযাত্রীরা আকাশে সূর্য এবং তারার উচ্চতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আদিম মডেলগুলো থেকে ব্যবহারকারীকে সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাতে হতো। সেসময় আধুনিক সেক্সট্যান্ট বিকশিত হয়েছিল, যা আজও অনেকগুলো জাহাজে পাওয়া যায়। আকাশের দ্বারা ন্যাভিগেট করার জন্য ব্যবহৃত কিছু প্রাথমিক সামুদ্রিক ন্যাভিগেশন সরঞ্জাম এখানে রইল।

৫) ক্রোনোমিটার দ্বারা ন্যাভিগেট (প্রাচীন ন্যাভিগেশনের শেষ ধাপ):

প্রাচীন ন্যাভিগেশনের পথ চলা শেষ হয় ক্রোনোমিটার ব্যবহার করে ন্যাভিগেশন করা শুরু করার মাধ্যমে। ক্রোনোমিটার ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই আমরা আধুনিক ন্যাভিগেশন এর পর্যায়ে প্রবেশ করেছি।
একটি ম্যারিন ক্রোনোমিটার এমন একটি টাইমপিস যা সঠিক এবং নির্ভুলভাবে যেকোনো দ্রাঘিমায় সময়ের মান নির্ণয় করতে পারে। সুতরাং এটি একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের সময় সঠিকভাবে বের করতে পারে। এরপর এই সময়ের পার্থক্য থেকে মূলবিন্দু থেকে দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য বের করা যেতে পারে এবং এভাবেই স্থান নির্ধারণ করা হয়।

ক্রোনোমিটার দিয়ে সময় এর পার্থক্য নির্ণয় করে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা বেশ সোজা। প্রতি ৪ মিনিট সময়ের জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য ১ ডিগ্রি হয়। স্থানীয় সময় ও গ্রিনিচ মানমন্দিরের সময়ের পার্থক্য করা হতো এখানে।

c) আধুনিক ন্যাভিগেশন :

বর্তমানে আর সেই দিন নেই যখন মেঘাচ্ছন্ন দিনে জাহাজ থামিয়ে ল্যান্ডমার্ক খোঁজার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আজ আর বিশাল সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার তেমন ভয় নেই। এর পুরোটাই আধুনিক যুগের ন্যাভিগেশন ও এর প্রযুক্তির ফসল। আমরা প্রাচীন কালের ন্যাভিগেশন প্রসেস নিয়ে অনেক জানলাম। এখন একটু আধুনিক যুগের ন্যাভিগেশনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

জাহাজ চালানো বা ন্যাভিগেশন পূর্বেও একটা কঠিন পেশা ছিল, এখনও আছে। তবে প্রযুক্তি জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাজটা সহজ করে দিয়েছে। পূর্বে কোনো চার্টে দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ বিবেচনা করে ম্যারিনার্স চার্টে একটা বিন্দু দিয়ে ক্যাপ্টেনরা জাহাজের অবস্থান বুঝতেন। বর্তমানে ম্যারিনার্স চার্টের ব্যবহার খুব কম। তার বদলে চলে এসেছে জি.পি.এস. বা Global Positioning System। এটা সাগরে আপনার সম্পূর্ণ অবস্থানের সাথে সাথে আশেপাশের জায়গাগুলোর অবস্থানও বলে দেয়। জি.পি.এস. এখন একেবারেই নিখুঁতভাবে কাজ করে বলা চলে। আমাদের মাথার ওপর যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলো ঘুরছে, তার সাথে সরাসরি সম্পর্ক করে জি.পি.এস আজ জাহাজের অবস্থান নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারে।

আগেই বলেছিলাম, পূর্বে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা নটিক্যাল চার্ট বা হাতে লেখা চার্টের ওপর ভরসা করে অবস্থান নির্ণয় করে ন্যাভিগেট করতেন। এ পদ্ধতিতে ভুলের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। তবুও পরিমার্জিত হওয়ার পরে এই চার্টগুলো মূল্যবান দলিলে পরিণত হয় ও সহজে যাতে কেউ একে নষ্ট করতে না পারে তাই সরকারের হাইড্রোগ্রাফিক ডাটাবেজে এদের সংরক্ষণ করা হতো।

চার্টগুলোতে যাত্রাপথের আশেপাশের সমস্ত স্থানের বর্ণনা দেওয়া থাকলেও সমুদ্রের সার্ফেসে হঠাৎ উঁচু বা নিচু স্থান, ব্রিজ, তীরে অবস্থিত কাঠামো বা মানবসৃষ্ট কোনো জিনিসের বর্ণনা দেওয়া ছিল না। মানুষ যখন এই ল্যান্ডমার্কগুলো ধ্বংস করতে থাকল এবং সমুদ্রের বুকে নতুন দ্বীপ গড়ে উঠল তখন আর নাবিকদের পক্ষে আগের চার্ট দ্বারা সফলভাবে ন্যাভিগেট করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া ঘনঘন রুট বা চ্যানেলের পরিবর্তন বোঝা এই হাতে লেখা ন্যাভিগেশন চার্টের মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছিল না। এভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এই ন্যাভিগেশন সিস্টেম। আবির্ভাব ঘটে জি.পি.এস. এর !

জি.পি.এস. সিস্টেমের আবিষ্কার প্রথম দিকে তেমন উন্নত ছিল না। যখন থেকে আমরা স্যাটেলাইট

ব্যবহার করে আমাদের জি.পি.এস. সিস্টেম চালনা করা শুরু করলাম, তখন থেকে প্রাচীন ন্যাভিগেশন প্রযুক্তিগুলোর বিলুপ্তি হওয়া শুরু করল। এখনও জাহাজে কিছু কিছু প্রাচীন প্রযুক্তি থাকে বটে, তবে সেটা ব্যাকআপ হিসেবে। বর্তমান জাহাজে ব্যবহার করা হয় এমন কিছু প্রযুক্তির নিচে দেওয়া হলো :

"without a rudder and compass and never knows where he may cast.”

— Leonardo da Vincibin Lee Graham

১) জাইরো/গাইরো কম্পাস :

মূলত এটি দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। চুম্বকীয় কম্পাস থেকে আলাদা। গাইরো কম্পাস কোনো বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এটি উত্তর দিক সঠিকভাবে সন্ধান করতে ব্যবহৃত হয়, যা পৃথিবীর নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের দিক নির্দেশ করে। তবে জরুরি সময়ে দিক নির্ণয়ের জন্য এর রিপিটার সিস্টেমকে সবসময় দিক নির্দেশক প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত থাকতে হবে।

২) রাডার :

সমুদ্রযাত্রায় থাকা জাহাজগুলি ন্যাভিগেশনের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি রাডার (এস-ব্যান্ড এবং এক্স-ব্যান্ড) সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে কারণ এটি লক্ষ্যবস্তু সহজে শনাক্ত করতে পারে এবং স্ক্রিনে প্রয়োজনীয় তথ্য, যেমন : স্থল বা ভূমি থেকে জাহাজের দূরত্ব, কোনো ভাসমান বস্তু (যেমন : কোনো দ্বীপ, শিলা, আইসবার্গ ইত্যাদি) প্রদর্শন করতে পারে, যার ফলে অন্যান্য জাহাজ বা ভাসমান বস্তুর সাথে সংঘর্ষ এড়ানো যায়। এটি একটি মুভেবল অ্যান্টেনা, যা জাহাজের চারপাশের অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। মূলত রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে অ্যান্টেনা কাজ করে।

চিত্র : রাডার
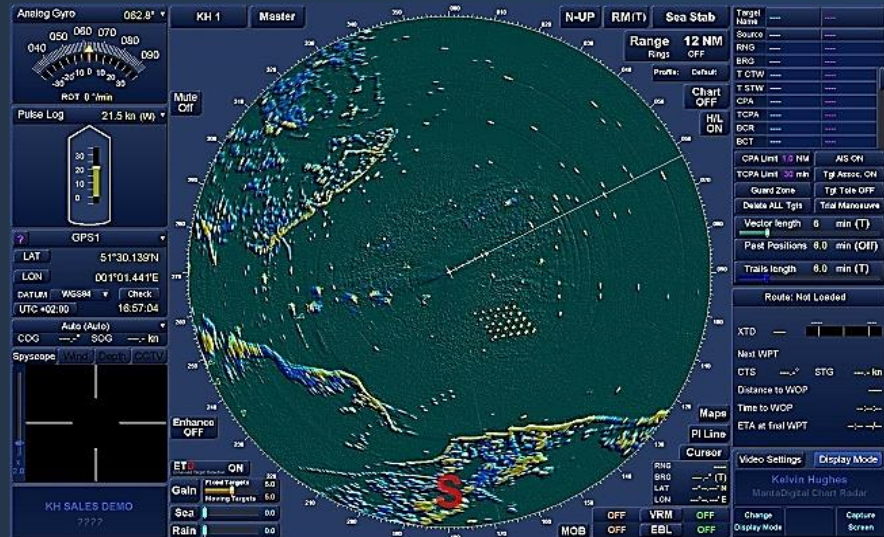
৩)কম্পাস বা দিগদর্শন যন্ত্র :

খুব ব্যাসিক একটা জিনিস। চুম্বকীয় বা ম্যাগনেটিক কম্পাস পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে মিলিতভাবে কাজ করে এবং এটা দিক নির্ণয়ের উপযোগী উপায়। কম্পাসের মাধ্যমে আপনি আপনার যাত্রার একটা সম্পূর্ণ গাইডলাইন পাবেন।
এই জাহাজ ন্যাভিগেশন সরঞ্জামটি সাধারণত 'Monkey Island' এর মাঝামাঝি লাইনে লাগানো হয় যাতে এটি সুরক্ষিত থাকে। প্রতিটি জাহাজে কমপক্ষে একটি ট্রান্সমিটিং চুম্বকীয় টাইপ কম্পাস লাগানো থাকে যাতে ব্রিজ প্যানেলে আউটপুট প্রদর্শিত হয়।

'Monkey Island' টার্মটা জাহাজের এমন একটি স্থানকে বোঝায় যা একটি জাহাজের সবচাইতে উঁচু স্থানে অবস্থিত। এটি মূলত জাহাজের ন্যাভিগেট ব্রিজের ওপরে অবস্থিত একটি ডেক। এটি পাইলথহাউস বা চার্ট হাউসের ওপরে উড়াল সেতু বা জাহাজের ওপরের সেতু হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।
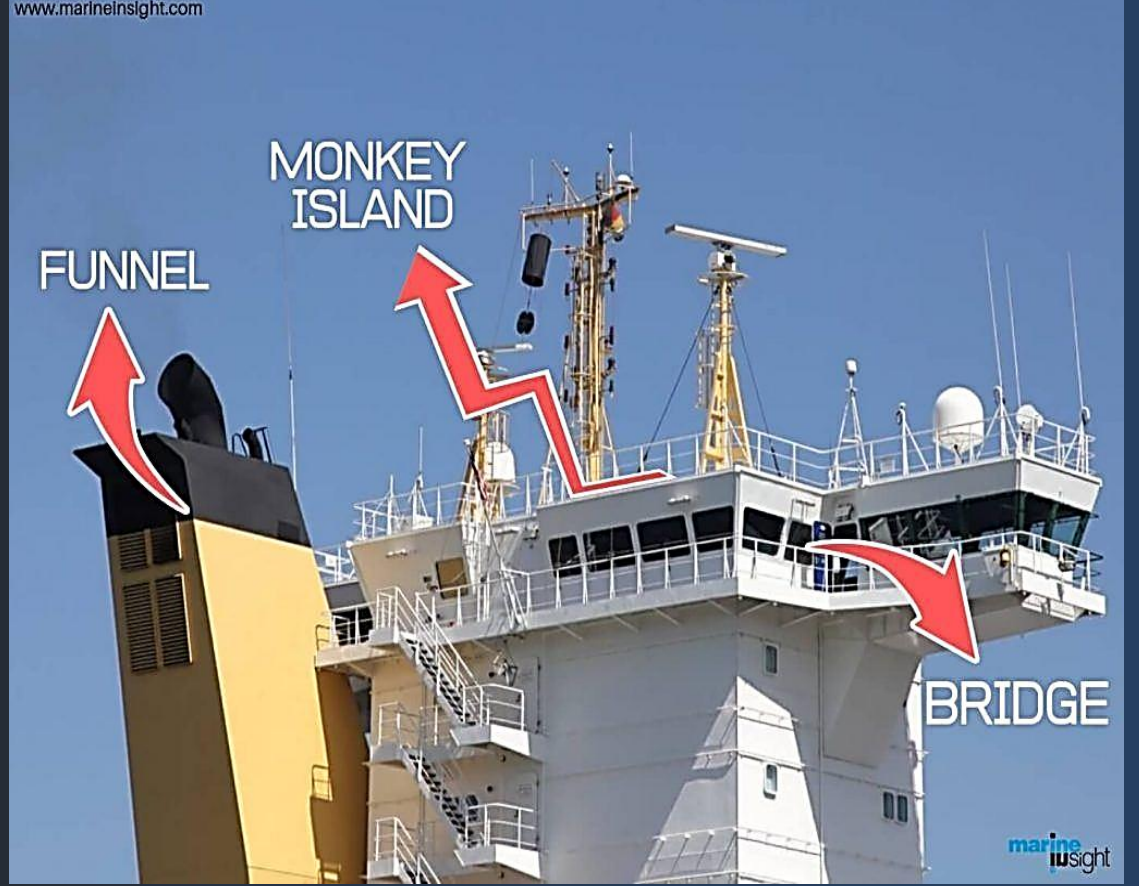
চিত্র : ন্যাভিগেশন মডিউল

৪) অটো পাইলট :
প্লেনের অটোপাইলট বোঝেন তো ? সেইম কাজ, কোনো ডিফারেন্স নাই ! জাহাজের ক্যাপ্টেন তো আর রোবট না যে ২৪ ঘণ্টা কাজ করবে। তাই খোলা সমুদ্রে নিরাপদ মনে হলে জাহাজের ক্যাপ্টেন বেশ অনেকদূর পথ অটোপাইলট দিয়ে চালান। এই পদ্ধতিতে ক্যাপ্টেন বেশ কিছু নির্দেশনা আগে থেকেই দিয়ে রাখেন, যেমন : কত স্পিডে চলবে, কোন দিকে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্যাপ্টেনকে এই বিরক্তিকর কাজ থেকে রেহাই দেয় অটোপাইলট। ফলে ক্যাপ্টেন বিরক্ত হন না এবং অন্য দিকগুলোতে মনোনিবেশ করতে পারেন।

বর্তমানে শিপ ন্যাভিগেশনে হিউম্যান অটোপাইলট-ও ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটার অটোপাইলট সব রুটে ভালোভাবে কাজ করতে না পারলে আগে থেকে ঠিক করে রাখা একজন হিউম্যান অপারেটরের কাছে অটোপাইলটের দায়িত্ব তুলে দেন। দূর থেকে পাইলটরা শিপকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকটা কম্পিউটার গেইমের মতো ! এটা হাইড্রোলিক, মেকানিক ও ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের সমন্বয়ে গঠিত এক আধুনিক অটোপাইলট সিস্টেম।

এর পূর্ণরূপ Automatic Radar Plotting Aid। অনেকটা রাডারেরই বড়ো ভাই বলা চলে। কাজ-ও প্রায় ওরকম। এটা কাছাকাছি থাকা জাহাজ ও অন্য জাহাজের অবস্থান প্রদর্শন করে। এই রাডারটি শুধু আশেপাশে থাকা জাহাজ ও নৌকার তথ্য দেয় যাতে রাতের সময় বা মেঘলা দিনে জাহাজটি কোনো সংঘর্ষে পতিত না হয়।
বর্তমানে প্রতিটি জাহাজ ASPS এর অ্যাডভান্স সিস্টেম ব্যবহার করায় অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এটা নিজের কাজ করে জাহাজকে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

৫) ARPA (Automatic Radar Plotting Aid)

জাহাজের ন্যাভিগেশন ব্রিজে এই যন্ত্রটা লাগানো থাকে। এটা ক্রমাগত জাহাজের চারপাশ নিরীক্ষণ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যা অর্জন করে। এক্ষেত্রে জাহাজ, নৌকা, স্থির বা ভাসমান

সামগ্রী ইত্যাদি এবং যথাক্রমে তাদের গতি এবং চলাচলের রুট ডিসপ্লে স্ক্রিনে ভেক্টর হিসাবে উপস্থাপন করে এবং অ্যান্টেনার প্রতিটি টার্নের সাথে তার আশেপাশের নৌকা বা বাধার সাথে দূরত্ব হিসেব করে স্ক্রিনে অ্যালার্ট দেখায় এবং হিসেব করে এই রুট চেইঞ্জ না করলে কতক্ষণ পরে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জাহাজের ক্যাপ্টেন এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যান ও দুর্ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করেন।

৬) অটোমেটিক ট্রাকিং সিস্টেম :
এই যন্ত্রটা ASAP এর মতো দুর্ঘটনা ছাড়া চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা খুব বেশি জায়গা জুড়ে কাজ করে না, তবে নিখুঁতভাবে আশেপাশে থাকা বিভিন্ন বস্তুর আকার ও জাহাজ হতে তাদের দূরত্ব বলে দিতে পারে। মূলত শব্দের প্রতিফলনের ওপরে এটা কাজ করে। এই ট্র্যাকিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হলো, এটা গভীর সমুদ্রে থাকা (মোটামুটি ৩০০ মিটারের মধ্যে) কোনো সাবমেরিন আসলে শনাক্ত করতে পারে।

এ যন্ত্র খুব স্বল্প এলাকায় কাজ করে। ৮০০ মিটার এলাকাকে এটা ল্যান্ডমাস বা কাজের ক্ষেত্র হিসাবে গণনা করে ও শব্দতরঙ্গ ছোড়ে ও তা হতে প্রাপ্ত তথ্য প্রসেস করে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে প্রয়োজনীয় তথ্যের জোগান দেয় ও সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আগে থেকে জানান দিয়ে রাখে।

৭) ETA (Estimated Time of Arrival) নির্ণায়ক যন্ত্র :

এই যন্ত্রটা জাহাজের গড় স্পিড পরিমাপ করে তার রুটের সাথে তুলনা করে সব মিলিয়ে একটা estimated time of arrival দেখায় যা বিভিন্ন পোর্টের ম্যানেজমেন্টে থাকা কর্মীরা দেখতে পারেন। ফলে জাহাজটি আসার আগে তারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার সময় পান। এটা মূলত জাহাজের স্পিড ও রুটের দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে যাত্রাস্থান থেকে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার একটা সম্ভাব্য সময় বলে দেয়।

৮) ইকো সাউন্ডার :

এটা জাহাজে ব্যবহার করা হয় এমন আধুনিক প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে সবচাইতে আগের। ১০০ বছরেরও আগে থেকে জাহাজে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এটা লাগানো থাকে জাহাজের নিচের অংশে। এখান থেকে শব্দতরঙ্গ পানিতে সোজা নিক্ষেপ করা হয় ও শব্দের প্রতিফলন শোনা হয়। এরপর শব্দ দেওয়ার ও তার প্রতিফলন শোনার মধ্যবর্তী সময়কে ১৫০০ দিয়ে গুন করে ২ দিয়ে ভাগ দিলেই বের হয়ে আসে সমুদ্রের গভীরতা। শব্দতরঙ্গ

ব্যবহার করে সাগরের গভীরতা মাপা হয় এ যন্ত্রের সাহায্যে।

৯) ECDIS (Electronic Chart Display Information System) :

এটা উন্নত ন্যাভিগেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য একত্রে দেওয়া থাকে ও কন্ট্রোল প্যানেল থেকেই গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ জাহাজে এই সিস্টেমটা থাকে না। নৌবাহিনীর জাহাজ বা অনেক বড়ো জাহাজে এই সিস্টেমটা থাকে।

আমরা আজ সমুদ্রে হারিয়ে যাই না আর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারি কারণ আমাদের হাতে এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলো রয়েছে যা দিনকে দিন উন্নত হবে বলে আমরা আশা রাখি। কিন্তু আমাদের আগের ইতিহাস ভুলে যাওয়া চলবে না। আমরা আধুনিক যন্ত্রগুলোও আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের পূর্ববর্তী যন্ত্রগুলো থেকে ধারণা নিয়ে। আগামীতেও আমাদের ন্যাভিগেশনের ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নিয়েই নতুন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কারের মিশনে নামতে হবে।

৪২ থেকে ৫০ মিটারে দেখা মিলবে ভিটামিন ডি-তে ভরপুর Atlantic Cod (কড মাছ)।

লেখক-টি আর এস তানভীর আহমেদ

বায়োলুমিনেসেন্সঃ আলোয় ভুবন ভরা

অনির্বাণ মৈত্র

"কান পেতেছি-চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,

জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান, বিস্ময়ে-

তাই জাগে, জাগে আমার গান।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১।

রাত তিনটে। এসএসসি পরীক্ষা শেষ। কাজকর্ম নেই তেমন। রাতে খেয়ে-দেয়ে বিছানায় গেছি, হাতে ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী স্যারের 'কিশোর বিজ্ঞান সমগ্র'। 'আবিষ্কারের নেশায়' পড়ার পর থেকে ভদ্রলোকের বিশেষ ভক্ত হয়ে গেছি। এখন পড়ছি 'সাগরের রহস্যপুরী'। আমার মতে,
রবি ঠাকুরের 'বিশ্বভরা প্রাণ'-এর আসল স্পন্দন আপনি টের পাবেন না যতদিন না আপনার নিবিড় মিতালি গড়ে উঠছে অথই সমুদ্রের সাথে-সমুদ্রের সে স্পন্দন বড়োই বিচিত্র, বড়োই চমকপ্রদ এবং কখনো কখনো ভয়ংকর রকমের সুন্দর !

যাহোক, বইটার শেষ দিকেই চলে এসেছিলাম প্রায়। সাগরের মৎস্যভান্ডার কিছুক্ষণ আগেই আমার অনুরক্ত চোখে ধরা দিয়েছে বইয়ের পাতায়।

সাথে ছিল আমার ল্যাপটপ। যখন যে প্রাণীর নাম পাচ্ছিলাম, ল্যাপটপটা খুলে সার্চ করছিলাম গুগলে। ইন্টারেস্টিং সব ফ্যাক্টের সাথে প্রায় জ্যান্ত ছবির মজাই আলাদা ! এর মধ্যেই যে কখন চোখ লেগে গেছে, বুঝতেই পারিনি। একটা সময় পর অনুভব করলাম, আমি যেন ভাসছি জলের মধ্যে। চারিদিকে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, ইনফ্যাক্ট চোখ খুলে আছি না বন্ধ করে আছি, সেটা পর্যন্ত বোঝার কায়দা নেই, এরই মধ্যে হাত-পা ছুড়ছি কোনোরকমে। শেষমেশ সাগরেই এসে পড়লাম নাকি, এত নিচে যেখানে সমুদ্রে আলোও পৌঁছায় না ! সে যা-ই হোক-এখন তা ভাবার সময় নয়। হাঁচড়-পাঁচড় করছি কোনোরকম, এর মধ্যেই একটা মৃদু নীল আলো যেন ঠিকরে এসে বিঁধলো চোখে। দেখলাম বেশ দূরে একটা আলো, সেটা আবার দুলছে মৃদু-মৃদু। উপায়ান্তর না দেখে আগে বাড়লাম, জল কেটে এগোচ্ছি কোনোমতে সেদিকে। আলোটা

এখন খুব দূরে নয়। এগোচ্ছি আমি, খেয়াল করলাম আলোটাও যেন এখন একটু পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেই জলের ভেতরই একটা তীব্র আওয়াজ, আলোটাও নিভে গেছে হঠাৎ ! আমি কি আটকা পড়ে গেলাম কোথাও ? একি ! একটা গাড়ি যেন আমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একদিকে, আমি যেন তার যাত্রী ! হঠাৎ আবিষ্কার করলাম কিছু অর্ধতরল পদার্থ যেন ছিটে ছিটে পড়ছে আমার গায়ে। তবে কি এক অবর্ণনীয় অথচ মূর্তিমান সামুদ্রিক আতঙ্ক গ্রাস করছে আমায় ? আর আমি ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছি তার পরিপাকনালির আঁধারে... !

আঁতকে উঠে পড়লাম আমি। উঠেই চোখ পড়ল ল্যাপটপ স্ক্রিনের দিকে—দেখলাম একটা বিকট অ্যাংলার ফিশ তার দুই চোয়াল ফাঁক করে যেন আমাকেই গিলে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে আমার চোখ আটকে গেছে অন্যখানে-আমি স্তব্ধ চোখে চেয়ে আছি ওর শুঁড়ের নীল আলোটার দিকে। ওটাই কিছুক্ষণ আগে আর দশটা শিকারের মতোই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওই বিকট দর্শন দানবটার দিকে ! ঐ সৌন্দর্যের সুরায় একবার যে মজবে, তার আর মনেই হবে না দয়ে, ওর আড়ালেই রয়েছে মৃত্যুর আহ্বান। সাধে কি শেকসপিয়ার বলেছেন, “All that glitters is not gold” !

৫০ থেকে ৫২ মিটার গভীরতায় আমরা। এখানে দেখা যায় পাতা সদৃশ ড্রাগন মাছ বা Leafy Sea Dragon।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।
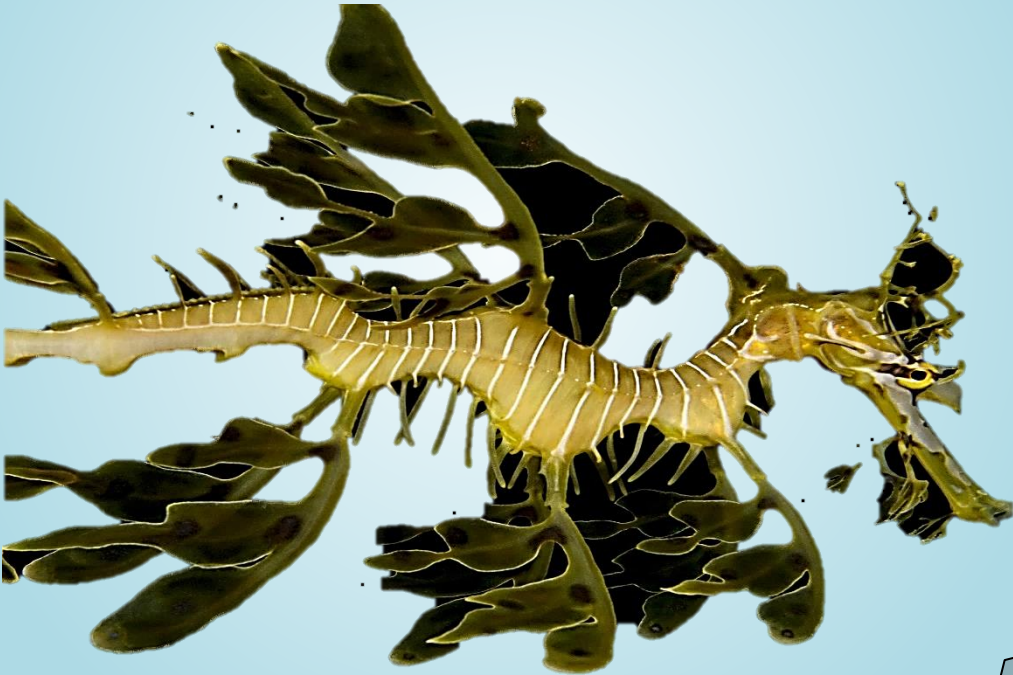
ঘরের এনার্জি লাইটটা মোটেও কমজোরি নয়, তার মধ্যেই আমার মনে হলো নীল আলোটা আবারো যেন দুলছে ঠিক স্বপ্নটার মতোই; স্বপ্নাবিষ্টের মতো চাইলাম সেদিকে—কী ভয়ংকর সুন্দর !

২।

সাল ১৮৬৪। সোমালিয়ার দক্ষিণ উপকূলে ভারত মহাসাগরের একটি স্থান। এ এক ভূতুড়ে জায়গা ! মাঝে মাঝেই নাকি এখানে দেখা মেলে দুধ-সাদা ফেনিল জলের। সেও আবার কম নয়, প্রায় আড়াইশো বর্গকিলো এলাকায়। সাগরের জল তো নীলচে, তা আবার সাদা হয়ে জ্বলজ্বল করে কীভাবে ? এরকম আজব কথা কেউ শুনেছে কোনোকালে ? সমুদ্রের দেবতাদের রুষ্ট হওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে এর ব্যাখ্যা !

সে এলাকা দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকান জাহাজ সি.এস.এস. অ্যালাবামা। ক্যাপ্টেন রাফায়েল সিমেস বসে আছেন তার কেবিনে। ক্রুরা বাইরে। হঠাৎ তাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে বাইরে এলেন ঈষৎ বিরক্ত ক্যাপ্টেন। কিন্তু বাইরে এসে যা দেখলেন, তা দেখার জন্য তার চোখ প্রস্তুত ছিল না মোটেই। তাদের পাশের নীল জল থেকে মুক্তার মতো ঠিকরে বেরোচ্ছে সাদা আলো ! তার মনে হলো জাহাজটা যেন ভেসে চলেছে সাদা তুষারের বিরাট মাঠের ওপর দিয়ে। ক্রুরা যখন দেবতার অভিশাপের ক্রমাসন্ন পরিণতি কিংবা হঠাৎ কোনো সি মনস্টারের ভয়ে জবুথবু হয়ে আছে, ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি তখন অনড়-অচঞ্চল। কয়জন নাবিক পায় এই অপার্থিব দৃশ্য দেখার সুযোগ !

"সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।
তার খোঁজেই বিরাম নেই,
বিলাই তান—তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,
আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ।"

কোনো দেব-দেবীর ভয় নয়, সিমেসের কৌতূহলী অথচ মুগ্ধ চোখে সেদিন ধরা দিয়েছিল প্রাকৃতিক রংমশাল, প্রকৃতির বর্ণিল আলোকসজ্জা !

বায়োলুমিনেসেন্সের জগতে আপনাকে আলোকীয় শুভেচ্ছা !

৩।

"ও শ্যামাদাস, আয় তো দেখি,
বোস তো দেখি এখেনে,
সেই কথাটা বুঝিয়ে দেবো,
পাঁচ মিনিটে, দেখে নে।"

—সুকুমার রায়।

তীব্র গরমের সময়। সন্ধ্যাবেলা। ইলেক্ট্রিসিটি নেই। গায়ের গেঞ্জিটাও সোয়েটারের মতো গরম মনে হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে, বাড়ির পিছন দিকটায়। গাছ-লতা-পাতায় ঝোপ-ঝাড়ের মতোই হয়ে আছে জায়গাটা। এর মধ্যে টিম টিম করে জ্বলা একটা আলো কেড়ে নিল আপনার দৃষ্টি-আসলে একটা নয়, শয়ে শয়ে। জোনাকির আলোয় যেন মনে হচ্ছে আকাশের তারারাই নেমে এসেছে জংলায়।
অভিনন্দন ! বায়োলুমিনেসেন্সের সবচেয়ে সহজ পাঠ আপনি পেয়ে গেছেন চোখের সামনেই !

৪। গভীর সমুদ্রের অ্যাংলার ফিশ, দুধেল সাগর কিংবা আপনার দেখা জোনাকি; যে তিনটি প্রেক্ষাপটের কথা বললাম, তার সবার কেন্দ্রে আছে একটিই টার্ম—বায়োলুমিনেসেন্স, বাংলায় জৈবদ্যুতি। কাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স ? জীবন্ত জীবদেহ থেকে হরেক রঙের আলো উৎপাদন এবং পরিশেষে নিঃসরণের ঘটনাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স। এটি একটা জৈবিক ঘটনা। জোনাকির মতো যে সকল জীবের এই ক্ষমতা আছে, তাদেরকে বলা হয় বায়োলুমিনেসেন্ট। সচরাচর আমরা বায়োলুমিনেসেন্ট হিসেবে জোনাকিকে দেখে থাকি, কিন্তু আদতে এরকম আলোদানকারী জীবের সংখ্যা নেহাত কম নয় ! সাধারণত উদ্ভিদ, উভচর, পাখি কিংবা স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যতীত বহু কীটপতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, প্ল্যাঙ্কটনসহ অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ বায়োলুমিনেসেন্সের মাধ্যমে আলো তৈরির ক্ষমতা রাখে। স্কুইড, ড্রাগনফিশ, অ্যাংলার ফিশ, অক্টোপাস, জেলিফিশ, ক্লিক বিটল, ডিনোফ্লাজেলাটিস—নাম বলে শেষ করা যাবে না এদের। আশ্চর্যের কথা হলো, সামুদ্রিক জীবের মধ্যেই এদের সংখ্যাই বেশি। সামুদ্রিক প্রাণীদের শতকরা ৭৬ ভাগই বায়োলুমিনেসেন্ট এবং সমুদ্রের সকল স্তরেই এদের নিবাস !

৫।
বায়োলুমিনেন্স কার্যত একধরনের জৈব-রাসায়নিক ঘটনা। এ নিয়ে বলার আগে উল্লেখ করে রাখি, প্রকৃতিতে লুমিনেন্স শুধু এই একরকমের নয়,আবার বায়োলুমিনেসেন্স নিজেও কোনো মৌলিক ভাগ নয়, বরং এটি এক বিশেষ রকমের কেমিলুমিনেসেন্স। কেমিলুমিনেসেন্স কী ? কোনো ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলো নিঃসৃত হলে তাকে বলে কেমিলুমিনেসেন্স। আর জীবদেহে জৈবনিক (জৈব + রাসায়নিক) বিক্রিয়ায় যে কেমিলুমিনেসেন্স ঘটে, তাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স। এখন বলতে পারেন, বায়োলুমিনেসেন্সের কি ভাই-বোন আছে আর ? উত্তর হচ্ছে-হ্যাঁ,আছে। শুধু আপন ভাই-বোনই না, অনেক 'তুতো' ভাই-বোনও আছে। তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যখন আলো নিঃসরিত হয়,তাকে বলে ইলেকট্রোলুমিনেন্স; তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্রবীভূতকরণ থেকে আলো নিঃসৃত হলে তার নাম লায়োলুমিনেসেন্স। এ দুইটা কেমিলুমিনেসেন্সেরই অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও বাহ্যিক উৎস থেকে শোষিত আলো নিঃসৃত হতে পারে (ফ্লুরোসেন্স), ক্রিস্টালাইজেশনের সময় আলো নিঃসৃত হতে পারে (ক্রিস্টালোলুমিনেসেন্স), এমনকি ক্রিস্টাল ভাঙার সময়ও আলো নিঃসৃত হতে পারে (ফ্যাকট্রোলুমিনেসেন্স)। এরা সকলেই আলোকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। তবে এখানে উল্লেখ্য, বায়োলুমিনেসেন্টদের পাশাপাশি বহু ফ্লুরোসেন্ট প্রজাতিও কিন্তু পাশাপাশি অবস্থান করে (উদাহরণ : ফ্লাওয়ার হ্যাট জেলিফিশ কিংবা আলো ছড়ানো জি.এম. ছত্রাক)। এদের সাথে বায়োলুমিনেসেন্টদের এক করে ফেললে চলবে না কিন্তু। বায়োলুমিনেসেন্টরা কোনো বাহ্যিক আলো ছাড়াই কোনো প্রাণী তার বিপাকীয় শক্তি এবং দেহের জৈব অণু থেকে তৈরি করতে পারে, কিন্তু ফ্লুরোসেন্টরা কোনো না কোনো উৎস থেকে আলো গ্রহণ করে এবং সেটা নিঃসরণ করে বলে তাদের আলোকিত দেখায়। মনে করিয়ে দিই, এই আলোচনায় কেবল বায়োলুমিনেসেন্টদের কথাই বলা হচ্ছে !

৬।
ফিরে আসি বায়োলুমিনেসেন্সে। বিষয়টা কীভাবে কাজ করে তা না জানলে কি আর বিজ্ঞানমনস্ক

হৃদয় তৃপ্ত হয় ? তবে দেখা যাক, কীভাবে কাজ করে বায়োলুমিনেসেন্স। আগেই বলেছি, জীবদেহের অভ্যন্তরীণ (বহুকাল ধরে বিবর্তিত) রাসায়নিক বিক্রিয়াই বায়োলুমিনেসেন্সের কারণ। স্বভাবতই এ বিক্রিয়ায় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটবে। বিক্রিয়ায় যখন কোনো প্রোটিন (কিছু প্রজাতিতে কোনো আয়ন) কোনো আলো উৎপাদনকারী উপাদানকে ভাঙে তখন তার একটি উপজাত হিসেবে আলো নির্গত হয়। সাধারণত যে উপাদানটি আলো তৈরি করে সেটিকে বলা হয় লুসিফারিন (আলো উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যধারী যৌগ) । আর যে উপাদান বা এনজাইম এখানে ক্রিয়া করে, তার নাম লুসিফারেজ।
প্রকৃতিতে লুসিফারিনের প্রকারভেদ তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে লুসিফারেজ এনজাইম প্রজাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। সংশ্লেষিত হয় হিস্পিডিন নামক রাসায়নিক যৌগ থেকে। হিস্পিডিনের ওপর হাইড্রোক্সিলেজ এনজাইম ক্রিয়া করে লুসিফারিন উৎপাদন করে।
বায়োলুমিনেসেন্টদের দেহে এ প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে থাকে। লুসিফারিন থেকে আলো নিঃসরণের সাধারণ মেকানিজমটা বর্ণনা করছি এখানে। প্রথমে লুসিফারিন এনজাইমের ক্রিয়ায় লুসিফেরিল অ্যাডেনাইলেট নামক মধ্যবর্তী যৌগ তৈরি হয়। কোষস্থ ATP বিক্রিয়ায় সক্রিয় শক্তির জোগান দেয়। উৎপন্ন লুসিফেরিল অ্যাডেনাইলেট অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগের (ডি-কার্বক্সিলেশন) মাধ্যমে উত্তেজিত অক্সিলুসিফারিন তৈরি করে। অক্সিলুসিফারিন কিটো-ইনল টটোমার সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে। উত্তেজিত অক্সিলুসিফারিন গ্রাউন্ড স্টেট বা স্থিতাবস্থায় আসার জন্য শক্তি বিকিরণ করে, এ বিকিরিত শক্তিকেই আমরা আলো হিসেবে দেখি।

আমরা দেখি আমাদের ঘরোয়া বৈদ্যুতিক বাতি তার শক্তির মাত্র দশ ভাগ
আলোকশক্তিতে পরিণত করতে পারে। বাকি প্রায় নব্বই ভাগই তাপে পরিণত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে লুসিফারিন তাপ প্রতিরোধী হওয়ায় আলোকে ঠান্ডা রাখে, ফলে বায়োলুমিনেসেন্ট জীবের আলোয় তাপ নির্গত হয় না বললেই চলে (≈2%) এবং তারা তাদের সমস্ত শক্তির প্রায় শতভাগই আলোকশক্তিতে পরিণত করতে পারে।

৭। আলো তো বের হলো, কিন্তু তার রং কী হবে ?
বর্ণালিমিতি থেকে আমরা জানি, রং আসলে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যসীমার তরঙ্গ ছাড়া কিছুই না। আলোর বর্ণ কী হবে তা ব্যাখ্যা করার আসলে একক কোনো মেকানিজম নেই, বরং অনেকগুলো পরিপূরক মেকানিজম আছে। তবে লুসিফারিনের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যই যে অনেকাংশে এটি নির্ধারণ করে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই খুব বেশি। একটি মেকানিজমে বলা হয়, আলোর প্রকৃতি নির্ভর করে উৎপাদ যৌগটি কিটো যৌগ থেকে গ্রাউন্ড স্টেটে আসছে নাকি ইনল যৌগ থেকে গ্রাউন্ড স্টেটে আসছে। এখানে বলা হয়, কিটো যৌগ উত্তেজিত অবস্থায় লাল আলো দেয়, আর ইনল যৌগ থেকে আসে হলুদাভ সবুজ আলো। কিছু মেকানিজমে পারিপার্শ্বিক উপাদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয়, পরিবেশের কিছু আনুষঙ্গিক দ্রব্যের সাথে অক্সিলুসিফারিনের স্থির বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া তার টটোমারাইজেশনে প্রভাব ফেলে আলোর প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়।
তবে লুসিফারিন-লুসিফারেজ বিক্রিয়াই আলো নিঃসরণের একমাত্র পদ্ধতি নয়। লুসিফারেজের বদলে কোনো কোনো সামুদ্রিক প্রাণী অ্যাকোয়ারিন

নামক ফটোপ্রোটিন ব্যবহার করে। অ্যাকোয়ারিন, অপর একটি প্রোটিন, ক্যালসিয়াম আয়ন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় সিলেন্ট্রামাইড। বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সিলেন্ট্রামাইড থেকে নীল রঙের আলো বেরোয়।

কিছু প্রাণী অবশ্য আলো তৈরি করার ক্ষমতা ছাড়াও আলো নিঃসরণ করতে পারে। কীভাবে ? সিমবায়োসিসের মাধ্যমে ! বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া বা ফানজাইয়ের সাথে মিউচুয়ালিজম** এর মাধ্যমে তাদের আলোকে ব্যবহার করে। আগামী পর্বে বলব এমন কিছু আশ্চর্য প্রাণীর কথা যারা বায়োলুমিনেসেন্সের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও সৃষ্টি করেছে অপার সৌন্দর্যের আধার। জলের নিচে বা বাইরে, আর কীরূপ বিবর্তনীয় সুবিধাই বা এগুলো দিচ্ছে, যার কারণে এই প্রকরণ যুগের পর যুগ ধরে ক্রমবিবর্তিত হয়ে আসছে—থাকবে সে আলোচনাও।

টীকা :

জীববিজ্ঞানের আলোচনা করতে গেলে অবধারিতভাবে চলে আসে রসায়নের কথা। টটোমারিজম জৈব রসায়নের টার্ম। একই আণবিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন গাঠনিক সংকেত (কিছু ক্ষেত্রে গাঠনিক সংকেতও একই) বিশিষ্ট এবং ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট যৌগসমূহকে পরস্পরের সমাণু বলে। জৈব যৌগের বিশেষ রকম সমাণুতাকে বলে টটোমারিজম। এ প্রক্রিয়ায় সমাণুগুলো সাধারণ অবস্থায় এক প্রকার কার্যকরী মূলক সংবলিত কাঠামো থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিন্ন প্রকার কার্যকরী মূলক সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য কাঠামোতে পরিণত হয় এবং উভয় কাঠামো সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। এক প্রকার বিশেষ টটোমারিজমকে কিটো-ইনল টটোমারিজম বলে, কারণ এই সাম্যাবস্থায় একটি কাঠামো থাকে কিটো গ্রুপ (—CO—) বিশিষ্ট এবং অপর কাঠামোটিতে দ্বিবন্ধন (C=C) এবং অ্যালকোহলীয় কার্যকরী মূলক (—OH) থাকে। যেমন : প্রোপানোন এবং প্রোপিন—২—অল পরস্পর কিটো—ইনল টটোমার সাম্যাবস্থা তৈরি করে।

** মিউচুয়ালিজম প্রতিবেশবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। জীবজগতে বিদ্যমান বিভিন্ন রকম সম্পর্ককে আন্তঃক্রিয়া বলে। এই আন্তঃক্রিয়া দুধরনের—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়ার দুইটি ভাগ—মিউচুয়ালিজম এবং কমেনসেলিজম। মিউচুয়ালিজম হলো সেই আন্তঃক্রিয়া যেখানে অংশগ্রহণকারী জীবেরা উভয়েই উপকৃত হয়। যেমন : ফড়িং বা প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে মধু খায় আবার তাদের মাধ্যমেই ফুলের পরাগায়ন ঘটে। ফুলের সাথে পতঙ্গাদির এরূপ সম্পর্ক মিউচুয়ালিজমের উদাহরণ। বায়োলুমিনেসেন্সের ক্ষেত্রে বিষয়টি কীভাবে কাজ করে সেটা না হয় চিন্তাশীল পাঠকের জন্যই তোলা থাকল, পরের পর্বে মিলিয়ে নেবেন না হয় !

৮।

“ আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব।”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই পর্বের মূল আলোচনায় যাবার আগে বিবর্তনের কথা বলা জরুরি। কেননা,"বিবর্তনের আলোকে না

দেখলে জীববিজ্ঞানের সকল কিছুই অর্থহীন দাঁড়ায়!" (থিওডর ডবঝানস্কি)।

আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে ডারউইনীয় বিবর্তনের মধ্যে। ডারউইনীয় বিবর্তনের মূলনীতিকে এভাবে লেখা যায়—অনুকূল বা অভিযোজনমূলক প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা উপযুক্ত পরিবেশে নির্বাচিত হয় এবং বংশবিস্তার করে অনুকূল প্রকরণ পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চার করে। এখান থেকে স্পষ্ট যে, ডারউইনীয় বিবর্তনে প্রকরণ (variety), নির্বাচন (selection) এবং বংশবিস্তার (reproduction)-এই তিনটি শর্তই পূরণ হওয়া চাই, তা না হলে ডারউইনীয় বিবর্তন ঘটতে পারবে না (অ-ডারউইনীয় বিবর্তন হতে পারে, তবে সেটা এখানে আলোচ্য নয়)। প্রকরণ কী ? প্রকরণ হচ্ছে পপুলেশনের জীবগুলোর বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য, সেটা হতে পারে আকারে, হতে পারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় কিংবা প্রতিকূলতা সহনীয়তায়। অনুকূল প্রকরণ তাকেই বলা হবে যা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে জীবটিকে সহায়তা দেবে। একটি ব্যাকটেরিয়ার উচ্চ অ্যান্টিবায়োটিক সহনীয়তা অনুকূল প্রকরণের উদাহরণ হতে পারে যা তাকে উপযুক্ত পরিবেশের জন্য সক্ষম বা ফিট বলে নির্বাচিত করবে। এরকম অনুকূল প্রকরণযুক্ত জীবেরা অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করতে পারে, যুগ-যুগান্তর ধরে প্রকৃতি তাদের নির্বাচিত করে এবং তার প্রজাতি জীবন প্রবাহ এবং জনমিতির মানদণ্ডে টিকে থাকে। এখান থেকে একটি বিষয় বোধহয় স্পষ্ট করতে পেরেছি যে, কোনো পপুলেশনে বিরাজমান জীবেরা কোনো বিশেষ এবং অনুকূল প্রকরণের কারণেই টিকে থাকতে পারছে, এর অন্যথা হলে তারা অবলুপ্ত হয়ে যেত।

৯।

বায়োলুমিনেসেন্স নামক যে বিশেষ জীব-বৈজ্ঞানিক ঘটনার কথা দুটো পর্ব পেরিয়ে আজ তৃতীয় পর্বে আলোচনা করছি, তার জন্যেও বিবর্তনের এই ফিল্টার প্রাসঙ্গিক। আমাদের কাছে বায়োলুমিনেসেন্স সৌন্দর্য সৃষ্টির বিষয় বলে পরিগণিত হতে পারে কিন্তু বায়োলুমিনেসেন্ট জীবদের জন্য তা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, কেননা বিবর্তনের ধারায় এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই এরা আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, বায়োলুমিনেসেন্স সংশ্লিষ্ট জীবদেরকে বেঁচে থাকতে বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে। দেখা গেছে, এই আলো দিয়ে জীবগুলো শিকার খোঁজা, শিকার ধরতে ছদ্মবেশ ধারণ, শিকারির হাত থেকে বাঁচার জন্য পরিবেশে নিজেকে আড়াল করে ফেলা, একই প্রজাতির অন্য প্রাণীর সাথে যোগাযোগ, সঙ্গীকে আকৃষ্ট করা, বহিরাগতকে সতর্ক করাসহ আরও কিছু কাজে ব্যবহার করে। চলুন কিছু কেইস স্টাডি করা যাক !

১০।

জোনাকি দিয়েই শুরু করি। স্থলভাগের বায়োলুমিনেসেন্ট জীবদের মধ্যে জোনাকিই আমাদের সবচেয়ে পরিচিত। জোনাকির আলো দেওয়া সেক্সুয়াল সিলেকশন বা যৌনতার নির্বাচনের (এর অন্য উদাহরণ হচ্ছে পুরুষ ময়ূরের পেখম তোলা কিংবা কোকিলের কুহু কুহু ডাক !) অন্তর্গত যা বিবর্তনের আরেকটি চালিকাশক্তি। সকল প্রজাতি আবার আলো দিতে পারে না, বিশেষ কিছু প্রজাতির এ ক্ষমতা আছে। জোনাকি তার আলো ব্যবহার করে নিজের প্রজাতিগত পরিচয় জানান দেয় এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করে মিলনের আমন্ত্রণ জানায়। এদের

দেহের নিচের দিকের যে অংশে হলদে আলো উৎপন্ন হয়, সেই অংশটি বেশ পাতলা এবং স্বচ্ছ। প্রজনন ঋতুতে বনজঙ্গল জোনাকিতে ছেয়ে যায়, তখন এরা নৃত্যের ভঙ্গিতে টিম টিম করে জ্বলতে থাকে। একেক প্রজাতির আবার নাচের ধরন আলাদা। *Photinus pyralis* প্রজাতির পুরুষ জোনাকি ওপর-নিচ বরাবর উড়ে আলো জ্বালতে থাকে, আর স্ত্রী জোনাকি পাতা বা অন্য কোথাও বসে থাকে। উজ্জ্বল বা তীব্র আলো একজন ভালো যৌনসঙ্গীর পরিচয় দেয়। পুরুষটির আলো দেবার মোটামুটি দুই সেকেন্ড পরে স্ত্রী জোনাকি ফিরতি আলো জ্বালিয়ে আগ্রহসূচক বার্তা দেয়। পুরুষটি তখন আরেকটু কাছে আসে। এভাবে একসময় তারা মিলিত হয়। জোনাকির আলো জ্বালানো এখানেই শেষ নয় কিন্তু, আরও অবাক করা বিষয় হলো—স্ত্রী জোনাকিরা কখনো কখনো আলোক-সৌন্দর্যের ফাঁদ পাতে। আলোর আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয়ে অন্য প্রজাতির জোনাকি যখন মিলনের জন্য কাছে আসে, তখন স্ত্রী জোনাকি তাকে ভক্ষণ করে। সাধু সাবধান !

৯৯।

জোনাকির ক্ষেত্রে সাধারণত একরকম আলোই দেখা যায়। ক্লিক বিটল গুবরে পোকার আলোর রং আবার নির্ভর করে তার মেজাজ-মর্জির ওপর। প্রজনন মৌসুমে সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার জন্য এদের তলপেট থেকে কমলা রঙের আলো নিঃসৃত হয়। আর যখন সে শিকারের আভাস পায়, তখন নিঃসরণ করতে থাকে সবুজ আলো। বিটলের মতো শিকারের স্বার্থে বায়োলুমিনেসেন্স এর ব্যবহার দেখা যায় *Arachnocampa luminosa* নামের পতঙ্গ প্রজাতির। নিউজিল্যান্ডের গহিন জঙ্গলের গুহায় দেখা মেলে এদের। এদের লার্ভা মাকড়সার জালের মতো করে বিস্তৃত হয়। এই জাল থেকে নির্গত উজ্জ্বল আলো বাইরের পোকামাকড়কে আকর্ষণ করে। চকচকে আলো দেখে বোকা বনে গিয়ে যারা জালে আটকা পড়ে তাদের দিয়ে ওই পতঙ্গ আহার সেরে নেয়। অনেক পতঙ্গের লার্ভা আবার বায়োলুমিনেসেন্স ব্যবহার করে পাখি, ব্যাং কিংবা অন্য শিকারি প্রাণীদেরকে দূরে রাখে, যেমন : ডায়মন্ড ওয়ার্ম, রেইলরোড ওয়ার্ম এবং গ্লো ওয়ার্ম। রেইলরোড ওয়ার্ম আবার বেশ শৌখিন, এদের মাথার দিকটায় জ্বলে লাল রঙের আলো, আর দেহের নিচের দিকটায় জ্বলে সবুজ রঙের আলো।

বায়োলুমিনেসেন্ট ছত্রাকের কথা বলা হয়নি এখনো, ওরা আবার রাগ করতে পারে ! ছত্রাকের প্রায় আশিটিরও বেশি বায়োলুমিনেসেন্ট প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে এ পর্যন্ত। মূলত ট্রপিক্যাল বনজঙ্গলেই এদের দেখা যায়। পরিচিত ছত্রাক প্রজাতির মধ্যে বিটার অয়েস্টার (Bitter oyster) এর কথা উল্লেখযোগ্য। প্রজাতিটির মূল নাম *Panellus stipticus*, তবে উজ্জ্বল ঝিনুক বা গুগলির মতো দেখতে বলে তাদের এরকম নামকরণ। অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, আমেরিকার ট্রপিক্যাল জঙ্গলে বার্চ, ওক কিংবা বিচগাছে মূলত এদের দেখা মেলে। সূর্য ডুবলে এক অপার্থিব আলোয় ঝলমলিয়ে দেয় এই বিশেষ প্রজাতির ফাঙ্গাসটি। কিছু বায়োলুমিনেসেন্ট ছত্রাক, যেমন : *Omphalotus olearius, Omphalotus nidiformis*।এদের পাওয়া যায় ভেজা অথবা পচা কাঠের গুঁড়ি বা টুকরাতে। এরা সবুজ বা নীলচে সবুজ আলো বিচ্ছুরণ করে সাধারণত। ছত্রাকদের বায়োলুমিনেসেন্সকে আবার একটি বিশেষ নামে ডাকা হয়—ফক্সফায়ার। ফক্সফায়ার মূলত স্পোর ছড়ানোর জন্য কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। আবার

এই উজ্জ্বল আলো ভক্ষকদেরকেও দূরে রাখে। ফক্সফায়ারের আলো কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এমন আলোরও জোগান দিতে পারে যা বই পড়ার জন্য যথেষ্ট। এমনকি ব্যারোমিটার এবং কম্পাসের নিডলকে আলোকিত করতেও একসময় ফক্সফায়ারের ব্যবহার ছিল !

৯২।

প্রথম পর্বে মিল্কি সি এর কথা বলেছিলাম। আন্দাজ করতে পারছেন এটাও বায়োলুমিনেসেন্সেরই কেরামতি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল এই আলো সৃষ্টির জন্য দায়ী *ডিনোফ্লাজেলাটিস ছত্রাক*। পরবর্তীতে গবেষণায় দেখা গেল কিছু বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া (*Vibrio harveyi*) এর জন্য দায়ী। যখন জলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তখন এদের থেকে আলো নির্গত হতে থাকে। একটি একক ব্যাকটেরিয়া থেকে নির্গত আলো দেখা যায় না, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক (প্রায় মিলিয়ন পর্যায়ে) ব্যাকটেরিয়া একসাথে হলে রীতিমতো ফায়ারওয়ার্ক হয়ে যেতে পারে এবং তা এতটাই উজ্জ্বল যে স্যাটেলাইট থেকেও চিহ্নিত করা যায় এদের ! আরও একটি খবর দিয়ে রাখি—কেবল সোমালিয়ার উপকূলেই নয়, মুম্বাইয়ের জহুর সমুদ্র সৈকত, মালদ্বীপের ভাদু সৈকতসহ আরও কয়েকটি জায়গাতেও এদের দেখা মেলে, নিজের দেহের আলো দিয়ে পুরো এলাকাটাকে ঝলমলে করে তোলে এরা। আর ট্যুরিস্টরা চেয়ে থাকেন অবাক দৃষ্টিতে।

এ তো গেল কেবল স্থল আর সমুদ্র-উপরিতলের আলোচনা। বায়োলুমিনেসেন্সের প্রকৃত জগতে নামতে হলে আপনাকে পরতে হবে মেরিন পোশাক, পিঠে সিলিন্ডার নিয়ে ডুব দিতে হবে অতল সমুদ্রে !

গভীর সমুদ্রে বায়োলুমিনেসেন্সের প্রাচুর্য এত বেশি এবং এতই বেশি যে, এই পর্বে অন্যান্য বায়োলুমিনেসেন্টদের সাথে সামুদ্রিক প্রাণীদের আলোচনা করার সাহস দেখাচ্ছি না। আগামী পর্বে আমরা ডুবুরির পোশাক পরে ঝাঁপ দেবো সমুদ্রের গভীরে, দেখব কীভাবে এক অবাক এবং অবশ্যই আলোকিত রহস্যপুরী অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য।

৯৩।

" ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে

বিস্ময়-আনন্দ রসে আলোড়িত মন,

অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভান্ডারে

নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।"

—বিহারীলাল চক্রবর্তী।

পশ্চিম আকাশ রক্তিম আভায় লাল করে অস্ত যায় দিনের সূর্য। নামে শান্ত, সমাহিত অন্ধকার। নতুন দিনের অপেক্ষায় আস্তে আস্তে থেমে যেতে থাকে প্রকৃতির বিচিত্র কোলাহল। থামে না শুধু মহাসমুদ্রের কল্লোল,তীরে অবিরাম আছড়ে পড়ে উঁচু ঢেউয়ের সারি,অন্ধকারের বুকেই ঝিকিমিকি জ্বলে ওঠে সুবিশাল সাগর। আবার সমুদ্রের তলার আলো-আঁধারিতে, কখনো কখনো যেখানে সূর্যের আলোও পৌঁছায় না—চড়ে বেড়ায় এমন সব অদ্ভুত প্রাণী, যাদের গা থেকে বেরোয় উজ্জ্বল আলোর ছটা। সে আলো তারা ইচ্ছেমতো জ্বালায়, ইচ্ছেমতো নেভায়। সাহিত্যের সুললিত ভাষা ত্যাগ করে, বিজ্ঞানের

কঠিন টার্মিনোলজিতে আমরা তাদের বলি বায়োলুমিনেসেন্ট। আজকের আলোচনা সমুদ্রের সেইসব বায়োলুমিনেসেন্টদের নিয়েই, সমতলের নগর-দেশ থেকে বহু দূরে যারা গড়ে তুলেছে আশ্চর্য রহস্যপুরী !

১৪।

দ্বিতীয় পর্বে বলেছিলাম, বায়োলুমিনেসেন্ট জীবদের অধিকাংশই সামুদ্রিক এবং সমুদ্রের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জীবই বায়োলুমিনেসেন্ট। এদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মাছ, অমেরুদণ্ডী অক্টোপাস, স্কুইড, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া সনৃন ইত্যাদি। সমুদ্রের সকল গভীরতাতেই এদের দেখা মেলে। অধিকাংশ সামুদ্রিক বায়োলুমিনেসেন্ট জীব নীল-সবুজ রঙের আলো দিয়ে থাকে, আবার সমুদ্রের জীবদের অধিকাংশই এই দুটি রঙে সংবেদনশীল। এখানে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, স্থলজদের মতোই সামুদ্রিক জীবদের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য যে অথই সমুদ্রের পরিবেশে অভিযোজন এবং টিকে থাকার স্বার্থেই এদের মধ্যে বায়োলুমিনেসেন্সের প্রকরণ বিবর্তিত হয়েছে। আরেকবার মনে করিয়ে দিই, বায়োলুমিনেসেন্স একটা জীবকে কী কী সুবিধা দিতে পারে, যেমনটা তৃতীয় পর্বেও বলেছি। এই আলো দিয়ে জীবগুলো শিকার খোঁজা, শিকারির হাত থেকে বাঁচার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ, একই প্রজাতির অন্য প্রাণীর সাথে যোগাযোগ, সঙ্গীকে আকৃষ্ট করা, বহিরাগতকে সর্তক
 করাসহ আরও কিছু কাজে ব্যবহার করে থাকে। তো,এবার আমরা অক্সিজেন নিয়ে জলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত !

১৫।

শুরু করা যাক একটু শূদ্র শ্রেণীর প্রাণ দিয়ে। সমুদ্রের উপরিতল এবং গভীরে বহু বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যালগির বাস। যেমন- *ডিনোফ্লাজেলাটিস, ভিব্রিও ফিশারি (Vibrio fischeri), ভিব্রিও হার্ভেই (Vibrio harveyi)*।

চেনা চেনা লাগছে ? হ্যাঁ, মিল্কি সি'র সময়েও এদের নাম করেছিলাম। এরা একসাথে মিলে সমুদ্রে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন তৈরি করে আর একজোট হয়ে থাকে। যখন কোনো মাছ অথবা কোনো চিংড়ি এদের ডিস্টার্ব করে, এরা নীলচে আলো জ্বালাতে থাকে। আপনি হয়তো ভাববেন, "ওহ আচ্ছা, চিংড়িটাকে ভয় দেখাচ্ছে। এই তো ব্যাপার ?"
না। এটাই পুরো ব্যাপার না। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে। মাইনাসে মাইনাসে যে প্লাস হয়, এটা শেখাতে গিয়ে আমার ম্যাথের শিক্ষক আমাকে একটা প্রবাদ শিখিয়েছিলেন, আপনারাও শুনে থাকবেন হয়তো, “The enemy of enemy is my friend"। অর্থাৎ, শত্রুর শত্রু হলো বন্ধু। আন্দাজ করতে পারছেন কি ? জীব বলতে কষ্ট হয় এমন কিছু জীব জোট বেঁধে আলো জ্বালাবে শুধু কি ভয় দেখাতে? না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যখন কোনো মাছ প্ল্যাঙ্কটন সেবন করতে আসে, তখন আলো জ্বালিয়ে প্ল্যাঙ্কটন আরও বড়ো মাছের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- যাতে করে বড়ো মাছটা প্ল্যাঙ্কটনকে বিপদমুক্ত করে। কে জানত সমুদ্রের তলেও এরকম চোর ধরা আলোক-ঘণ্টার ব্যবস্থা আছে? আরও মজার কথা হচ্ছে, কোনো কোনো হাঙর বা তিমি (Sperm Whale) এই বিষয়টাকে অবজার্ভ করে। প্ল্যাঙ্কটন তাদের খাদ্য নয় কিন্তু তারাও প্ল্যাঙ্কটন খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। প্ল্যাঙ্কটন নিজের খাদককে দেখে আলো জ্বালায়, আর গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে তিমিও চালায় ভূরিভোজন !

এ তো গেল একটা কাজ। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়া আলো বিকিরণ করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, নিজের সহযোগী বা শত্রুদের চেনার জন্য। একে বলে 'কোরাম সেন্সিং'। Sea-firefly-রা সচরাচর হালকা আলো নিঃসরণ করে, কিন্তু শত্রু বা অন্য প্রাণীর উপস্থিতিতে তীব্র নীল আলোর ছটায় চারিদিক আলোকিত করে তোলে। জলের উপরিতলের কাছকাছিই এদের পাওয়া যায়। জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি সেনাবাহিনী গেরিলা আক্রমণে আলোর জন্য Sea-firefly ব্যবহার করত। এছাড়া আছে ক্লাস্টারউইঙ্ক শামুক। এদের কিছু স্পর্শ করলে বা কোনো বিপদে পড়লে এরা খোলসে ঢুকে পড়ে। আর এই খোলস থেকে এরা টিপ টিপ করে আলো জ্বালতে থাকে। শামুকের এই আলোর উৎস হলো এর গায়ে বাস করা বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া।

১৬।

সমুদ্রের প্রাণীদের কথা আলোচনা করতে গেলে স্কুইডের কথা আসবেই। এদের বহু প্রজাতির আলো তৈরির ক্ষমতা রয়েছে এবং তা তারা ব্যবহার করে থাকে বিভিন্নভাবে। স্কুইডের দেহে আলো তৈরির মূল উৎস হলো কিছু বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া ও স্কুইড হলো মিথোজীবী (Simbiont), অর্থাৎ এরা একে অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে একত্রে বেঁচে থাকে। স্কুইড এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে খাদ্যের জোগান দেয়। আর প্রতিদানে ব্যাকটেরিয়াগুলো নিজেদের বায়োলুমিনেসেন্স ক্ষমতা দিয়ে স্কুইডদের শত্রু থেকে রক্ষা করে। দ্বিতীয় পর্বের শেষে মিউচুয়ালিজমের কথা বলেছিলাম, মনে পড়ছে কি ?

মূলত এই আলো ব্যবহৃত হয় শিকার থেকে বাঁচার জন্য। যেসব স্কুইড অগভীর সমুদ্রে থাকে, তারা শিকারী দেখলে একধরনের ঘন কালি ছুড়ে দিয়ে পালায়। কিন্তু গভীর জলের স্কুইডরা (যেমন- ভ্যাম্পায়ার স্কুইড) তা পারে না। এর বদলে তারা শত্রুর দিকে বায়োলুমিনেসেন্ট তরল ছুড়ে দেয়, ফলে শত্রু কিছুক্ষণের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং স্কুইড পালায়। একই কাজ করে কিছু চিংড়ি (Acanthephyra purpurea) এবং কিছু জেলিফিশ (Comb Jelly)। চিংড়িরা আবার মেঘের মতো জ্বলজ্বলে ধোঁয়া তৈরি করে শিকারকে ভড়কে দেয়। কখনো কখনো এই উজ্জ্বল ধোঁয়া আবার শিকারিকেই শিকার বানিয়ে দেয় ! কারণটা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই ?

কিছু স্কুইড (যেমন- *Octopoteuthis deletron*) তার শুঁড়ের অংশবিশেষ হতে বিজলির মতো আলো জ্বালিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ নিভিয়ে সম্ভাব্য শত্রুকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। কখনো এরা তাদের একেকটা বায়োলুমিনেসেন্ট শুঁড় খসিয়েও ফেলে যাতে শিকার ঐ বিচ্ছিন্ন অংশটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর স্কুইডটা পালাতে পারে। টিকটিকির লেজের মতো এদের শুঁড়ও আবার নতুন করে তৈরি হয়। শুধু স্কুইডই নয়, অনেক অক্টোপাস, সি কিউকাম্বার ('সমুদ্র শসা' লেখার চেয়ে ইংরেজিটাই বেশি জাঁদরেল মনে হলো !),তারা মাছও (যেমন- Brittle stars) এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। রিফ স্কুইড (Reef Squid) প্রজাতির পুরুষ সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলো নিঃসরণ করতে পারে। যখন স্ত্রী স্কুইডরা ডিম দেয়, তখন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ঘরের বাইরে আলো জ্বালিয়ে পাহারা দিতে থাকে, "No Entry" !

১৭।
সমুদ্রের বায়োলুমিনেসেন্ট জীবদের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্যামোফ্লাজ (Camouflage) তৈরি করা। ক্যামোফ্লাজ কী জিনিস ? বলা যেতে পারে শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ছদ্মবেশ নেওয়া। হাঙরের মতো কিছু শিকারি প্রাণী নিচ থেকে শিকার করে। তারা লক্ষ রাখে ওপরের দিকে, সূর্যের যে আলো আসছে, জলে তার কোনো ছায়া পড়ছে কিনা। যদি পড়ে, তাহলে নির্ঘাত সেখানে একটা শিকার রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতেই গভীর সমুদ্রের অনেক প্রাণী ছদ্মবেশ ধারণের জন্য বায়োলুমিনেসেন্সের সাহায্য নেয়। এর মধ্যে রয়েছে ববটেইল স্কুইড, হ্যাচেটফিশ, জেলিফিশ, চিংড়ি (Crustaceans) এবং মাছের কিছু কিছু প্রজাতি। এসব প্রাণীর দেহ থেকে নির্গত আলোর ঔজ্জ্বল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে চট করে প্রেক্ষাপটের সাথে তাদের রং মিলিয়ে যায়। এ কারণে শিকারি প্রাণীগুলো সহজে এদের ধরতে পারে না।

শিকারির হাত থেকে বাঁচার জন্য সামুদ্রিক জীবদের আরও একরকম পদ্ধতি নিতে দেখা যায়। ভাবুন তো, অন্ধকার ঘরে হঠাৎ করে যদি আপনার চোখে টর্চের আলো ফেলা হয়, তাহলে কি আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে না ? চমকে উঠবেন না আপনি ? তেমনি শিকার করতে আসা প্রাণীরাও বায়োলুমিনেসেন্ট প্রাণীর আলোর ঝলকে হকচকিয়ে যায়। এই পদ্ধতির প্রয়োগ শিকার ধরতেও অনেক বায়োলুমিনেসেন্ট প্রাণী ব্যবহার করে থাকে। ফ্ল্যাশলাইট ফিশের চোখের কাছে বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়ার থলি থাকে, এই আলো দিয়ে তারা ছোটো মাছকে অকস্মাৎ চমকে দেয়, ছোটো মাছটা কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই সাবাড় হয়ে যায় ফ্ল্যাশলাইটের পেটে ! গভীর সমুদ্রের কিছু ড্রাগনফিশ (যেমন : loosejaw dragonfish) বায়োলুমিনেসেন্স ব্যবহার করে পথ চলার সার্চলাইট হিসেবে। আগেই বলেছি, অধিকাংশ সামুদ্রিক জীব নীল এবং সবুজের মধ্যে আলো তৈরির ক্ষমতা রাখে এবং ওই রংগুলোতেই তারা সংবেদনশীল। কিন্তু এই ড্রাগনফিশ লাল আলো নিঃসরণ করে। সামুদ্রিক পরিবেশে বিশেষ সুবিধা দিতেই তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত হয়েছে। কারণটাও বেশ মজার। তার শিকার করা বেশিরভাগ মাছ এই আলো দেখতে পায় না-ফলে শিকারি খুব সহজেই শিকারকে গ্রাস করে ফেলে !

১৮।
সিরিজটা শুরু করেছিলাম আমার স্বপ্নে অ্যাংলার ফিশের হানা দেওয়ার কথা দিয়ে। তার কথা বলি এবার। সমুদ্রের প্রায় ২,০০০ মিটার গভীরে এই মাছগুলো বিচরণ করে থাকে। দেহের তুলনায় এদের চোয়াল বেশ বড়ো। তবে এই মাছের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হচ্ছে এর মাথার সামনের দিকের অ্যান্টেনার মতো প্রবৃদ্ধি। একে বলে ফিলামেন্ট (filament)। ফিলামেন্টের মাথায় বলের মতো অংশ থাকে, যার নাম এস্কা (Esca)। এর মধ্যে থাকে বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়ার আলো মাছের টোপ হিসেবে কাজ করে। সমুদ্রে চলতে সাহায্য করা ছাড়াও ঐ আলো ছোটো ছোটো মাছদের আকর্ষণ করে, আর যখন মাছগুলো তাদের ভুল বুঝতে পারে, ততক্ষণে তারা অ্যাংলার ফিশের শক্ত চোয়ালের মধ্যে চলে এসেছে। সামুদ্রিক বায়োলুমিনেসেন্ট প্রাণীদের এই যে আলোচনা তা মোটেই শেষ হবার নয়। এরকম আরও বহু জীব রয়েছে যার বর্ণনা এখানে দিইনি আমি। বহু জীবের বায়োলুমিনেসেন্সের কারণ, তাদের উদ্দেশ্য এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে।

বিজ্ঞানীরাও বসে নেই মোটেই। বায়োলুমিনেসেন্সের রহস্যভেদ করে কীভাবে মানবকল্যাণে একে ব্যবহার করা যায়, তার চেষ্টা চলছে অবিরত। ইতোমধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি আবিষ্কারও করেছেন তারা। ব্যাকটেরিয়ার কোরাম সেন্সিং-এর কথা বলছি। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করার জন্য *Vibrio fischeri* ব্যাকটেরিয়ার কোরাম সেন্সিং-কে কাজে লাগানো হয়। যখন পানিতে বিষাক্ততা থাকে বা পিএইচের অস্বাভাবিকতা থাকে, তখন এদের আলোর তীব্রতা অনেক কমে যায়। আবার চিকিৎসায়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এর প্রয়োগক্ষেত্র বাড়ছে। উইসকন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বায়োলুমিনেসেন্ট *E.coli* ব্যাকটেরিয়ার জিনোমে পরিবর্তন করে বাল্ব হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। আমেরিকার রিসার্চ ফার্ম বায়োগ্লো এর গবেষকরা বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়ার জিন ব্যবহার করে জেনেটিক্যালি মডিফাইড তামাক গাছ তৈরি করেছেন-স্টারলাইট অ্যাভাটার। এরা তাদের জীবনকালের সম্পূর্ণ সময়েই আলো দেয়। সেইদিনও বেশি দূরে নয়, যখন উদ্ভিদগুলো আলো জ্বালিয়ে তাদের জল-পুষ্টির প্রাপ্যতা, অভাব কিংবা ফল দেওয়ার সময় নির্দেশ করবে, রাস্তার পাশে পৃথক বাতির দরকার হবে না। বায়োলুমিনেসেন্ট উদ্ভিদ পরিবেশ রক্ষা করবে, বিদ্যুতের খরচও কমাতে পারে হয়তো। এজন্য আমরা বরাবরের মতোই সেসব আলোকিত মানুষদের দিকে চেয়ে আছি, যদিও তারা বিবর্তনের ধারায় বায়োলুমিনেসেন্ট নন, কিন্তু যুগ-যুগ ধরে তাদের আলো আমাদের কল্যাণের পথ দেখিয়ে এসেছে।

৫২ থেকে ৭৮ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায় সমুদ্রের বড়ো মাছ, যাকে বলা হয় সাদা তিমি বা Beluga Whale.

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

সমুদ্রের ঘোড়া

সালমান আহমেদ

বিসিবি টিমের সাথে সমুদ্র ভ্রমণে আসার পর হঠাৎ সমুদ্রের তলদেশে আপনি হারিয়ে গেলেন। এখন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আবার দেখলেন, আপনার পেছনে একটি অক্টোপাস তাড়া করেছে। আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন পালাতে। এমন সময়ে আপনার সামনে একটি সি-হর্স দেখতে পেলেন। আপনিও না বুঝে সেখানে চেপে বসতে চাইলেন। থামুন...... ঘুম ভাঙুন... নয়তো অক্টোপাসের পেটে যেতে হবে।

সি-হর্স (সমুদ্রের ঘোড়া) হলো এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ। এদের মাথার অংশ দেখতে ঘোড়ার মাথার মতো, তাই এদের নাম সি-হর্স। এখন পর্যন্ত এদের ৫৪ টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের জীবনকাল প্রায় তিন বছর। এক একটি সি-হর্স লম্বায় প্রায় ২ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার এবং ওজন ২০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের লেজ কিছুটা প্যাঁচানো থাকে। এদের চোখ দুটো স্বাধীনভাবে কাজ করে। একই সাথে এরা সামনের এবং পেছনের জিনিস দেখতে পারে। প্যাসিফিক সি-হর্স ৬৯ মিটার গভীর পানি অবদি টিকে থাকতে পারে।

মাছেদের মধ্যে এরা সবচেয়ে দুর্বল সাঁতারু। Dwarf Seahorse-এর গতিবেগ ঘণ্টায় ১.৫ মিটার। সাঁতার কাটার জন্য এদের একজোড়া পৃষ্ঠীয় পাখনা রয়েছে। এরা মিনিটে এগুলো ৫০ থেকে ৬০ বার নাড়াতে সক্ষম। এদের দেহে এক ধরনের বায়ুথলি থাকে, যার নাম 'সুইম ব্লাডার'। এর সাহায্যে বাতাসের পরিমাণ ঠিক রেখে এরা ওপরে নিচে চলাফেরা করে। এদের মুখে থাকা 'স্নুট' দিয়ে শিকারের রস শুষে নেয়। প্রাপ্তবয়স্কদের পেট ভরার জন্য দৈনিক ৩০ থেকে ৫০টি ছোটো চিংড়ির প্রয়োজন হয়। সি-হর্সের জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যপূর্ণ। সঙ্গমের সময় স্ত্রী সি-হর্স পুরুষ সি-হর্সের এলাকায় চলে আসে। একই সাথে তারা দুজনে রং পালটাতে থাকে। স্ত্রী সি-হর্স পুরুষ সি-হর্সের পেটের থলিতে ডিম পাড়ে। এই থলিকে Brood Pouch বলে যা অনেকটা ক্যাঙারুর মতো। ছোটো প্রজাতির সি-হর্স ৫০ থেকে ৬০ এবং বড়ো প্রজাতিরগুলো প্রায় ১৫০০টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। প্রজাতিভেদে ডিমগুলো ফোটার আগে প্রায় ৪৫ দিন পর্যন্ত থলিতে থাকে। ফোটার পর ছোটো বাচ্চাগুলো অন্য বাচ্চাদের খুঁজে দলবেঁধে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। ক্যাঙারুর বাচ্চার মতো থলিতে ফিরে আসে না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গড়ে তোলে নিজের এলাকা

গ্রহাণুদের গল্প

হৃদয় হক

"Stars mean different things to different people. For travelers, stars tell them where they are, where they are going. For others, they are just little lights in the sky. For scholars, they are the world of the unknown, yet to be discovered and understood. For my businessman, they are gold. But all stars stay silent. And you ? No one else in the world will see the stars as you do... For you, and only for you, the stars will always be laughing."

- The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry

আপনি যখন সৌরজগতের গ্রহগুলোর ডায়াগ্রামের দিকে নজর দেবেন, দেখবেন মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে এক বিরাট শূন্যস্থান। জার্মান বিজ্ঞানী বোড ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কারের ১০০ বছর আগে দেখেছিলেন যে, একটা গ্রহ থেকে তার পরেরটা কত দূরে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে, তার নিয়ম বাঁধা আছে। তিনি সেই নিয়মটা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু সেই নিয়ম মতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির ফাঁকটা অনেক বড়ো। এই গ্যাপ জ্যোতির্বিদদের মনে অশান্তি দিচ্ছিল। উনারা এই ফাঁকা জায়গাতে একটা গ্রহ দেখতে চেয়েছিলেন। ১লা জানুয়ারি, ১৮০১ সালে তাঁরা তাঁদের এই ইচ্ছা আংশিকভাবে পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতালীয় জ্যোতির্বিদ জুসেপ্পে পিয়াজ্জি আকাশে একটি আলোক বস্তু দেখতে পান, যার গতি ছিল আকাঙ্ক্ষিত গ্রহটির জন্য একেবারেই নিখুঁত। কিন্তু তা দেখতে ছিল একটা সূক্ষ্ম বিন্দুমাত্র। তিনি প্রথমে এটাকে ধূমকেতু ধরে নেন কিন্তু পরে জানা গেল যে, ওটা ধূমকেতু নয়। আর এই নতুন বস্তুটিকে গ্রহ ধরে নাম দেওয়া হয় সিরিস। কিন্তু এটি কি কোনো গ্রহ ছিল ?

এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রথমে সংশয়ে ছিলেন। এর কিছু বছর পর সেই ফাঁকা জায়গায়, ১৮০২ সালে এইরকম ২য় একটি বস্তুর আবির্ভাব ঘটে, তারপর ১৮০৪ সালে ৩য় ও ১৮০৭ সালে ৪র্থ একই জাতের বস্তু দেখা যায়। এ থেকে উনারা নিশ্চিত হলেন যে

এটি সৌরজগতের নতুন কোনো শ্রেণীর বস্তু। যেহেতু এই বস্তুগুলো সেই সময়ের টেলিস্কোপে ছোটো ছোটো বিন্দুর মতো দেখাত আর খালি চোখে দেখতে পাওয়া তারাদের মতো উজ্জ্বল ছিল, তাই এই নতুন বস্তুটির নাম দেওয়া হয় 'অ্যাস্টারয়েডস' (Asteroids), যা একটি গ্রিক শব্দ। এর অর্থ হলো তারা-স্বরূপ (Star-like) বা তারা-আকৃতির (Star-shaped)। আর বাংলায় বলা হয় "গ্রহাণুপুঞ্জ"। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা আরও অনেকগুলো গ্রহাণুর সন্ধান পান যার সংখ্যা আজ বিলিয়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুমান করা হয় আমাদের সৌরজগতে ১ মিলিয়নের মতো গ্রহাণু আছে যা ১ কি.মি. থেকে লম্বা আর এদের ব্যাসার্ধ ১০০ মিটার থেকে ১০০ কি.মি. হয়ে থাকে।

তাহলে, কী এই গ্রহাণু ? আসলে কোনটা গ্রহাণু আর কোনটা গ্রহাণু নয়—তার জন্য কোনো সংজ্ঞার্থ ধরাবাঁধা নেই তবে, সাধারণত গ্রহাণু হলো ছোটো আকৃতির এক ধরনের বস্তু যা পাথর বা ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং এরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘোরে ও এদের সীমানা বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথ পর্যন্ত বিদ্যমান। অবশ্য, যেসব ছোটো আকৃতির বস্তু বৃহস্পতির কক্ষপথের বাহিরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাদের আলাদা সংজ্ঞার্থ আছে। তবে এ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

নামকরণ :

গ্রহাণুদের নাম মূলত দেবীদের নামে হয়ে থাকে, যেমন : সেরেস, ভেস্তা, জুনো ইত্যাদি। কিন্তু এদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে যায় যে তা দেবীদের নাম দিয়ে আর কুলানো যায়নি। তাই অনেক রকম কাজ করে করে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের পারমিশন নিয়ে কোনো জ্যোতির্বিদ যদি গ্রহাণু আবিষ্কার করেন, তিনি তাঁর পছন্দের নাম দেন। অনেকে নামের সাথে নানা নম্বরও দেন। অনেক জ্যোতির্বিদ তাদের নামের সাথে মিলিয়েও আবিষ্কৃত গ্রহাণুটির নাম রাখেন।

তবে আজকাল নতুন গ্রহাণুদের ক্ষেত্রে এক রকম বিশেষ রীতিতে নাম দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে গ্রহাণুটির আবিষ্কারের সাল ও তার সাথে আলফা-নিউমেরিকের ২টি বর্ণ দিয়ে কোড আকারে নামকরণ করা হয়। ১ম বর্ণটা আবিষ্কৃত সালের সেই মাসের ১ম অর্ধেক আর ২য় বর্ণটা সেই মাসে আবিষ্কৃত যত নম্বর গ্রহাণু তার সংখ্যা নির্ধারণ করে। এভাবে নামকরণ করা আপেক্ষিকভাবে সোজা। যেমন ধরুন, ১ম বর্ণ 'A' হলে সেটা বুঝাবে জানুয়ারি মাসের ১ম অর্ধেক, 'B' থাকলে সেটা বুঝাবে জানুয়ারি মাসের ২য় অর্ধেক। এভাবে ক্রমান্বয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষ অর্ধেকে গিয়ে দাঁড়াবে 'Y'। এখানে যদিও ১২ মাসে ২৪টা বর্ণ হিসেবে 'X' হবার কথা কিন্তু তা হয় না কারণ, এতে 'I'-কে বাদ দেওয়া হয়। এটি মূলত করা হয় যেন তা '1'-এর সাথে মিশে গিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি না করে। আবার ২য় বর্ণ 'A' হলে বুঝবেন সেটা উক্ত মাসের ১ম গ্রহাণু, 'B' হলে একই মাসের ২য় গ্রহাণু। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে 'Z' পর্যন্ত ২৫ নম্বর গ্রহাণুকে বোঝায়। এখানেও একই কারণে 'I'-কে বাদ দেওয়া হয়।

আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় একই মাসে ২৫টার বেশি গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়। তখন ২য় বর্ণের পাশে ২৫টা বর্ণ কতবার পুনরাবৃত্তি হলো সেই সংখ্যা থাকে। যেমন যদি ২য় বর্ণ ও তার পাশের সংখ্যা এমন থাকে 'A1' তাহলে বুঝতে হবে এখানে 1 হলো '১-২৫' পর্যন্ত ১বার সম্পন্ন হয়ে তার সাথে 'A' থাকায় আরও ১ বৃদ্ধি পাওয়া, 'B2' হলে ২বার ঘুরে এসে 'B' এর জন্য আরও ২ বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ, শেষে 1 থাকা মানে ১-২৫ একবার শেষ হয়েছে, 2 থাকা মানে দুইবার ১-২৫ শেষ হয়েছে। সহজভাবে বললে, এই শেষের 1,2 থাকলে ২৫ দিয়ে এদের গুণ দিয়ে এর সামনে যে বর্ণ থাকবে তার ক্রমিক নম্বর যোগ করে দিলেই হয়। যেমন : শেষে 'B3' হলে ২৫ কে ৩ দিয়ে গুণ দিয়ে প্রাপ্ত গুণফলের সাথে 'B' এর ক্রমিক নম্বর ২ যোগ করে দিলেই গ্রহাণুটির সংখ্যা পেয়ে যাব। এক্ষেত্রে তা হবে : (২৫×৩)+২ = ৭৭।

এখন কিছু সরাসরি উদাহরণে যাওয়া যাক। যদি কোনো গ্রহাণুর নাম '2015 AA' হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, এটা ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসের ১ম অর্ধেকের ভেতর আবিষ্কৃত ১ম গ্রহাণু। আবার, '1950 FC1' হলে বুঝতে হবে যে, এটি ১৯৫০ সালের মার্চের ২য় অর্ধেকে আবিষ্কৃত ২৮তম গ্রহাণু। এবার শেষ একটা উদাহরণ দিই, '1992 QB1' থাকলে কী হবে ? উত্তর হবে-১৯৯২ সালের আগস্ট মাসের ২য় অর্ধেকে আবিষ্কৃত ২৭তম গ্রহাণু। এটা না বুঝলে ওপরের ২টা প্যারা আবার পড়েন। আর বুঝে থাকলে '1998 RE1'-টা নিজে ভাবুন। এরপর এই নতুন গ্রহাণুটা যে আসলেই গ্রহাণু তা নিশ্চিত হবার পর একে অফিসিয়াল নম্বর দেওয়া হয়। এখানে বিশেষ করে যত নম্বরে আবিষ্কার করা হয় সেটি দেওয়া থাকে। যেমন 2015 AA গ্রহাণুটি ১৯৭৮৪৫ নং আবিষ্কৃত গ্রহাণু হলে এটাই এর অফিসিয়াল নম্বর। একে তখন এভাবেও লেখা যেতে পারে, 197845 (2015 AA) বা (197845) 2015 AA।

যাহোক, আজকাল বিখ্যাত ব্যক্তি বা জনপ্রিয় চরিত্রের নামেও গ্রহাণুদের নাম দেওয়া হয়। যেমন : (2309) Mr. Spock, (9007) James Bond ইত্যাদি। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নামকরণে কিছু লিমিট থাকে। যেমন : বৃহস্পতির ট্রোজান গ্রহাণু (যা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব) এদের নাম গ্রিকদের ট্রোজান যুদ্ধের হিরোদের নামেই দিতে হবে।

কোথা হতে এলো তারা...

আমাদের সৌরজগৎ যখন তৈরি হচ্ছিল, আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের কেন্দ্রের আশেপাশের অন্য অংশ হতে বেশি ঘনত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এটি খুব দ্রুত সংকুচিত হতে থাকে। সেখানে তৈরি হয় আমাদের প্রোটোসূর্য তারপর সেখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং দৃশ্যমান আলোর দেখা মেলে। তাপমাত্রা আরও অনেক বাড়ার পর শুরু হয় নিউক্লিয় বিক্রিয়া, সৃষ্টি হয় আমাদের পরিপূর্ণ সূর্য, যা মেঘটির কেন্দ্রের স্থান দখল করে নেয়। এরপর আশেপাশের সকল বস্তু চাকতির ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে। আশেপাশের সকল বস্তু সূর্যকে কেন্দ্র

করে ঘুরতে শুরু করে। আর সেখান থেকে তৈরি হয় গ্রহ। গ্রহ তৈরি হবার সময় এরা মেঘ থেকে অনেক বেশি উপাদান আকর্ষণ করে নিতে শুরু করে। স্বল্প ভর থেকে অধিক ভর যুক্ত হতে থাকে, সেই সাথে আকারও বাড়াতে থাকে। আমাদের রক্ষক মানে বড়ো ভাই বৃহস্পতি তার আশেপাশের অধিকাংশ উপাদান আকর্ষণ করে নেয় তবে সবটুকু নয়। যেগুলো বাকি থাকে, ভারী উপাদানগুলো মাঝে টেনে নেয় আর হালকা উপাদানগুলো ওপরের স্তরে আকর্ষিত হতে থাকে, মানে তারাও গ্রহ হবার চেষ্টা চালায়। গ্রহ হবার শর্তগুলো মোটামুটিভাবে পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি নয়। তাই গ্রহ গঠিত হতে পারেনি বা হয়েও স্থিরতা লাভ করেনি। কোনো কারণে তারা মহাকাশে অজ্ঞাত বিপর্যয়ের ফলে ভেঙে হাজারো খণ্ড হয়ে যায়, সেই সম্ভাব্য বা বিনষ্ট গ্রহের দেহবস্তুই ছোটো ছোটো টুকরা হয়ে ওখানে ছড়িয়ে আছে আর সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। তাই আমরা এ গ্রহাণু বেষ্টনী দেখি। এসব গ্রহাণুর কিছু হচ্ছে গ্রহ গঠনের সেই ঘন কোর বা মাঝের অংশ থেকে আর কিছু তার ওপরের হালকা অংশে থেকে, তাই এদের উপাদানে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেকের ধারণা, গ্রহগুলির জন্মের সময় যে-সব অতি ক্ষুদ্র বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল, হয়তো তারা কোনো কারণে জমাট বেঁধে বিরাট গ্রহে রূপান্তরিত হতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই ভাঙাচোরা গ্রহাণুগুলি সুয্যিমামাকে অন্যান্য ভাগ্নের (গ্রহের) মতোই প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এদেরকে ব্যর্থ গ্রহও বলা হয়। এরা আবার 'Minor planet' অথবা 'Planetoid' গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। ধারণা করা হয় যে, বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে আরও অনেক গ্রহাণু ছিল। কিন্তু সেগুলো হয় আমাদের বড়ো ভাই খেয়ে ফেলেছেন না হয় তার ক্ষমতা দেখাবার জন্য মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে তাদের কক্ষপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে জোর করে বের করে দেন। অবশ্য এর ফলেই হয়তো মঙ্গল গ্রহের আকার ছোটো। কারণ মঙ্গল গ্রহ বেড়ে ওঠার সময় বড়ো ভাই বৃহস্পতি তার খাদ্য মেরে দিয়েছেন।

উপাদান ও আকার :

গ্রহাণুদের আকার বেশ উদ্ভট। কেউ গোল তো কেউ তে-কোনা, কেউবা একেবারে লম্বা। বড়ো আর ভারী গ্রহাণুগুলো মোটামুটি গোলাকার, কিন্তু ছোটোগুলো বেশি অনিয়মিত আকৃতির হয়। বিজ্ঞানীরা এদের আকার, এরা কতটুকু সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটায় ও কতটুকু তাপ বিচ্ছুরিত করে তার ওপর ভিত্তি করে বের করেন।

আপনার যদি গ্রহাণুদের খেতে ইচ্ছে হয় তাহলে খেয়ে দেখতে পারেন। এরা নানান ফ্লেভারের হয়। অবশ্য যেহেতু চকলেট ফ্লেভার নেই তাই না খাওয়াই উত্তম। যাহোক, এদের উপাদানের বৈশিষ্ট্য বিচারে প্রধানত ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: C-type, S-type এবং M-type. তবে আরও অধিক বৈশিষ্ট্য বিচারে এদের নানান উপপর্বেও ভাগ করা হয়।

বেশিরভাগ, প্রায় ৭৫% গ্রহাণু কার্বন দিয়ে তৈরি, এরা হলো সি-টাইপ (C-type) বা কার্বনেশাস। এরা কালচে বর্ণের। তবে এদের প্রকৃত সংখ্যা বের করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এর মূল কারণ, এরা বেশ

কালচে। কালো হওয়ায় এরা খুব কম আলোর প্রতিফলন ঘটায়, তাই সব কয়টাকে দেখা খুবই মুশকিল। প্রতিফলনের ব্যাপারটা বিজ্ঞানীগণ 'Albedo' নামের এক প্রক্রিয়ায় নির্ধারণ করে থাকেন। কোনো বস্তুর পৃষ্ঠে যে পরিমাণ আলো পড়ে আর যে পরিমাণ শোষিত না হয়ে প্রতিফলিত হয় তাকে আলবেদো বলে। যদি কোনো বস্তুর পৃষ্ঠে আলো শোষিত না হয়ে সবটাই প্রতিফলিত হয় আসে তাহলে তার আলবেদো ১, আর যদি কোনো বস্তুর পৃষ্ঠে আলো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে না আসে তাহলে তার আলবেদো ০ হয়। এই সি-টাইপ গ্রহাণুদের আলবেদো ০.০৩ - ০.০৯ এর মধ্যে পড়ে। বুঝতেই পারছেন এরা কতটা কালচে। অবশ্য এর চেয়েও কালচে এক প্রকার গ্রহাণু আছে যারা সি-টাইপদের মতোই। এদের আগে RD-type বলা হলেও এখন এদের ডি-টাইপ (D-type) বলা হয়।

এরপর আবার, ১৭% গ্রহাণু বেশিরভাগই সিলিকন বা দস্তার তৈরি এদের বলে এস-টাইপ (S-type) বা সিলিকেশাস। এরা তুলনামূলকভাবে ভালোই উজ্জ্বল, এদের আলবেদো ০.১০-০.২২ হয়ে থাকে। এদের বেশিরভাগই থাকে প্রধান বেষ্টনীর মধ্যভাগে। প্রকৃতিতে এরা ধাতব। এদের গঠনে আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট থাকে। আর বাকি ৮% হলো এম-টাইপ (M-type) বা মিসেলেনিয়াস (Miscellaneous)। এরা অন্যান্য মেটাল পদার্থের তৈরি তবে এদের মধ্যে লোহার আধিক্য বেশি। এদের আলবেদো ০.১০ - ০.১৮। এই টাইপের গ্রহাণুর সি-টাইপ ও এস-টাইপ গ্রহাণুর সাথে বেশ অমিল। বলা যায়, যেসব গ্রহাণুকে সি ও এস-এ স্থান দেওয়া যাচ্ছে না তাদেরকে এম-টাইপ-এ স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য অনেকে ধারণা করেন, যে গ্রহ ভেঙে গ্রহাণু হয়েছে, তার কোরের উপাদান দিয়ে এম-টাইপ গ্রহাণুর জন্ম। এদেরকে 'উড়ন্ত খনি' বলা যায়। এ টাইপের ১ মাইল চওড়া গ্রহাণুতে এত পরিমাণ খনিজ সম্পদ থাকতে পারে যে, এদের মূল্য বর্তমান হিসেবে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে।বাকী গল্প আগামী সংখ্যায়।
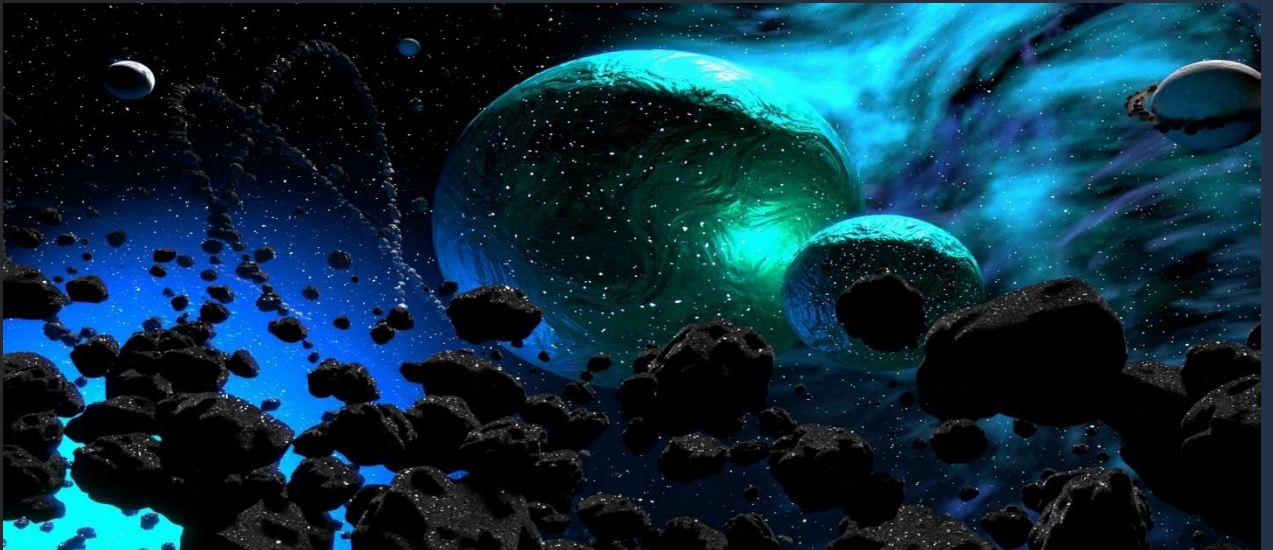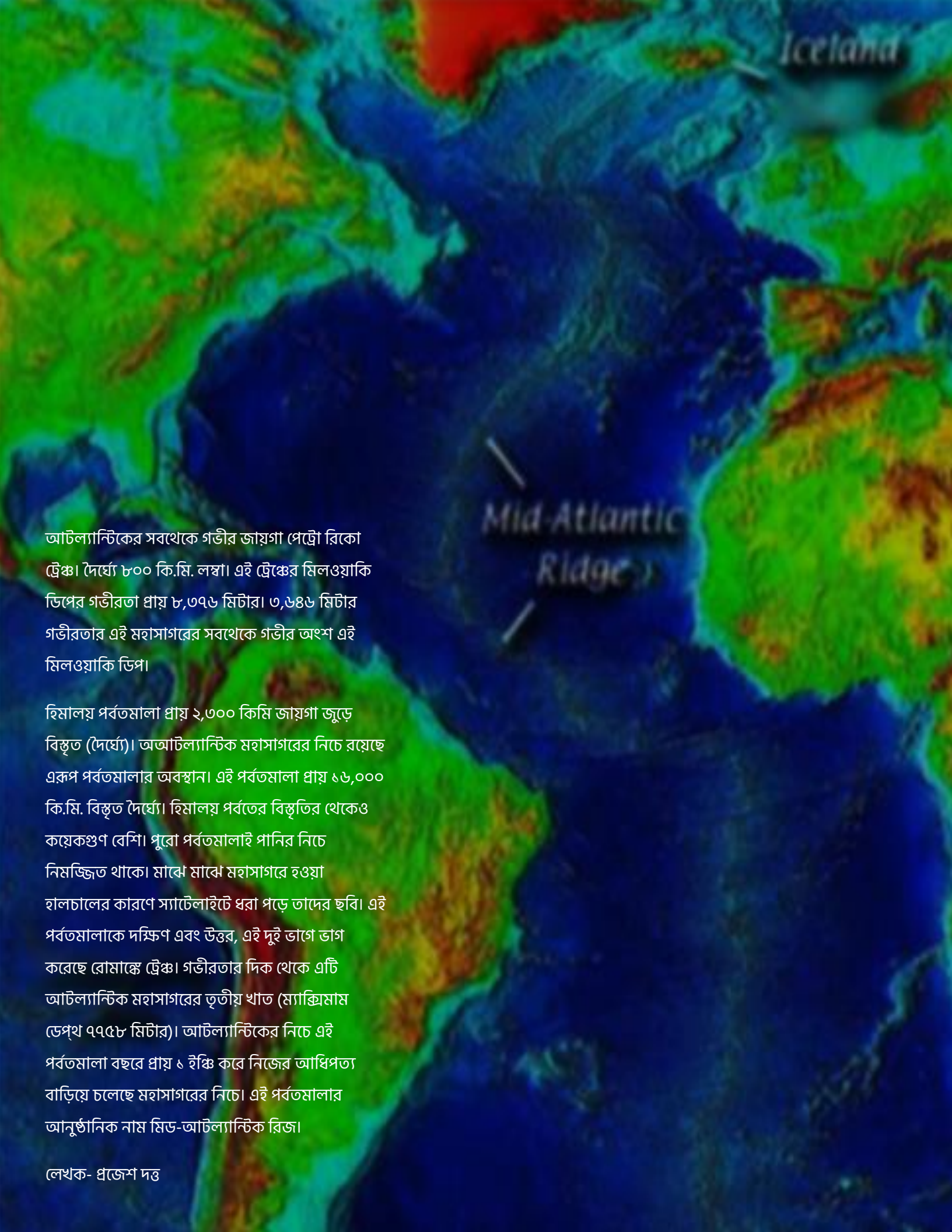
আটল্যান্টিকের সবথেকে গভীর জায়গা পেট্রো রিকো ট্রেঞ্চ। দৈর্ঘ্যে ৮০০ কি.মি. লম্বা। এই ট্রেঞ্চের মিলওয়াকি ডিপের গভীরতা প্রায় ৮,৩৭৬ মিটার। ৩,৬৪৬ মিটার গভীরতার এই মহাসাগরের সবথেকে গভীর অংশ এই মিলওয়াকি ডিপ।

হিমালয় পর্বতমালা প্রায় ২,৩০০ কিমি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত (দের্ঘ্যে)। অআটল্যান্টিক মহাসাগরের নিচে রয়েছে এরূপ পর্বতমালার অবস্থান। এই পর্বতমালা প্রায় ৬৬,০০০ কি.মি. বিস্তৃত দৈর্ঘ্যে। হিমালয় পর্বতের বিস্তৃতির থেকেও কয়েকগুণ বেশি। পুরো পর্বতমালাই পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। মাঝে মাঝে মহাসাগরে হওয়া হালচালের কারণে স্যাটেলাইটে ধরা পড়ে তাদের ছবি। এই পর্বতমালাকে দক্ষিণ এবং উত্তর, এই দুই ভাগে ভাগ করেছে রোমাঙ্কে ট্রেঞ্চ। গভীরতার দিক থেকে এটি আটল্যান্টিক মহাসাগরের তৃতীয় খাত (ম্যাক্সিমাম ডেপ্থ ৭৭৫৮ মিটার)। আটল্যান্টিকের নিচে এই পর্বতমালা বছরে প্রায় ৬ ইঞ্চি করে নিজের আধিপত্য বাড়িয়ে চলেছে মহাসাগরের নিচে। এই পর্বতমালার আনুষ্ঠানিক নাম মিড-আটল্যান্টিক রিজ।

লেখক- প্রজেশ দত্ত

জার্নি টু দ্য সেন্টার অভ দ্য আর্থ

নাঈম হোসেন ফারুকী

প্রথম অধ্যায়

Structure of the Earth

Oceans
~14000 feet (4267 m)
Atmosphere
300 miles (480 km)
"Moho"
Continents
Crust
thickness varies from ~3 to 5 miles (8 km) under the oceans to as much as 25 miles (32 km) under continents, consists mostly of granitic and mafic silicates rocks
Lithosphere
(rigid crust and upper mantle)
~60 mi (100 km)
Asthenosphere
(partially molten or deforms fluidly like "plastic under pressure")
~430 mi (700 km)
Mantle
consists mostly of ultramafic silicates
Lower Mantle
(more rigid than asthenosphere probably due to great pressure)
Core-Mantle Boundary
~1800 mi (2885 km)
Outer Core
(liquid phase)
Core
consists of mostly iron, nickel, and sulfur
Lehmann Discontinuity
~3200 mi (5155 km)
Inner Core
(rigid)
~3,960 mi (6,371 km)

মানুষের তৈরি সবচেয়ে গভীর গর্তটার নাম হচ্ছে রাশিয়ার কোলা সুপারডিপ বোরোহোল। বহুদিন আগে মানুষের আগ্রহ যখন তুঙ্গে ছিল, মানুষ প্রায় বারো কিলোমিটার গভীর একটা গর্ত খুঁড়েছিল মাটির নিচে কী আছে দেখার জন্য। মোটামুটি বিশ বছর ধরে আস্তে আস্তে ড্রিল করে করে শক্ত পাথরের ভেতর দিয়ে আমরা বারো কিলোমিটার নিচে নামতে পেরেছি।

এই কূপে মাটির ৬ কিলোমিটার গভীরে পাওয়া গেছে বহুবছর আগের প্ল্যাঙ্কটনের ফসিল। ৭ কিলোমিটার গভীরে পাথরের ভেতর পাওয়া গেছে পানির স্তর, ওপরের শক্ত পাথর ভেদ করে যেটা উঠে আসতে পারে না। গর্ত থেকে উঠে এসেছে প্রচুর হাইড্রোজেন গ্যাস। শেষ পর্যন্ত বারো কিলোমিটার গভীরতায় তাপমাত্রা যখন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে, খোঁড়াখুঁড়ি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েত সরকার এই প্রজেক্ট বন্ধ করে দেয়।

এর গভীরে কী আছে আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। ভূমিকম্পের সাইজমিক অ্যাক্টিভিটি বিশ্লেষণ করে ভেদ করা হয় পাতালপুরীর রহস্য। যদি কোনো দিন প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা ড্রিল মেশিন তৈরি করা যায় অথবা অদ্ভুত তাপ সহনীয় কোনো যানে চেপে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি আগ্নেয়গিরির গভীরে, আমরা দেখতে পারব কী আছে ওই রহস্যপুরীতে। চোখ বন্ধ কর, ধরে নাও এরকম একটা যান রেডি। যত তাপ লাগুক এই যান গলবে না, চাপে ভর্তা হবে না। এই রকম একটা যানে চেপে চল আমরা ঘুরে আসি পাতালপুরীর গভীর থেকে।

১.
মাটির সবচেয়ে ওপরের লেয়ারের নাম হচ্ছে টপসয়েল। মাত্র কয়েক ইঞ্চি পুরু এই জায়গাটায় আছে প্রচুর পরিমাণ সার, মরা জীবদেহ, ঝরা পাতা, পচাগলা প্রাণী। এরপর আরেকটু গভীরে গেলে আছে সাবসয়েল। সেখানকার মাটিতে পুষ্টি উপাদান অনেক কম। এই টপসয়েল আর সাবসয়েল-এটুকুই হচ্ছে নরম মাটি। এই জায়গায় শিকড় ছড়িয়ে গাছপালা হয়, আমরা ছোটো থেকে বড়ো হই, আবার মরার পর এই মাটিতেই মিশে যাই, হয়তো সারা জীবন এর নিচে কী আছে না জেনেই।

এর পরের জায়গাটার নাম প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল। এই স্তর হচ্ছে ভাঙা ভাঙা, গুঁড়া গুঁড়া পাথরের দুনিয়া। এই নরম মাটি, ভাঙা পাথর এসব শেষ হলে আসে শক্ত পাথরের দুনিয়া। এই পাথরের নাম বেড রক।

এরপর থেকে শক্ত সলিড পাথরের দুনিয়া। মহাদেশে এই পাথর নেমে গেছে মোটামুটি ৩০-৫০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত আর মহাসাগরে এটা নেমে গেছে আরও ৫-১০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত। এই জায়গার নাম হচ্ছে পৃথিবীর ক্রাস্ট। পৃথিবী যদি একটা কমলা হয়ে থাকে, ক্রাস্ট হচ্ছে ওই কমলাটার খোসা। কেউ কেউ আজকাল পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের সাথে তুলনা করে, যদিও উটপাখির ডিম শোয়ালেও আসলে কোনোদিন পৃথিবীর আকার পাবে না। যাহোক, এই পৃথিবী ডিম হলে, সেই ডিমের খোসা হচ্ছে এই ক্রাস্ট। এই ক্রাস্টের মূল উপাদান হচ্ছে সিলিকন ডাই অক্সাইড আর অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড।

আমাদের পৃথিবীটা মোটামুটি ছয় হাজার চারশ কিলোমিটার গভীর। আমরা নেমেছি মোটামুটি ৪০ কিলোমিটার। একটা বিল্ডিং যদি এক হাজার তলার সমান হয়ে থাকে, আমরা লিফটে করে নেমেছি মাত্র ৬ তলা। এই ছয় তলাই এত গভীর যে মানুষ কোনোদিন এর অর্ধেকও খুঁড়ে নামতে পারেনি। একটু পরেই তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে অসহনীয় হয়ে যাবে, চাপ হবে মারাত্মক। কিছুক্ষণ পরেই তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাবে, পানি টগবগ করে ফুটতে থাকবে। ৪০ কিলোমিটার গভীরে তাপমাত্রা হবে ৮৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় অ্যালুমিনিয়াম গলে যায়, শক্ত পাথর গলবে না। কারণ প্রচণ্ড চাপ তাকে ধরে রাখবে। আমরা শক্ত গ্রানাইট পাথর খুঁড়ে, প্রচণ্ড চাপ উপেক্ষা করে নিচে নামতে থাকব। গ্রানাইট আস্তে আস্তে ব্যাসল্টে রূপ নেবে। তারপর মোটামুটি ৩০-৫০ কিলোমিটার গভীরে এসে সেটা আচমকা শেষ হয়ে যাবে।

এই জায়গার পর অল্প একটু ব্রেক। মোটামুটি ৫০০ মিটারের মতো। জায়গাটার নাম মোহোরিভিক ডিসকনটিনিউটি। এর ওপরে হচ্ছে ডিমের খোসার মতো ক্রাস্ট। নিচে রহস্যময় ঘন থকথকে, না-কঠিন, না-তরল ২৯০০ কিলোমিটার পুরু ম্যান্টেল।

এই ম্যান্টেলের ওপর দ্বীপের মতো ভেসে বেড়ায় টেকটনিক প্লেটগুলো, নড়াচড়া করে জন্ম দেয় ভূমিকম্পের। এদের ধাক্কায় গজিয়ে ওঠে পর্বতমালা।

এই ম্যান্টেলের গভীর থেকে গলিত ম্যাগমা উঠে আসে মাটিতে, জ্বলে পুড়ে ছারখার হয় শহর, জনপথ।
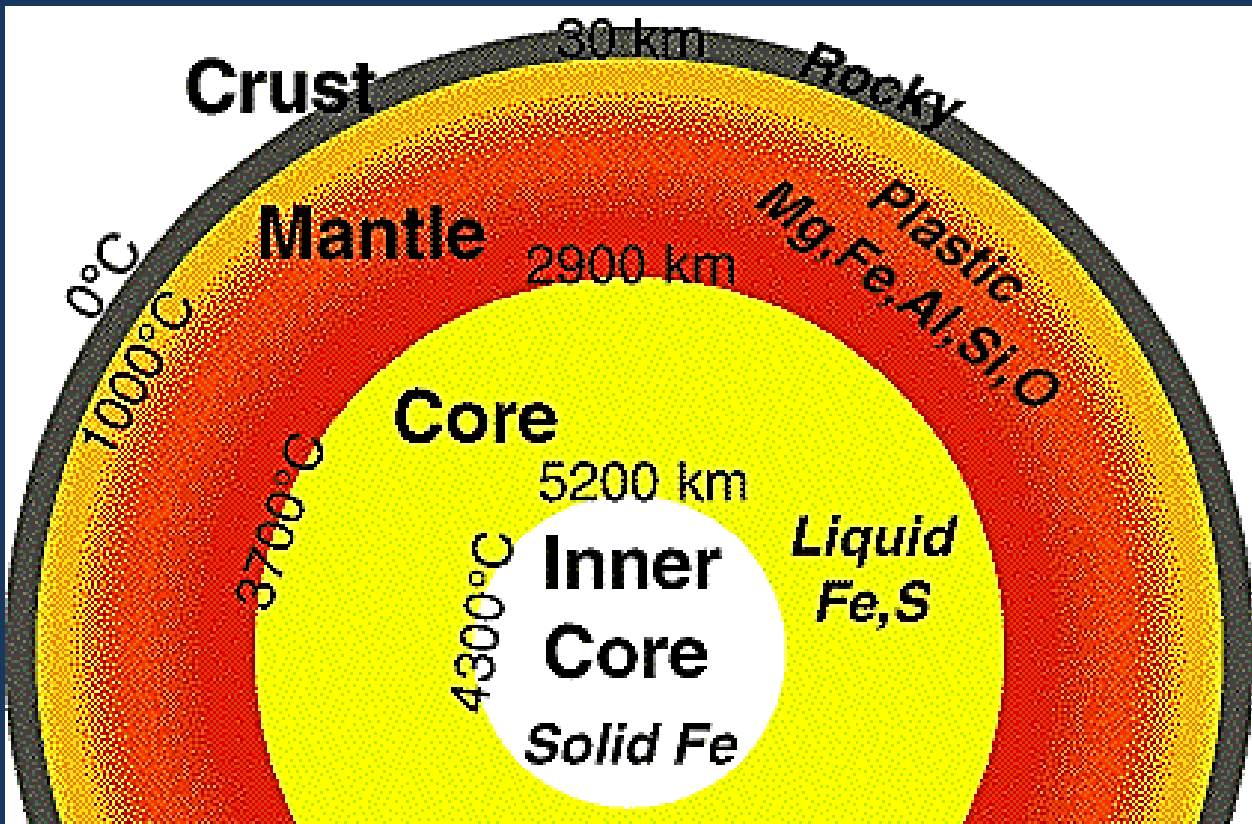
দ্বিতীয় অধ্যায়

ছবিতে একটা ঝলমলে, ঝকঝকে হীরা দেখা যাচ্ছে। যে-কোনো রমণীর হৃদয় জয় করার জন্য যথেষ্ট। অদ্ভুত সুন্দর কিন্তু একই সাথে প্রচণ্ড কঠিন।

আমাদের পরিচিত অন্য প্রায় সব রত্নের জন্ম পৃথিবীর ক্রাস্টে। হীরা সেখানে জন্মাতে পারে না। পৃথিবীর ম্যান্টেলে ১৫০ কিলোমিটার গভীরে ২ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, কয়েক লক্ষ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পৃথিবীর পেটের ভেতর লুকিয়ে থাকা কার্বন জমে শক্ত কঠিন হয়ে ওই হীরার জন্ম হয়। তারপর যখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত পায়, বের হয়ে আসে পৃথিবীর পেটের ভেতর লুকিয়ে থাকা এসব রত্ন। তুমি যখন একটা হীরা হাতে নেবে, তোমার হাতে আসবে
এক টুকরা পৃথিবীর ম্যান্টেল।

পৃথিবীর পেটের ভেতরের নারকীয় ম্যান্টেলে তোমাকে স্বাগত !

১.
মনে কর, তোমার কাছে একটা চুলা আছে, টগবগ করে ফুটছে। ওই চুলার ওপরে হাঁড়িতে রান্না করছ থানকুনি পাতার স্যুপ। কিন্তু এই স্যুপের রেসিপি উদ্ভট টাইপের। এই স্যুপ বানাতে হলে দশ-বারোটা থানকুনি পাতার সাথে কাদা-মাটি মিশিয়ে ভালোমতো ঘুঁটতে হয়। তারপর হাইড্রোলিক প্রেস দিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিতে হয়। স্বপ্নে পাওয়া রেসিপি, এভাবে স্যুপ না বানালে করোনা সারে না।

তাহলে কী হবে ? একদিকে মারাত্মক তাপে ওই স্ন্যুপের সব উপাদান গলে তরল হওয়ার চেষ্টা করবে, অন্যদিকে হাইড্রোলিক প্রেসের প্রচণ্ড চাপে সেটা সলিড হতে বাধ্য হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অতি ঘন, আঠালো আলকাতরার মতো একটা জিনিস তৈরি হবে (একই সাথে অতি অখাদ্য)।

মাটি থেকে মোটামুটি দেড়শ কিলোমিটার গভীরে পৃথিবীর ম্যান্টেলের মোটামুটি ভেতরের দিকটা এরকম। সেটা প্রচণ্ড গরম, এত গরম যে ম্যান্টেলের ভেতরের পাথর গলে লিকুইড হয়ে যেত। কিন্তু বাইরের প্রচণ্ড চাপের কারণে সেটা তরল হতে পারে না। আধা তরল, আধা কঠিন, আলকাতরার মতো অতি ঘন থকথকে অবস্থায় থাকে। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার।

অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের বাইরে, ক্রাস্টের ঠিক নিচে ম্যান্টেলের জায়গাটা এত গরম না। সেটা এখনো পাথরের গলনাঙ্কে পৌঁছায়নি। তাই সেটা শক্ত সলিড পাথরের তৈরি।

এই ম্যান্টেলের বাইরের অংশ থেকে শুরু করে একেবারে ক্রাস্টের ওপরের মাটি পর্যন্ত জায়গাটার নাম হচ্ছে লিথোস্ফিয়ার। বাংলায় বলা যায়- পাথরের গোলক। বেশিরভাগ জায়গায় এই লিথোস্ফিয়ার দেড়শ-দুইশ কিলোমিটার পুরু। কিন্তু কোথাও কোথাও সেটা বেশ পাতলা, মাত্র কয়েক কিলোমিটার। এমনকি কোথাও ছিদ্রও হয়ে গেছে।

এই ঘন-পাতলা মিলিয়ে লিথোস্ফিয়ার অনেকটা টুকরা টুকরা জিনিস। সমুদ্রে ভাসমান ভাঙা ভাঙা বরফের টুকরোর মতো। ঘন থকথকে আলকাতরার মতো অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের ওপর ভাসছে টুকরা টুকরা লিথোস্ফিয়ার।

এই লিথোস্ফিয়ারের একেকটা টুকরার নাম হচ্ছে টেকটনিক প্লেট।

২.

আগুনের ওপর হাঁড়িতে পানি বসালে কী হবে ? গরম পানি উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে আসবে। যত ওপরে আসবে সেটা তাপ হারিয়ে তত ঠান্ডা হবে। সবচেয়ে ওপরে থাকবে কিছুটা ঠান্ডা পানি।
ঠান্ডা জিনিসের ঘনত্ব বেশি। তাই সে নিচের দিকে নেমে যাবে। নিচে গিয়ে আবার গরম হয়ে ওপরে আসবে, আবার নিচে নামবে। এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে পরিচলন।

পৃথিবীর গভীরের প্রচণ্ড তাপে এভাবে আধা লিকুইড অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার ভেতর থেকে উঠে এসে ওপরে দ্বীপের মতো ভাসমান সলিড লিথোস্ফিয়ারকে ধাক্কা দেয়। প্লেটগুলো নড়ে। দুই প্লেটের মাঝামাঝি জায়গায় লিথোস্ফিয়ার খুবই পাতলা থাকে। নিচের অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের ওপর চাপ খুব কমে যায় সেখানে। প্রচণ্ড চাপে আটকে রাখা গ্যাস সিলিন্ডারের চাপ কমে গেলে যা হওয়ার তা-ই হয়।

চাপ কমে গিয়ে নিচের আলকাতরার মতো আধা কঠিন শিলা প্রচণ্ড তাপে গলে তরল হয়ে যায়। আয়তনে বাড়ে। তখন তার নাম হয় ম্যাগমা। ওপরের দুর্বল ক্রাস্ট অনেক সময় এই ম্যাগমার চাপ সহ্য করতে পারে না। ফেটে যায়। আর সেই ফাটল দিয়ে গলগল করে বের হয়ে আসে ভেতরের ম্যাগমা। আমরা তখন এর নাম দিই লাভা। প্রচণ্ড চাপে গলগল করে বের হয়ে আসে লাভা, উঠে আসে

বিষাক্ত গ্যাস, জ্বালিয়ে দেয় শহর, বন্দর, বনভূমি।
বহু সভ্যতা এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।
দুইটা প্লেটের মাঝামাঝি জায়গায় মাঝে মাঝেই
লাইন করে অনেক অনেক আগ্নেয়গিরি থাকে।
প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে এরকম ৪০০০
কিলোমিটার লম্বা একটা জায়গা জুড়ে লাইন করে
অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে
রিং অভ ফায়ার।
একদিন আগ্নেয়গিরির ওপর আলাদা একটা
আর্টিকেল লেখার ইচ্ছা আছে।

৩.
ম্যান্টেলের গভীর থেকে উঠে আসা পরিচলনের
কারণে প্লেটগুলো নড়াচড়া করে। নড়াচড়ার জন্য
ভূমিকম্প হয়। মাটি কাঁপে থরথর করে।

যখন একটা প্লেট ভেঙে দুইটা হয়, মাঝখান থেকে
ম্যান্টেল উঠে আসার চেষ্টা করে। জন্ম হয়
আগ্নেয়গিরির।

আর যখন দুইটা প্লেট ধাক্কা লাগায়, একটা
আরেকটার ওপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আস্তে
আস্তে মাটি উঁচু হয়।
মাটি বছরে হয়তো এক ইঞ্চি, আধা ইঞ্চি করে বাড়ে।
ধরলাম এক সেন্টিমিটার। একশ বছরে হবে সেটা ১
মিটারের মতো। এক হাজার বছরে মাত্র দশ মিটার।
কিন্তু লক্ষ বছরে এই অতি ধীরে উঁচু হওয়া মাটি
শেষ পর্যন্ত হবে সুউচ্চ পর্বত। ইন্ডিয়ার প্লেট আর
ইউরেশিয়ান প্লেট একে অপরের ওপর দিয়ে যাওয়ার
চেষ্টা করার কারণে প্রতি বছর মাটি এভাবে একটু
একটু করে উঁচু হচ্ছে আর আরও লম্বা হচ্ছে
হিমালয় পর্বতমালা।

৪.
প্রতি বছর প্লেটগুলো একটু একটু করে নড়ছে। মাত্র
কয়েক ইঞ্চি বছরে। কিন্তু বহু কোটি বছরের
ব্যবধানে এই নড়াচড়া বিশাল হবে। আজ যেখানে
সমুদ্র, সেখানে দেখা যাবে মাটি। এখন মাটির
জায়গাটায় দেখা যাবে সমুদ্র।

আমরা যদি পৃথিবীর ম্যাপটা খেয়াল করে দেখার
চেষ্টা করি, দক্ষিণ আমেরিকার বাউন্ডারি খুব
চমৎকারভাবে খাপে খাপে বসে যায় আফ্রিকার
সীমানার সাথে। এমনকি এই দুই মহাদেশের
সীমানায় পাওয়া ফসিলগুলোও এক রকম। জিগস
পাজেলের মতো প্রতিটা মহাদেশ এভাবে একে
অপরের সাথে জোড়া দেওয়া যায়।
এর মানে হচ্ছে বহু, বহুদিন আগে, সাড়ে সতেরো
কোটি বছরেরও বেশি আগে আজকের সব মহাদেশ
একসাথে ছিল। সেই মহাদেশের নাম ছিল প্যাঞ্জিয়া,
বাংলা অর্থ পুরো পৃথিবী। তাকে ঘিরে ছিল বিশাল
বড়ো মহাসমুদ্র প্যান্থালাসা !
৫.
প্লেটগুলো নড়ছে। কেউ কারো থেকে দূরে, কেউ
কারো দিকে। এভাবে আগাতে থাকলে আজ থেকে
৩০ কোটি বছর পর আবার পুরো পৃথিবী একসাথে
হবে। তখন সেই বিশাল মহাদেশের নাম হবে
প্যাঞ্জিয়া প্রক্সিমা।

এই যে আমরা সবাই মিলেমিশে একসাথে হয়েছি,
এই দৃশ্য দেখার জন্য কোনো মানুষ হয়তো সেদিনের
পৃথিবীতে থাকবে না।

৯৩ থেকে ২০৪ মিটার গভীরতায় বাস করে Killer Whale (শিকারি তিমি)। সাদা-কালো মিশ্রণের দানবীয় আকারের প্রাণীর সামনে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

মারিয়ানার স্নেইলফিশ

শাহরিয়ার হোসেন দিসান

হাতে একমুঠো পানি নিয়ে যখন চোখে-মুখে দিই বা স্কুলে বন্ধুদের ওপর মজার ছলে পানি ছিটিয়ে দিই তখনও কি ভাবা যায় যে এই পানির সাথেই জড়িয়ে রয়েছে কত রকমের অদ্ভুত সব রহস্য ! না জানি সমুদ্রের তলদেশে গড়ে উঠেছে কত অজানা মাছের সংসার ! আমাদের নিত্য দেখা মাছেদের থেকে ভিন্ন হয়ে সেখানে হয়তো বাস করছে অদ্ভুত অদ্ভুত মাছের দল… না জানি কত গভীরতায় শেষ হয়েছে মাছেদের সংসার !

পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর সামুদ্রিক খাত বলা হয় মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (Mariana Trench) বা মারিয়ানা খাতকে। এটি মারিয়ানা দ্বীপ (Mariana Island) থেকে ২০০ কি.মি. পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। এর গভীরতা ধরা হয় ১১,০৩৪ মিটার (৩৬,২০১ ফিট)। এখানেও বাস করছে অনেক প্রজাতির মাছ। তাদেরই একটি প্রজাতি হলো মারিয়ানা স্নেইলফিশ (Mariana snailfish)।

রাজ্য(Kingdom) : Animalia

পর্ব (Phylum) : Chordata

শ্রেণি(Class) : Actinopterygii

বর্গ (Order) : Scorpaeniformes

গোত্র(Family) : Liparidae

গণ(Genus) : Pseudoliparis

প্রজাতি(Species) : P. swirei

মারিয়ানা স্নেইলফিশের বৈজ্ঞানিক নাম : *Pseudoliparis swirei.*

একে মারিয়ানা হ্যাডাল স্নেইলফিশও (Mariana Hadal Snailfish) বলা হয়, কারণ এটি হ্যাডাল জোনে (Hadal zone- ৬,০০০ থেকে ১১,০০০ মি.) থাকে।

এই মাছের সম্পর্কে বিশেষ কী এমন আছে যে এর সম্পর্কে জানতে হবে ?

মারিয়ানা স্নেইলফিশ সম্ভবত এই পর্যন্ত পাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গভীরতার মাছ যা ৭,৯৬৬ মিটার (২৬,১৩৫ ফিট) গভীরতায় ধরা হয়। বিভিন্ন আণবিক, শারীরবৃত্তীয় এবং জেনেটিক অভিযোজনের মাধ্যমে এই প্রজাতিটি এখানে টিকে রয়েছে।

প্রথম কীভাবে নামকরণ ও উদ্ভাবিত হয় মারিয়ানা স্নেইলফিশ ?

ফলকোর (Falkor) গবেষণা জাহাজের অভিযানের সময় প্রথম এই মাছের নমুনা ধরা পড়ে। ডিপ ওয়াটার বা গভীর জলের জন্য ডিজাইন করা জাল ব্যবহার করা হয় মারিয়ানা স্নেইলফিশ ধরার জন্য এবং আহরণ করার সময় ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য।

টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ম্যাকেরেল (Mackerel বিভিন্ন প্রজাতির পেলাজিক মাছের একটি সাধারণ নাম যার বেশিরভাগই Scombridae পরিবারের হয়)। হার্বার্ট সুইয়ার (Herbert Swire), 19 শতকের অভিযাত্রী, যিনি মারিয়ানা ট্রেঞ্চ আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই মাছের নাম দেওয়া হয় Pseudoliparis swirei.

এই প্রজাতির প্রথম নমুনা ধরা হয় ২০১৪ সালের ১৫ নভেম্বর এবং ২৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে গবেষণা জাহাজ Shinyo-maru কর্তৃক ধরা পড়ে এই প্রজাতির দ্বিতীয় নমুনা।

মারিয়ানা স্নেইলফিশের গভীরতা থেকে আরও বেশি গভীরতার মাছ কি আর কখনো ধরার দাবি ওঠেনি ?

অ্যাবিসোব্রোটুলা গ্যালাথিয়াকে (Abyssobrotula galatheae) মনে করা হতো সবচেয়ে বেশি গভীরতায় ধরা মাছ যা ধরা হয় ৮,৩৭০ মিটার গভীরতায়। কিন্তু সম্ভবত এই মাছটি ধরা হয়েছিল নন-ক্লোজিং জালের (ওপরের দিকে এবং নিচে গভীর পথে খোলা জালকে বলা হয় নন-ক্লোজিং জাল) মাধ্যমে। তাই সম্ভবত অগভীরভাবে ধরা পড়ে।

এছাড়াও ইকায়ডন নিউটিসকে (Echiodon neotes) ধরা হয়েছিল ৮,২০০ থেকে ৮,৩০০ মিটার গভীরতায়। কিন্তু এটি ছিল খোলা জলে, সমুদ্র তলদেশে নয়। সর্বশেষ একটি ৮,০০০ মিটারের বেশি গভীরতায় দেখা যায় ইথারিয়াল স্নেইলফিশ (ethereal snailfish)। কিন্তু এটি শুধু ছবিতেই দেখা যায় এবং রয়ে যায় বর্ণনাতীত।

মারিয়ানা স্নেইলফিশের শারীরিক গঠন কেমন?

মারিয়ানা স্নেইলফিশ দেখতে ব্যাঙাচির মতো, স্বচ্ছ। অবিচ্ছিন্ন ত্বক, পাতলা ও অসম্পূর্ণভাবে যুক্ত

হাড়, স্ফীত পেট রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ২৮.৮ সে.মি. (১১.৩ ইঞ্চি) এবং ভর ১৬০ গ্রাম (০.৩৫ পাউন্ড) পর্যন্ত হয়। মারিয়ানা স্নেইলফিশ ছোটো ছোটো ক্রাস্টেসিয়ান খেয়ে বেঁচে থাকে এবং তারা ১ সেন্টিমিটার (০.৪ ইঞ্চি) ব্যাসের তুলনামূলকভাবে বড়ো ডিম দেয়। ফাইলোজেনেটিক (Phylogenetic) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ২০ মিলিয়ন বছর আগে সমুদ্র তলদেশের প্রজাতি থেকে এটি আলাদা হয়ে যায় এবং অনেক জিনগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।

হ্যাডাল জোনে তারা কীভাবে থাকে?

হ্যাডাল জোন প্রায় (৬,০০০-১১,০০০ মি.) হলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিকূল স্থানের মধ্যে একটি। কারণ সেখানে রয়েছে উচ্চ হাইড্রোস্টেটিক চাপ, অন্ধকার, সীমিত খাদ্য, নিম্ন তাপমাত্রা।

অন্ধকার পরিবেশে বাস করার ফলে হ্যাডাল স্নেইলফিশের কিছু ফটোরিসেপ্টর (Photoreceptor) জিন হারিয়ে গেছে, যার ফলাফল হলো আলোতে মোটেই ভালো করে দেখতে না পাওয়া। মারিয়ানা স্নেইলফিশে বিভিন্ন ধরনের জিন পাওয়া গেছে যা তাদের কোষের মেমব্রেনগুলোকে আরও তরল করে দেয় যা তাদের এত চাপেও কোষ কার্যক্রম চালাতে সাহায্য করে থাকে।

আচ্ছা, সবই বুঝলাম কিন্তু তারপরও অনেকেরই একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। এত গভীরে প্রচণ্ড চাপে তারা কীভাবে থাকে? মারিয়ানা স্নেইলফিশ তাদের নরম কঙ্কাল ও আংশিকভাবে খোলা মাথার খুলি ব্যবহার করে থাকে প্রচণ্ড চাপে বেঁচে থাকার জন্য। আর তাদের কোনো বায়ুথলি বা অন্যান্য থলি থাকে না, ফলে প্রচণ্ড চাপেও তাদের কিছু হয় না। একটি স্নেইলফিশের মাথার ওপর ১৬০০ টি হাতি দাঁড়িয়ে থাকলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার সমপরিমাণ চাপ তারা সহ্য করতে পারে।

মারিয়ানা স্নেইলফিশের মতো আরও অনেক অনেক কিছুই হয়তো রয়ে গেছে সেই গভীরতায়, উদ্ভাবনের অপেক্ষায়...

১০৪ থেকে ১২৩ মিটারের মধ্যে দেখলাম পানপাতা আকৃতির এক মাছকে, যাকে বলা হয় Pelagic Stingray (সামুদ্রিক স্টিংরে)। এর লেজের শেষভাগে কিন্তু সুচালো কাঁটা আছে। এখনো অস্পষ্ট সূর্যের আলো সমুদ্রে দেখা যাচ্ছে।

সমুদ্রতলে বুদ্ধিমত্তার খোঁজে

আসিফ আফতাব সোহাগ

সমুদ্রের প্রাণীদের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধিমান ? অক্টোপাস না কি ডলফিন ? না কি অন্য কেউ ?

এই প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে এদের কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নেওয়া যাক যা তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তুলে ধরে।

অক্টোপাস এবং ডলফিন উভয়ই সামুদ্রিক প্রাণী। তবে কোনোটাই মাছ নয়। অক্টোপাস মলাস্কা পর্বের সেফালোপোডা শ্রেণীর প্রাণী আর ডলফিন কর্ডাটা পর্বের ম্যামাল শ্রেণীর প্রাণী। অর্থাৎ মানুষ আর ডলফিন একই শ্রেণিভুক্ত। তবে ধরে নিচ্ছি, বুদ্ধিমান প্রাণীর শ্রেণিভুক্ত হওয়া বুদ্ধিমান হওয়ার কোনো শর্ত নয়।

'যত বড়ো ব্রেইন, তত বেশি বুদ্ধি'—এই লাইনটি সঠিক ধরে নিলে স্পার্ম হোয়েল এবং হাতি বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাতারে সবচেয়ে ওপরে থাকবে। ডলফিন থাকবে মানুষেরও ওপরের কাতারে। কিন্তু ব্রেইনটা তার দেহের তুলনায় কতটুকু এবং তা কতটা উন্নত সেটাই দেখবার বিষয়। মানুষের মস্তিষ্কের ওজন গড়ে ২.৯৮ পাউন্ড। এটা তার দেহের ওজনের প্রায় দুই শতাংশ। আর ডলফিনের মস্তিষ্কের ওজন গড়ে ৩.৫ পাউন্ড। এটা তার দেহের ওজনের ০.৯ শতাংশ। শিম্পাঞ্জির ব্রেইনের ওজন গড়ে ০.৮৫ পাউন্ড এবং এটি তার দেহের ওজনের ০.৯ শতাংশ। মানুষের পর স্থলভাগে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হলো শিম্পাঞ্জি। সেই হিসেবে সমুদ্রের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে ডলফিনকে ধরে নেওয়া যায়।

অপরদিকে, অক্টোপাসদের জটিল মেমোরি ক্ষমতা আছে। তাদের একেক প্রজাতির একেক রকম শরীর এবং ব্রেইনের আকার গড় হিসাবকে দ্বিধায় ফেলে দেয়। জায়ান্ট প্যাসিফিক অক্টোপাসের রয়েছে তিনটা হার্ট, নয়টা ব্রেইন এবং নীল রক্ত। তবে

অক্টোপাস যেসব জায়গা সম্প্রতি পরিদর্শন করেছে, সেগুলো সম্পর্কে এবং পরিচিত খাদ্যের অবস্থানগুলোর তথ্যও মনে করতে পারে। অক্টোপাস অন্য প্রাণীদের চেনার ক্ষেত্রেও এ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে নিউজিল্যান্ডের জাতীয় অ্যাকুয়েরিয়ম থেকে একটি অক্টোপাস পালিয়ে যায়। রাতের বেলা তার ট্যাঙ্কের ঢাকনা আধখোলা অবস্থায় ছিল। এর সুযোগ নিয়ে সে বের হয়ে যায়। এরপর একটি ঘর পার হয়ে ড্রেনে পড়ে। সবশেষে ৫০ মিটার পাইপ বেয়ে নিচের খোলা সমুদ্রে চলে যায়। মুক্তির জন্য তার এ সফল অভিযান প্রমাণ করে যে অক্টোপাসরা সমুদ্রতলের অন্যতম বুদ্ধিমান প্রাণী।

ডলফিন শব্দ তৈরি করতে পারে। একে ক্লিক সাউন্ড বলে। গভীর সমুদ্রে কাদাযুক্ত স্থানে, যেখানে খুব অন্ধকার সেখানে ডলফিন এই সাউন্ড সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি শুনে অনুমান করতে পারে তার সামনে কোন বাধা আছে কি নেই। কিছু কিছু ডলফিনের প্রজাতি সুর করে গান করতে পারে যা স্তন্যপায়ীদের মধ্যে খুবই দুর্লভ। সামাজিক সেতুবন্ধনের অংশ হিসেবে সামুদ্রিক এ স্তন্যপায়ী প্রাণী তাদের মধ্যে কে শত্রু আর কে মিত্র—তা শনাক্ত করতে নিজেরা স্বতন্ত্র নাম ব্যবহার করে থাকে। ডলফিন টিক টিক ও কট কট আওয়াজ করে সেই প্রতিধ্বনিনির্ভর শনাক্তকরণের ওপর ভিত্তি করে সে আশেপাশের বস্তুসমূহের আকার, অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিখুঁত তথ্যাদি সংগ্রহ করে। ডলফিনের দুটি দল যখন মুখোমুখি হয়, তখন তারা শিস দিয়ে থাকে। এ শিসধ্বনির সাহায্যে তারা জানতে পারে কে উপস্থিত হলো আর কে হলো না।

আবার, পারস্পরিক তথ্যাদি বিনিময় করা এবং শিকারি প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচতে কালি ছুড়ে মারা, ছদ্মবেশ ধরা বা রং পাল্টানো এবং ভীতি প্রদর্শন করা, আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত পালানো ও লুকিয়ে পড়ার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে অক্টোপাসের। অক্টোপাসের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে এখনো গবেষকেরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারেননি।

প্রবালপ্রাচীরের চেয়েও অক্টোপাস শিকারি হিসেবে বেশি বুদ্ধিমান এবং বিপুল খাদ্য সঞ্চয়ে সক্ষম। নানারকম জটিল ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশে অবিকল মাপের গর্ত তৈরি করে এর মধ্যে আশ্রয় নিতেও

সক্ষম। অক্টোপাসরা যা চায়, তা পাওয়ার সেরা উপায় খুঁজে বের করতে শুদ্ধকরণ জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। তারা সমস্যার সমাধান ও একটি লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন কৌশল তৈরি করে নিতে সক্ষম। অক্টোপাসদের রয়েছে ননভার্টিব্রেটদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ব্রেইন। এদের ব্রেইনের একটা অংশ আবার শেখার জন্যও অনুগত। এরা অ্যাকুয়েরিয়মের লাইট অন/অফ করতে পারে এবং অ্যাকুয়েরিয়ামের ভেতর এদের বিভিন্ন খেলনা/পাজেল দিয়ে খেলা করতেও দেখা যায়। তবে কিছু প্রজাতির অক্টোপাস আবার ডলফিনের খাবারও বটে।

ডলফিনরা খুব কেয়ারিং। যখন কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় সে সাহায্যের আবেদন করে ডাক দেয়। তার এই ডাক যারাই শুনতে পায় তারাই ছুটে আসে সাহায্য করার জন্য। যখন কোনো ডলফিন আহত হয় বা অসুস্থ হয় তখন সঙ্গীরা তাকে ভেসে থাকতে সহায়তা করে যাতে সে ডুবে না যায়। এরা প্রবালের টুকরো দিয়ে ক্যাচ ক্যাচও খেলে। গবেষণায় দেখা গেছে ডলফিন আয়নায় নিজেকে চিনতে পারে এবং এমনকি এ প্রাণীটি ক্ষোভে-দুঃখে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে বানরের মতো এরাও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে। এমনকি সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে বয়স্ক ডলফিন থেকে বাচ্চা ডলফিন জ্ঞান আহরণ করতে পারে, ঠিক যেমনটা মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

তো, সমুদ্রের তলদেশে বুদ্ধির রাজা কে?

আপাতত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর স্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চের ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’। গভীরতা ১১,০৩৪ মিটার (৩৬,২০১ফুট)। হিমালয় পর্বতকে (২৯,০২৮ ফুট) অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যাবে এখানে। গবেষণায় দেখা গেছে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পানির চাপ প্রায় ৮ টন। পানির অতিরিক্ত চাপের কারণে এখানে সাধারণ সাবমেরিন চলতে পারে না। সুবিশাল গভীর সমুদ্রে কত জাতের, কত বর্ণের, কত আকারের কত রকম প্রাণী যে বিদ্যমান তার সম্পূর্ণটা এখনো মানুষ জানতে পারেনি। হতে পারে সেইসব প্রাণীর কেউ কেউ ডলফিন বা অক্টোপাসের থেকেও বুদ্ধিমান। তবে এখন পর্যন্ত জানা প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা করে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা প্রকাশ করে যে ডলফিনই সামুদ্রিক জীবদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। কিন্তু এ নিয়ে অনেক বিতর্কও আছে।

লায়ন ফিশ

লিটন মির্জা

নীল সাগরের সৌন্দর্য আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে অজস্র প্রাণিকুল। কিন্তু এদের সম্পর্কে কতটুকু জানি আমরা ! চলুন জেনে নিই 'লায়ন ফিশ' সম্পর্কে। লায়ন ফিশ লম্বায় প্রায় ১২ থেকে ১৫ ইঞ্চি হয়। ১২৩ মিটার থেকে ১৩৭ মিটার পর্যন্ত এদের দেখা মেলে।

এদের বৈজ্ঞানিক নাম Pterois । এরা অত্যন্ত বিষাক্ত হয়। ১৮টি বিষাক্ত কাঁটা এবং সিংহের কেশরের মতো পাখনা বিশিষ্ট এ সামুদ্রিক মাছটিকে দেখতে সিংহের মতো মনে হওয়ায় এর এরকম নাম হয়েছে। সমুদ্র তলদেশে অভিযানে যেয়ে যদি ভুলেও এই মাছের সাথে দেহের একটু ছোঁয়া লাগে তবে শুরু হয়ে যাবে শ্বাসকষ্ট। তাই খুব সাবধান থাকতে হয় ডুবুরি এবং শৌখিন সাঁতারুদের।

লায়ন ফিশ লাল, কালো, সাদা এবং বাদামি রঙের হয়। গায়ে রয়েছে জেব্রার মতো ডোরাকাটা দাগ। এদের মূল আবাস পশ্চিম অ্যাটলান্টিক, ইন্দো প্যাসিফিক, গালফ অভ মেক্সিকো এবং ক্যারিবিয়ান সাগরে। বঙ্গোপসাগরেও দেখা পাওয়া যায় এদের। মূলত উষ্ণ অঞ্চলগুলোতে পাথর এবং কোরাল রিফের আড়ালে এরা বাস করে।

এলাকাভেদে লায়ন ফিশের নানা ধরনের নাম রয়েছে–টার্কি ফিশ, ড্রাগন ফিশ, স্কর্পিয়ন ফিশ, ইত্যাদি। এদের দেহের উপরিভাগ বিষাক্ত হলেও ভেতরের অংশ বিষাক্ত নয়। তাই পৃথিবীর নানা দেশে লায়ন ফিশদের খাওয়া হয়। অনেক দেশে এদেরকে বাড়িতে পালা হয় অ্যাকুরিয়ামের মধ্যে।

সামুদ্রিক প্রাণ বিলুপ্তির এ কঠিন সময়ে লায়ন ফিশের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এদের মূল আবাস যেহেতু সামুদ্রিক রিফ এবং পাথুরে এলাকায়, তাই বিভিন্ন বিরল প্রজাতির মাছ এবং প্রাণী এদের খাদ্যে পরিণত হবার কারণে দিন দিন হুমকির মুখে পড়ছে। বিচিত্র কারণে এরা বিরল প্রজাতিকেই খাবার হিসেবে বেছে নেয় !

গালফ অভ মেক্সিকোর তীরে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য, ফ্লোরিডাতে রীতিমত সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারণা করা হয় দেখামাত্র লায়ন ফিশ নিধনের জন্য ! মানুষের মধ্যে লায়ন ফিশ খাওয়ার ব্যাপারে সচেতনতা ও

আগ্রহ তৈরি করার জন্য ফ্লোরিডাতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক সংগঠন। "Lionfish Removal and Awareness Day" নামে দিবস পর্যন্ত উদযাপন করা হয় এখানে ! গালফ অভ মেক্সিকোর তীরবর্তী জনগণ এদিন মেতে উঠেন লায়ন ফিশ হত্যার এক অন্যরকম প্রতিযোগিতায়। আন্তর্জাতিক মা দিবসের পরবর্তী প্রথম শনিবারে দিবসটি উদযাপন করা হয়।
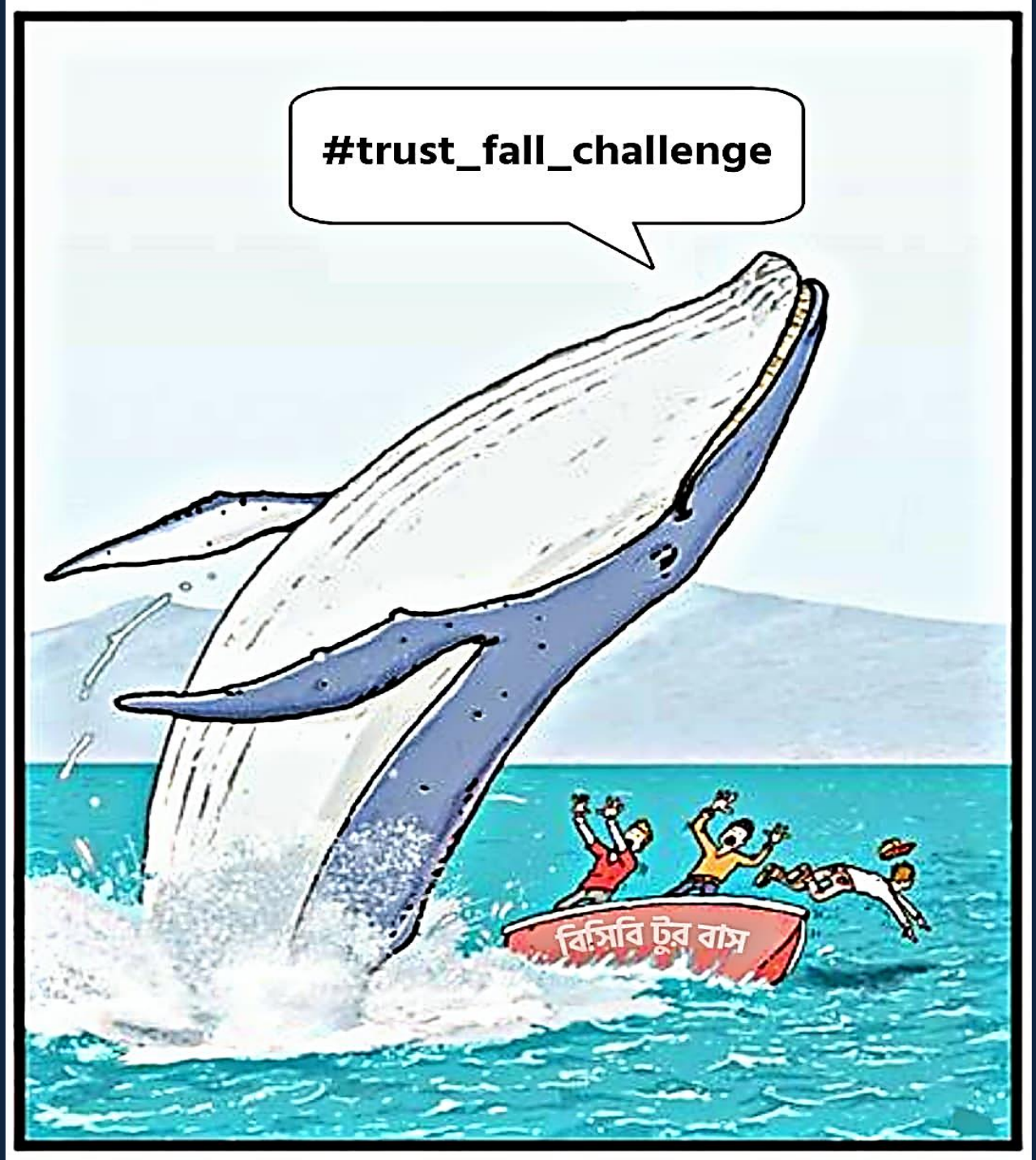
বিক্রিয়ার ক্রম

স্বপ্নীল আচার্য্য

বিক্রিয়ার ক্রম কী জিনিস ? বিক্রিয়ার ক্রম বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার একটা সম্পর্ক প্রকাশ করে। প্রথমে আসি বিক্রিয়ার হারে। বিক্রিয়ার হার হলো, সময়ের সাথে বিক্রিয়ক বা উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন। মানে,বিক্রিয়ক বা উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তনের হার। এটা নিয়ে খুব বেশি ডিপে যাচ্ছি না। যে-কোনো কেমিস্ট্রি বইতে বিস্তারিত আছে। ধরি,একটা বিক্রিয়া-

$$aA+bB \rightarrow cC+dD$$
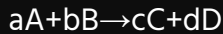
তাহলে, এখান থেকে বিক্রিয়ার হারের রাশিমালা লিখতে পারি। বিক্রিয়ার হার,

$r=-1/a\ dA/dt$

$=-1/b\ dB/dt$

$= 1/c\ dC/dt$

$= 1/d\ dD/dt$

এখানে, dA, dB, dC, dD হলো সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ক বা উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন। dt হলো সময়ের পরিবর্তন। বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে যেহেতু ঘনমাত্রা কমে তাই পরিবর্তনটা নেগেটিভ। তাই আগে মাইনাস চিহ্ন। এখন একটু এক্সপেরিমেন্টাল ড্যাটা নিয়ে কাজ করি। এখন থেকে প্রতিক্ষেত্রেই আমরা বিক্রিয়ক নিয়েই কাজ করব, উৎপাদ নিয়ে নয়।

ধরি, একটা বিক্রিয়া-

এই বিক্রিয়াটা ফলো করে নিচের ছকে ড্যাটা: বসাব। আমরা ধরে নিয়েছি এখানে HCOOH এর পরিমাণ অনেক বেশি। তাই সেটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট। আমরা তাই Br2 নিয়ে কাজ করব।

Time(s)	[Br2] (M)	Rate (M/s)	K=rate/[Br2]
0	0.012	4.2×10^-5	3.50×10^-3
50	0.0101	3.52×10^-5	3.49×10^-3
100	0.00846	2.96×10^-5	3.50×10^-3
150	0.0071	2.49×10^-5	3.51×10^-3
200	0.00596	2.09×10^-5	3.51×10^-3
250	0.005	1.75×10^-5	3.50×10^-3
300	0.0042	1.48×10^-5	3.52×10^-3
350	0.00353	1.23×10^-5	3.48×10^-3
400	0.00296	1.04×10^-5	3.51×10^-3

এখানে, সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়ার ঘনমাত্রা কমছে, সেই সাথে বিক্রিয়ার হারও। এখন যদি একটা Rate vs Br2 গ্রাফ আঁকি, তাহলে একটা সরলরেখা পাওয়া যাবে।
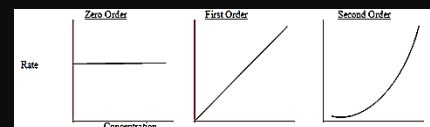
এই বিক্রিয়াটি First Order Reaction তাই দ্বিতীয় গ্রাফটা পাওয়া যাবে। এই Order নিয়েই কথা হবে। আপাতত মেনে নিই। আমরা শেষ থেকে ড্যাটা প্লট

করলাম, ফলে দ্বিতীয় গ্রাফটা পেলাম। তাই, এখান থেকে আমরা বলতে পারি, বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক।

এখান থেকে, **Rate=KBr2**

এই K কে বলে হার বা বেগ ধ্রুবক। এটার ডেফিনিশনটা এমন—বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা 1 হলে সেই বিক্রিয়ার হারকে হার ধ্রুবক বলে। এক্সপেরিমেন্টাল ড্যাটা থেকে দেখা যায় এটার মান প্রায় কন্সট্যান্ট।
তার মানে, এই বিক্রিয়ায় দেখা যায় বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বিক্রিয়ার হারের এক ঘাতের সমানুপাতিক।

Rate=KBr2^1

কিন্তু এমনটা নয় যে প্রতিক্ষেত্রেই একঘাতের সমানুপাতিক হবে। এইযে ঘাত 1, এইটাকেই কোনো বিক্রিয়ার ক্রম বলে। তার মানে, ওপরের বিক্রিয়াটি 1 ক্রমের বা First Order Reaction ধরি।

aA+bB→cC+dD
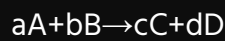
আমরা এরকম লিখতে পারি, কোনো বিক্রিয়ার জন্য, **Rate=KA^x B^y**
এখানে, x ও y কিন্তু মোটেও A আর B এর মোলসংখ্যা না। এটা হচ্ছে কনসেনট্রেশান পরিবর্তন এর সাথে বিক্রিয়ার হার কত ঘাতে পরিবর্তন হয় সেটার একটা মান। x হলো A এর সাপেক্ষে বিক্রিয়ার ক্রম। y হলো B এর সাপেক্ষে বিক্রিয়ার ক্রম। আল্টিমেটলি (x+y) হলো সম্পূর্ণভাবে বিক্রিয়ার ক্রম। আরেকটু ক্লিয়ারলি বলি, সেজন্য আরেকটা কেইস দেখি—

2NO(g)+2H2(g)→(1280°C) N2(g)+2H2O
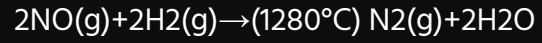
এটার জন্য তিনটা ভিন্ন মোলারিটিতে এক্সপেরিমেন্ট করে এক্সপেরিমেন্টাল ড্যাটা প্লট করি।

Experiment No	[NO] (M)	[H2] (M)	Initial Rate (M/s)
1	5×10^-3	2×10^-3	1.3×10^-5
2	10×10^-3	2×10^-3	5×10^-5
3	10×10^-3	4×10^-3	10×10^-5

এখানে থেকে,
r=KNO^x H2^y

এখন, x আর y এর মান বের করতে হবে। আমি করে দেবো না কিন্তু প্রসেসটা বলে দেবো। প্রথম এক্সপেরিমেন্ট এর জন্য একটা রেট ইকুয়েশন বানানো যাবে, একইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এক্সপেরিমেন্টের জন্য। এরপর দ্বিতীয়টাকে প্রথমটা দিয়ে ভাগ দেবেন এবং তৃতীয়টাকে দ্বিতীয়টা দিয়ে ভাগ দেবেন। যদি ঠিকঠাক অঙ্ক করতে পারেন, তাহলে পাবেন—
x=2
y=1
তার মানে, বিক্রিয়াটা NO এর সাপেক্ষে দ্বিতীয় ক্রমের।
Rate α NO^2
এর মানেটা আশা করি ক্লিয়ার। আমরা যদি বিক্রিয়ার ইনিশিয়াল NO এর ঘনমাত্রাকে 2 গুণ করি তাহলে বিক্রিয়ার হার 4 গুণ হবে। আবার,

বিক্রিয়াটা H_2 এর সাপেক্ষে 1 ক্রমের। টোটালি তৃতীয় ক্রমের। H_2 বাদ দিয়ে শুধু
NO নিয়ে চিন্তা করলে Rate vs Concentration এর তৃতীয় গ্রাফটা পাবো। কারণ, NO এর সাপেক্ষে বিক্রিয়া দ্বিতীয় ক্রমের।

আশা করি ক্রম ব্যাপারটা ক্রম ব্যাপারটা ক্লিয়ার।
এখন আসি শূন্য ক্রমের বিক্রিয়ায়।
ধরি, $A \rightarrow B$
বিক্রিয়াটা শূন্য ক্রমের হলে আমরা লিখতে পারি,
$Rate=KA^0=K$

তার মানে, বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়ার ঘনমাত্রা থেকে স্বাধীন। ঘনমাত্রা যতই বাড়াই বিক্রিয়ার হার থাকে একটা কনস্ট্যান্ট। এখান থেকে ড্যাটা প্লট করলে পাব Rate vs Concentration এর প্রথম গ্রাফটা।

আশা করি শূন্য ক্রম, প্রথম ক্রম, দ্বিতীয় ক্রম একদম ক্লিয়ার। একইভাবে, এরপরের n তম ক্রমগুলোও বের করা যাবে।

খুব সহজেই এই বিক্রিয়ার ক্রমগুলো নির্ণয় করা যায় হার ধ্রুবকের একক দেখে দেখে।
$\mathbf{K=r/A^xB^y}$
আশা করি এককগুলো বের করতে পারবেন।
বিক্রিয়াটা শূন্য ক্রমের হলে হার ধ্রুবকের একক M/s
প্রথম ক্রমের হলে s^{-1},
দ্বিতীয় ক্রমের হলে $M^{-1}s^{-1}$,
n ক্রমের জন্য $M^{(1-n)}s^{-1}$,
M এর জায়গায় $molL^{-1}$ থাকতেও পারে।

অনেকক্ষণ জটিল আলোচনা হলো, এখন একটু রেস্ট নেন।
......
আবার শুরু করি। এখন আমরা শূন্য ক্রমের, প্রথম ক্রমের আর দ্বিতীয় ক্রমের জন্য যে-কোনো সময়ে ঘনমাত্রার সমীকরণ বের করব এবং সেগুলোর জন্য স্ট্রেট লাইন প্লট করার সমীকরণ বের করে ঢাল বের করব।

১ম কেইস (শূন্য ক্রমের বিক্রিয়া)

ধরি, $A \rightarrow B$
তাহলে বিক্রিয়ার হার, $r=-dA/dt$
আবার, হার সূত্র থেকে, $r=KA^0=K$
তাহলে,
$-dA/dt=K$
বা, $-dA=Kdt$
বা, $\int_{A0}^{A(t)} -dA=K\int_0^t dt$
বা, $A0-A(t)=Kt$
বা, $\mathbf{A(t)=A0-Kt}$

গ্রাফে প্লট করলে সুন্দর একটা $y=-mx+c$ সরলরেখা পাব, যার স্লোপ হবে -K ।
এখানে, $y \rightarrow A(t)$,
$c \rightarrow A0$
$x \rightarrow t$

ব্র্যাকেটের ভেতর ইন্টিগ্রেশনের লিমিট বসিয়েছি। A0 হলো আদি ঘনমাত্রা। A(t) হলো t সময় পরে ঘনমাত্রা

এখন, এই বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বের করি। মানে, যে পরিমাণ সময়ে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা অর্ধেক হবে।

$A0/2=A0-Kt'$
বা,**$t'=A0/2K$**
t' দিয়ে অর্ধায়ুকে ডিনোট করলাম।

তার মানে, যে-কোনো শূন্য ক্রমের বিক্রিয়ার জন্য যে-কোনো সময়ের ঘনমাত্রা, **$A(t)=A0-Kt$**
এবং অর্ধায়ু,, **$t'=A0/2K$**

২য় কেইস (প্রথম ক্রম বিক্রিয়া)

আগেরমতো,
$A \rightarrow B$

$Rate=-dA/dt=KA^1$
বা, $-dA/A=Kdt$
বা, $\int_{A0}^{A(t)} -dA/A^1=K \int_0^t dt$
বা, $\ln A0-\ln A(t)=Kt$
বা**, $\ln A(t)=\ln A0-Kt$.....(1)**
বা, **$\ln(A(t)/A0)=-Kt$....(2)**

1 নং সমীকরণটা গ্রাফে প্লট করলে একটা $y=-mx+c$ টাইপের সরলরেখা পাচ্ছি।

যেখানে, $y \rightarrow \ln A(t)$
$c \rightarrow \ln A0$
স্লোপ $-K$

আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ২নং সমীকরণ থেকে আরেকটু অঙ্ক করলে পাব,
$A(t)=A0e^{(-Kt)}$ জাস্ট লগারিদম থেকে সূচকে কনভার্ট করেছি

এটা দেখে কি কিছু মনে পড়ে ?

রাইট, এটা অনেকটা তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়সূত্রের মতো। যেটা ছিলো **$N(t)=N0e^{(-\lambda t)}$**
তার মানে, তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়াও প্রথম ক্রমের।

এখন প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার জন্য অর্ধায়ু বের করি।

$\ln A(t)=\ln A0-Kt$
বা, $\ln A0-\ln A0/2=Kt'$
বা, $\ln(A0/0.5A0)=Kt'$
বা**, $t'=\ln 2/k$**

তার মানে, যে-কোনো প্রথম ক্রমের বিক্রিয়ার জন্য যে-কোনো সময়ের ঘনমাত্রা, **$A(t)=A0e^{(-Kt)}$**
এবং অর্ধায়ু, **$t'=\ln 2/k$**

৩য় কেইস (দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া)
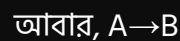
আবার, $A \rightarrow B$
$Rate=-dA/dt=KA^2$
বা, $-dA/A^2=Kdt$

এখন, আগের দুইবারের মতো সেইম লিমিট নিয়ে ইন্টিগ্রেশান করবেন এবং সমীকরণটা বের করবেন এবং অর্ধায়ু নির্ণয় করবেন। যদি ঠিকঠাক করতে পারেন তাহলে পাবেন,
যে-কোনো দ্বিতীয় ক্রমের বিক্রিয়ার জন্য যে-কোনো সময়ের ঘনমাত্রার সমীকরণ,
$1/A(t)=1/A0+Kt$
এবং অর্ধায়ু, **$t'=1/KA0$**

এখানেও কিন্তু $y=mx+c$ টাইপের সরলরেখা পাওয়া যাবে। এবার, ঢাল হবে $+K$
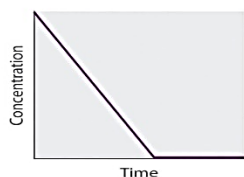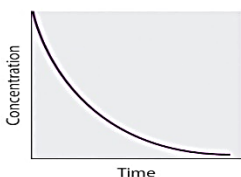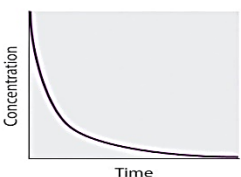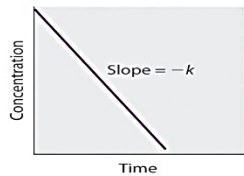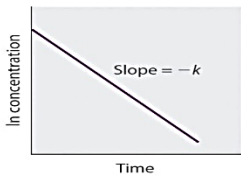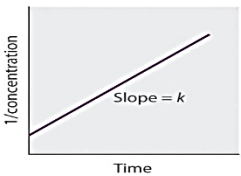
একই নিয়মে যে-কোনো ক্রম বিক্রিয়ার জন্য ঘনমাত্রা আর অর্ধায়ুর ইকুয়েশন বের করতে পারব।

আশা করিরেজাল্ট মিলেছে। এই অর্ধায়ুর ফর্মুলা থেকে আরেকটা মজার জিনিস বের করা যায়। সেটা হলো, কোনো বিক্রিয়া শেষ হবে কি না। উত্তর হলো, শুধু শূন্য ক্রমের বিক্রিয়া শেষ হবে, অন্য কোনো ক্রমের বিক্রিয়া শেষ হবে না। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে থাকুন। না পারলে কমেন্টে জানাতে পারেন।হোমওয়ার্ক রইল সেটা।

পুরো ব্যাপারটা একসাথে—

	Zeroth Order	First Order	Second Order
Differential rate law	Rate $= -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k$	Rate $= -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]$	Rate $= -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]^2$
Concentration vs. time	Concentration / Time	Concentration / Time	Concentration / Time
Integrated rate law	$[A] = [A]_0 - kt$	$[A] = [A]_0 e^{-kt}$ or $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$
Straight-line plot to determine rate constant	Concentration / Time; Slope $= -k$	ln concentration / Time; Slope $= -k$	1/concentration / Time; Slope $= k$
Relative rate vs. concentration	[A], M — Rate, M/s: 1 — 1; 2 — 1; 3 — 1	[A], M — Rate, M/s: 1 — 1; 2 — 2; 3 — 3	[A], M — Rate, M/s: 1 — 1; 2 — 4; 3 — 9
Half-life	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$
Units of k, rate constant	M/s	1/s	$M^{-1} \cdot s^{-1}$

জটিল একটা ব্যাপার সহজে ব্যাখা করার ট্রাই করলাম। কেউ যদি পড়ে থাকেন তাহলে ধন্যবাদ।

এতক্ষণে হয়তো ভাবছেন, ধুর মিয়া ! সমুদ্রে তো হাঙর-টাঙর থাকে, এসব কী? এই যে গাইজ, এসে গেছে আপনাদের হাঙর বা Bull Shark। ৯৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এই শার্কদের দেখা পাবেন।

৯৫৯ থেকে ৯৬৫। এই সাম্রাজ্যে বসবাস করে Green Sea Turtle বা (সবুজ কচ্ছপ)।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

প্রবাল

শান্ত হাসিব অভীক, প্রজেশ দত্ত

প্রবাল বা কোরাল রিফ কী জিনিস ?

কোরাল হলো অসংখ্য পলিপের সমাহার। পলিপ হলো নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণী। খুবই ক্ষুদ্র গঠনবিশিষ্ট সিলিন্ডার আকৃতির প্রাণী। পলিপ স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে আবার অসংখ্য পলিপ একসাথে থাকতে পারে। কোরাল রিফ বোঝার জন্য আমাদের পলিপের সব বৈশিষ্ট্য জানার প্রয়োজন নেই। পলিপের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এরা সমুদ্রের পানি থেকে ক্যালসিয়াম এবং কার্বোনেট আয়ন সংগ্রহ করে চুনাপাথরের স্কেলেটন তৈরি করে, ফলে এদের গঠন অত্যন্ত মজবুত হয়। হাজার হাজার পলিপ যখন তাদের ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের স্কেলেটন নিয়ে একত্রিত হয়, তখন একটা সলিড স্ট্রাকচার পাওয়া যায়; যার নাম কোরাল পলিপ। এই কোরাল পলিপই কোরাল রিফকে তার আকৃতি প্রদান করে। রিফ অর্থ ডুবোপাহাড়। কোরাল পলিপ স্থির, চলাচল করে না, আবার শক্ত গঠনের অধিকারী। তাই প্রায়শই এদের পাথর ভেবে অনেকেই ভুল করেন। আশা করি, আমরা আর সেই ভুল করব না।

এই আলোচনা থেকে আরেকটা প্রশ্ন উঠে আসে; কোরাল পলিপ যেহেতু প্রাণী এবং চলাফেলা করে না, তাহলে এরা প্রয়োজনীয় খাদ্য কীভাবে সংগ্রহ করে? এরা কী খায় ? কীভাবে খায় ?

প্রবাল তো উদ্ভিদও নয় যে এটা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারবে। আসলে কোরাল রিফ = কোরাল পলিপ + জুয়্যান্থেলাই শৈবাল। মিথোজীবীতা সম্পর্কে আমরা প্রায় সবাই জানি। অধিকাংশ প্রবালপ্রাচীর সৃষ্টিকারী প্রবালেরই জুয়্যানথেলাই নামক এক ধরণের শৈবালের সাথে মিথোজীবীতার সম্পর্ক থাকে। প্রবালকীট এসব শৈবালকে আশ্রয় দেয় ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড সরবরাহ করে, বিনিময়ে শৈবাল সূর্যালোক ব্যবহার করে উৎপাদিত শর্করা প্রবালকীটের দেহে সরবরাহ করে। এছাড়াও রাতের বেলায় প্রবালকীট কর্ষিকার (নিডারিয়া পর্বের বৈশিষ্ট্য) সাহায্যে আশেপাশের ভাসমান জুপ্লাঙ্কটনকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া বেশ মজার শোনালেও প্রবাল ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও ভাসমান ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, যেমন আমরা ক্ষতি হবে জেনেও জাঙ্ক ফুড খাই।

জোয়ার-ভাটা

প্রান্ত দাস

"আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা,

সমুদ্রের কপালে চাঁদ জোয়ার দিয়ে যা।।"

জোয়ার-ভাটা কী ?

যারা নদীর পাশে থাকে তাদের কাছে জোয়ার-ভাটা পরিচিত বিষয়। সকাল বিকেল রুটিন করে জলের উচ্চতা বাড়ে কমে। যখন জলের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণে জল নদীর তীরে উঠে আসে তখন সেটাকে বলি জোয়ার। আবার যখন জল তীরের নিচে চলে যায় তখন বলি নদীতে ভাটা পড়েছে।

একদিনে মানে ২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ পৃথিবীর এক আহ্নিক ঘূর্ণনকালে আমরা দুইবার জোয়ার দেখতে পাই আর দুইবার ভাটা। কেন দুইবার? একবার অথবা তিনবার নয় কেন? এর উত্তর সর্বশেষে।

জোয়ারের সময় জলের উচ্চতা কতটা হবে তা নির্ভর করে ওই অঞ্চলে জলের পরিমাণ কতটা। কারণ নির্দিষ্ট স্থানে জোয়ারের সোজা-সাপটা অর্থ হলো ওই স্থানে পার্শ্ববর্তী এলাকার তুলনায় অধিক জলের একত্রীকরণ। এবার অধিক জল থাকলেই তো অধিক জল একত্রিত হবে তাইনা ? তাই সমুদ্রে বেশি জল থাকার কারণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটায় জলের উচ্চতার তারতম্য নদী অপেক্ষা অনেক বেশি হয়।

জোয়ার-ভাটায় জলের উচ্চতা কমা আর বাড়া খুব একটা বেশি হয় না সব জায়গায়। যেমন : আপনার গ্রামের পাশের নদীতে। এবার বলি, কানাডার নোভা স্কোটিয়া শহরের 'বে অফ ফান্ডি'র কথা। এখানে জোয়ার-ভাটায় জলের উচ্চতার পার্থক্য সবচেয়ে বেশি হয়। জলের উচ্চতার তারতম্য প্রায় ৫৩ ফুটেরও অধিক হয়ে থাকে। ৫৩ ফুট ! বিষয়টা অনুভব করতে পারছেন? আপনি সকাল ৯০টায় বেড়াতে যাওয়ার সময় উপত্যকা দর্শন করে এলেন। আবার বিকেল বেলা গেলেন। গিয়ে দেখলেন সকালে ঠিক থাকলেও বিকেলে সেখানে রীতিমতো বন্যা হয়ে গেছে ! জলের উচ্চতা ৫০ ফুট বেড়ে গেছে ! পুরো সন্ধ্যা ভেবে কূল-কিনারা না পেয়ে শেষে রাত ৯০টায় আবার জলের কিনারা দেখতে গেলেন।

দেখলেন সেই সকালের মতো অবস্থা ! এই ৫০ ফুট উচ্চতার এত জল উধাও ! ভূতুড়ে এক অবস্থা ! ইংল্যান্ড আর ওয়েলসের মধ্যবর্তী এলাকার সেভার্ন এস্টুয়েরি আছে দ্বিতীয় অবস্থানে। সেখানে এই জোয়ার-ভাটায় জলের উচ্চতার পার্থক্য ৪৯ ফুট হয়ে থাকে।

জোয়ার-ভাটার ভূতটা কে ?

এই ভূতুড়ে কাহিনির ভূতকে মঞ্চে নিয়ে আসার বক্কর ভাই জাতীয় কাজটা অনেক আগেই করেছিলেন আমাদের প্রিয় নিউটন স্যার। ভূতটা আসলে গ্র্যাভিটি।

মহাবিশ্বের প্রতিটা বস্তুই অপর বস্তুকে আকর্ষণ করে। চাঁদ ও পৃথিবী একে অপরকে আকর্ষণ করে। আবার পৃথিবী সূর্যের সাথেও পরকীয়া করে। হ্যাঁ, সূর্য আবার অন্য কারো সাথে। পরকীয়া বিষয়টা মহাবিশ্বের কোনায় কোনায় বিদ্যমান। ধুৎ, মহাবিশ্বের কোনা আছে না কি ?

পৃথিবীর জোয়ার-ভাটাকে ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের শুধু পৃথিবীর সাথে চাঁদ ও সূর্যের সম্পর্ক বুঝলেই হবে। এখানে একটা কথা, চাঁদের আকর্ষণের কারণে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা যতটা হয় সূর্যের আকর্ষণের কারণে ততটা হয় না। পরকীয়ার জোর কম। সূর্যটা দূরে তো, সে কারণে। এতক্ষণে বোধহয় আমার উপর তীর ছোঁড়া শুরু করবেন কয়েকজন অল্পবয়স্ক নিউটনিয়ান। বলবেন, "দূরে হলেই-বা কী, পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যকার আকর্ষণ বল তো পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যকার আকর্ষণ বলের চেয়ে বেশি। তাহলে জোয়ার-ভাটায় সূর্যের অধিক প্রভাব থাকা উচিত। ভর আর দূরত্ব বসিয়ে ক্যালকুলেট করে নেন।"

$F= GMm/r^2$ থেকে,

সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যকার মাধ্যাকর্ষণ বল, F = 3.5573E21 N

চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যকার মাধ্যাকর্ষণ বল, F=19.86064E19 N

(E21 হচ্ছে 10 এর পাওয়ার 21 ; E19 হচ্ছে 10 এর পাওয়ার 19)

তাই তো !

এবার জবাবে খেলার মাঠে খেলতে নামছে জোয়ার-ভাটা বল বা Tidal Force । এই টাইডাল ফোর্সের কারণেই পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা হয়। আর টাইডাল ফোর্স দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক নয়; বরং দূরত্বের ঘনের ব্যস্তানুপাতিক। তাই পৃথিবী আর চাঁদের মাঝে সূর্যের তুলনায় দূরত্ব কম হওয়ায় ঘনের হিসেবে টাইডাল ফোর্স বেশি হয়।

টাইডাল ফোর্স কী ?

এতক্ষণ বললাম মাধ্যাকর্ষণের কারণে জোয়ার-ভাটা হয়, এখন আবার বলছি টাইডাল ফোর্সের কারণে ! আসলে এই জোয়ার-ভাটা বলটা আসে মাধ্যাকর্ষণ বল থেকেই। বিষয়টা বুঝিয়ে বলি।

পৃথিবী তো একটা বিন্দু নয়, বিশাল তার আয়তন। তাই চাঁদ যখন তাকে আকর্ষণ করে তখন পৃথিবীর

সম্পূর্ণ অংশটাকে একই বলে আকর্ষণ করতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ বল যে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক, এটা আমরা জানি। চাঁদের আর চাঁদের নিকটবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং দূরবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব ভিন্ন হবে। ভিন্নতার পার্থক্যটা হবে পৃথিবীর ব্যাসের সমান। তাই পৃথিবীর ভিন্ন পয়েন্টের জন্য চাঁদের ভিন্ন আকর্ষণ বল থাকবে। এটাই আসলে সিম্পলি টাইডাল ফোর্স। বলা যেতে পারে, টাইডাল ফোর্স হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ বলের সেই ভিন্নতা (ডিফারেন্স) যা কোনো বস্তুকে (এখানে পৃথিবী) প্রসারিত বা সংকুচিত করে। এজন্য একে ডিফারেন্সিয়াল বলও বলা হয়। আবার অনেকে বলেন, 'সেকেন্ডারি ইফেক্ট অভ গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড'।

ক্লিয়ার ?

-"না, ক্লিয়ার না। টাইডাল ফোর্স মাধ্যাকর্ষণ বলেরই রূপ হলে সেটা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক না হয়ে ঘনের ব্যস্তানুপাতিক হয় কী করে ?"

টাইডাল ফোর্স (জোয়ার-ভাটা বল) দূরত্বের ঘনের ব্যস্তানুপাতিক কীভাবে ?

চলুন, এটা $F=GMm/r^2$ ফর্মুলা থেকেই ক্যালকুলেট করে ফেলি। একটু গণিত তো লাগবে কিন্তু খুবই সোজা গণিত। সো, নো চাপ। ঠিক করে নজর দিলে বুঝতে সমস্যা হবে না। একেবারেই মাটির মানুষের মতো মাটির গণিত। এতদূর এলে এই জায়গাটা স্কিপ করা ঠিক হবে না। তাই এত কথা বলা। তবুও গণিতে এলার্জি থাকলে এবং প্রমাণ ছাড়া আপনার যদি টাইডাল ফোর্সে দূরত্বের ঘনের সম্পর্ক মেনে নিতে কষ্ট না হয় তাহলে এই অংশটা এড়িয়ে নিচে চলে যেতে পারেন।

সহজ করার জন্য আমরা টাইডাল ত্বরণ ক্যালকুলেট করব। বল হচ্ছে ত্বরণ আর ভরের গুণফল। তো, ত্বরণ বের করে জাস্ট ভর দিয়ে গুণ করার কাজ পরে করা যেতে পারে।

তো, পৃথিবীর নিকটবর্তী পৃষ্ঠে চাঁদের কারণে যে মাধ্যাকর্ষণিক ত্বরণ হবে তা হচ্ছে Gm/r^2 ; আর পৃথিবীর দূরবর্তী পৃষ্ঠে তা হবে $Gm/(r+d)^2$।

টাইডাল ফোর্স সম্পর্কে ওপরে যা জানলাম তা হচ্ছে কোনো বস্তুর ভিন্ন অংশের ওপর মাধ্যাকর্ষণ বলের পার্থক্যই টাইডাল ফোর্স।

তাহলে টাইডাল ত্বরণ (a) কী হবে ? এটা হবে মাধ্যাকর্ষণিক ত্বরণের পার্থক্য।

অর্থাৎ, $a = Gm/r^2 - Gm/(r+d)^2$

$= Gm\ [1/r^2 - 1/(r+d)^2]$ ....(1)

যেহেতু $d<<r$, এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যের দ্বিতীয় টার্মটাকে লেখা যায়,

$1/(r+d)^2 = 1/r^2 - 2d/r^3$

সমীকরণ (1) থেকে,

$a = Gm\ [\ 1/r^2 - 1/(r+d)^2\ ]$

$= Gm\ [\ 1/r^2 - 1/r^2 + 2d/r^3]$

$= Gm\ \ (2d/r^3)$

$a = 2Gdm/r^3$

এখানে,

a = টাইডাল ত্বরণ

G = গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট

d = পৃথিবীর ব্যাস।

m = চাঁদের কারণে টাইডাল ত্বরণ ক্যালকুলেট করার সময় চাঁদের ভর,

সূর্যের কারণে টাইডাল ত্বরণ ক্যালকুলেট করার সময় সূর্যের ভর।

r = চাঁদের কারণে টাইডাল ত্বরণ ক্যালকুলেট করার সময় চাঁদ আর চাঁদের নিকটবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠের দূরত্ব,

সূর্যের কারণে টাইডাল ত্বরণ ক্যালকুলেট করার সময় সূর্য আর সূর্যের নিকটবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠের দূরত্ব।

গাণিতিকভাবে পেয়ে গেলাম, টাইডাল ত্বরণ দূরত্বের ঘনের ব্যস্তানুপাতিক। এবার ওপরের টাইডাল ত্বরণের সূত্র থেকে পৃথিবীতে সূর্যের এবং চাঁদের প্রভাবে টাইডাল ত্বরণ নির্ণয় করা যায় যা যথাক্রমে 5.05E-7 m/s^2 ও 1.10E-6 m/s^2। দেখাই যাচ্ছে, পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যকার মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবী আর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বলের চেয়ে বেশি হলেও টাইডাল ফোর্স পৃথিবীতে চাঁদের কারণে বেশি অ্যাক্ট করছে। তাই জোয়ার-ভাটায় চাঁদের প্রভাব সূর্য অপেক্ষা অধিক। এজন্যই শুরুতে চাঁদের গান গাইলাম।

মাধ্যাকর্ষণের ফলে জোয়ার-ভাটা কীভাবে হয় ?

পৃথিবীর আকার ছোটো কোনো মারবেলের মতো তো আর না; বিশাল আকার। তাই চাঁদের কারণে চাঁদের নিকটবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণের যে প্রভাব তা দূরবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠের থেকে অধিক হয়। কারণ মাধ্যাকর্ষণ বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

জল পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকার কারণ পৃথিবী জলকে তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। এবার পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকা জলকে চাঁদমামাও তো টানছে ! আর যেহেতু পৃথিবীতে চাঁদের আকর্ষণ বল তার বাড়ির পাশে অধিক তাই পৃথিবীর জলকে চাঁদ তার নিকটবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে টেনে নিয়ে আসে।

পৃথিবী আহ্নিকগতিতে ঘুরছে, কিন্তু জলের উঁচু স্তর সবসময় থাকছে চন্দ্রমুখী। তাহলে দিনে একবার আমাদের জোয়ার দেখার কথা (ছবি:৪ অনুযায়ী)। কিন্তু বাস্তবে একই জায়গায় দিনে দুইবার জোয়ার আসে কীভাবে ?

চাঁদ জলের সাথে সাথে পৃথিবীর ভূখণ্ডটাকেও নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। (ছবি : ৫ দেখুন)

হ্যাঁ, অবশ্যই A পয়েন্টে যতটা আকর্ষণ করছে ততটা নয়। তাই পৃথিবীটা চাঁদের দিকে সরে এসেও জল যতটা চাঁদের দিকে সরেছে ততটা জায়গা কভার করতে পারে না। ফলস্বরূপ A পয়েন্টে তো জলের একটা উঁচু স্তর থেকেই যায়, সাথে সাথে A পয়েন্টের বিপরীত দিকে C পয়েন্টে জলের একটা

উঁচু স্তর তৈরি হয়ে যায়। খেয়াল করা উচিত, C পয়েন্টে জল কিন্তু A এর বিপরীতে সরে গিয়ে উঁচু স্তর তৈরি করেনি বরং পৃথিবীটাই A এর দিকে সরে এসেছে চাঁদের আকর্ষণে।

কিন্ত, C তে যে আকর্ষণ বল তা অবশ্যই B এবং A এর তুলনায় কম। ওই যে আকর্ষণ বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। তাই কঠিন পৃথিবী যতটা চাঁদের দিকে সরেছে পয়েন্ট C এর জল ততটা সরেনি। কিন্তু কিছুটা চেপে গেছে। কিন্তু উঁচু একটা স্তর রয়ে গেছে। তো সেদিকেও এখন জোয়ার। খেয়াল করার বিষয়, চাঁদের নিকটবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠের জোয়ারে জলের উচ্চতা তুলনামূলকভাবে চাঁদের দূরবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠের জোয়ারের জলের উচ্চতা থেকে অধিক হয়।

ভূপৃষ্ঠে মোট জলের পরিমান জোয়ার-ভাটায় কমে বা বাড়ে না। A এবং C তে জলের উঁচু স্তর তৈরি হওয়ার ফলে জলের আয়তন ঠিক রাখার স্বার্থে চাঁদ পৃথিবীর A এবং B কে আকর্ষণ করে যথাক্রমে চাঁদের দিকে এবং তার অপর দিকে জলের স্তরকে উঁচু করেছে। C পয়েন্টেও তো আবার চাঁদের আকর্ষণ বল কাজ করছে। (ছবি : ৬ দেখুন)

অপর দুই পাশে জলের উচ্চতা কমে যায়। আর এই জায়গাগুলোতেই ভাটা বিরাজ করে।

জোয়ার কখন সবচেয়ে বেশি হবে ?

যখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে সরলরৈখিক অবস্থায় থাকবে। সূর্যগ্রহনের সময়। তখন পৃথিবীর ওপর চাঁদের আর সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বল একই দিকে অ্যাক্ট করবে। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের যে অংশ থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে, সে স্থানে জলের উচ্চতা অন্য সাধারণ যে-কোনো দিনের চেয়ে অধিক হবে। অবশ্যই বিশাল জলরাশি থাকতে হবে সেখানে। পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের উচ্চতা বেড়েছে কি না পরীক্ষা করলে জোয়ারকে রীতিমতো অপমান করা হবে।

শেষ কথা: খুব প্রচলিত একটা প্রবাদের সাথেই জোয়ারে ভাসা এবার থামাই। "Time and Tide waits for none." কে এই কথার প্রবক্তা জানি না। যেই হোক, তার উদ্দেশে বলি-

সময় আলোর জন্য অপেক্ষা করে, আর জোয়ার চাঁদের জন্য।
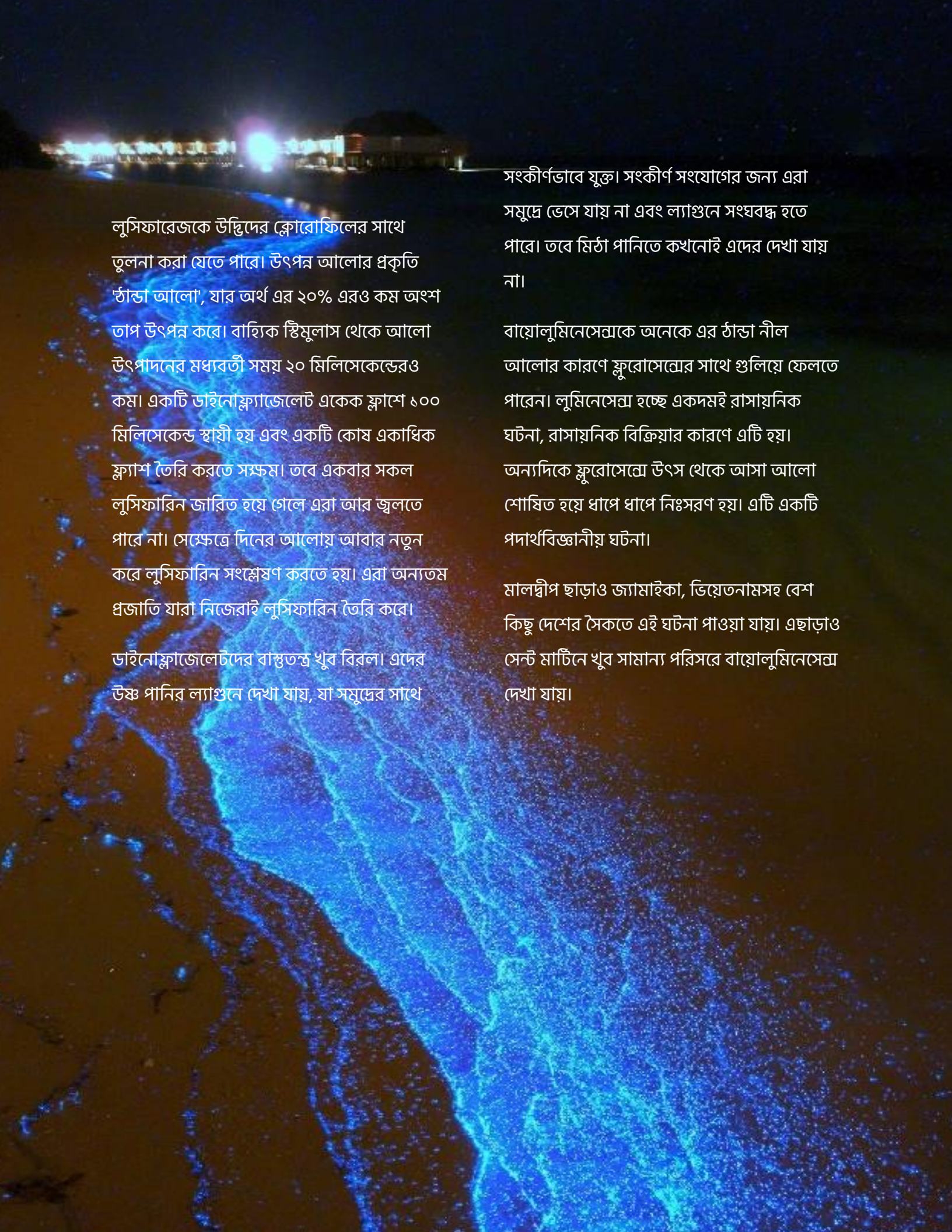
মালদ্বীপের জ্বলজ্বল সৈকত

এলিন রঞ্জন দাস

মালদ্বীপের অন্যতম ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন হচ্ছে এর গ্লোয়িং বিচ বা জ্বলজ্বল সৈকত। অসংখ্য দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত এই দ্বীপরাষ্ট্রের একটি দ্বীপ হচ্ছে মুদ্ধু দ্বীপ বা ভাধু দ্বীপ। মাত্র ৫০০ জনসংখ্যার এই দ্বীপটি রাতের বেলায় হয়ে উঠে মোহনীয়। মনে হয় যেন সমুদ্রে অসংখ্য নক্ষত্র চিকচিক করছে। এই মনোহর ঘটনার কারণ বায়োলুমিনেসেন্স।

বায়োলুমিনেসেন্স একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। যখন কোনো জীব থেকে লুমিনেসেন্ট পদার্থ (আলো ছড়ায় এমন পদার্থ) নিঃসরণ হয় তখন তাকে বায়োলুমিনেসেন্স বলে। ফাইটোপ্লাঙ্কটন নামে পরিচিত সামুদ্রিক অণুজীবের কারণে এটি ঘটে থাকে। তবে সব ফাইটোপ্লাঙ্কটন বায়োলুমিনেসেন্ট না। সবচেয়ে পরিচিত প্রজাতি হচ্ছে ডাইনোফ্ল্যাজেলেটস। এরা এককোষী জীব এবং দৈর্ঘ্য ৩০ মাইক্রন থেকে ১ মি.মি. হয়ে থাকে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মেরিন বায়োলজিস্ট উডল্যান্ড হেস্টিংস এক রিসেন্ট স্টাডিতে দেখান যে, ডাইনোফ্ল্যাজেলেটদের কোষ ঝিল্লিতে একধরনের বিশেষ চ্যানেল রয়েছে, যা বৈদ্যুতিক সিগন্যালের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়। এটি আসলে তাদের ডিফেন্স মেকানিজম। যখন কোনো শিকারি প্রাণী তাদেরকে খেতে আসে, উত্তেজিত হয়ে প্লাঙ্কটনগুলো আলো নিঃসরণ করে, যা ওই প্রাণীদেরকে আশেপাশের সেকেন্ডারি শিকারি প্রাণীদের শিকারে পরিণত করে। এছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণে বল প্রয়োগ হলে (কোনো প্রাণীর সাঁতার, ঢেউ এর ধাক্কা) এরা লুমিনেসেন্স করতে পারে।

ডাইনোফ্ল্যাজেলেটরা লুসিফারিন নামক রাসায়নিকের মাধ্যমে আলো সৃষ্টি করে। লুসিফারিন বিক্রিয়াতে সাবস্ট্রেট হিসেবে কাজ করে। জারিত অবস্থায় এর সাথে লুসিফারেজ এনজাইম বিক্রিয়া করে নীলাভ সবুজ আলোরূপে শক্তি এবং অক্সিলুসিফারিন নামক উপজাত তৈরি করে। এই

লুসিফারেজকে উদ্ভিদের ক্লোরোফিলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। উৎপন্ন আলোর প্রকৃতি 'ঠান্ডা আলো', যার অর্থ এর ২০% এরও কম অংশ তাপ উৎপন্ন করে। বাহ্যিক স্টিমুলাস থেকে আলো উৎপাদনের মধ্যবর্তী সময় ২০ মিলিসেকেন্ডেরও কম। একটি ডাইনোফ্ল্যাজেলেট একেক ফ্লাশে ১০০ মিলিসেকেন্ড স্থায়ী হয় এবং একটি কোষ একাধিক ফ্ল্যাশ তৈরি করতে সক্ষম। তবে একবার সকল লুসিফারিন জারিত হয়ে গেলে এরা আর জ্বলতে পারে না। সেক্ষেত্রে দিনের আলোয় আবার নতুন করে লুসিফারিন সংশ্লেষণ করতে হয়। এরা অন্যতম প্রজাতি যারা নিজেরাই লুসিফারিন তৈরি করে।

ডাইনোফ্লাজেলেটদের বাস্তুতন্ত্র খুব বিরল। এদের উষ্ণ পানির ল্যাগুনে দেখা যায়, যা সমুদ্রের সাথে সংকীর্ণভাবে যুক্ত। সংকীর্ণ সংযোগের জন্য এরা সমুদ্রে ভেসে যায় না এবং ল্যাগুনে সংঘবদ্ধ হতে পারে। তবে মিঠা পানিতে কখনোই এদের দেখা যায় না।

বায়োলুমিনেসেন্সকে অনেকে এর ঠান্ডা নীল আলোর কারণে ফ্লুরোসেন্সের সাথে গুলিয়ে ফেলতে পারেন। লুমিনেসেন্স হচ্ছে একদমই রাসায়নিক ঘটনা, রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে এটি হয়। অন্যদিকে ফ্লুরোসেন্সে উৎস থেকে আসা আলো শোষিত হয়ে ধাপে ধাপে নিঃসরণ হয়। এটি একটি পদার্থবিজ্ঞানীয় ঘটনা।

মালদ্বীপ ছাড়াও জ্যামাইকা, ভিয়েতনামসহ বেশ কিছু দেশের সৈকতে এই ঘটনা পাওয়া যায়। এছাড়াও সেন্ট মার্টিনে খুব সামান্য পরিসরে বায়োলুমিনেসেন্স দেখা যায়।

গভীর জলের প্রাণী

এস. এম. এম. সাইফুল্লাহ রিয়াদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশলের ছাত্র সাদ এবং সমুদ্রবিজ্ঞানের ছাত্র নিক্স রুমমেট। দুজনের জাতীয়তা, ধর্ম আলাদা হলেও বন্ধুত্ব খুব গভীর। এজন্য দুজনেই নিজস্ব বিষয়ের যাবতীয় মজার মজার তথ্য একে অপরের সাথে শেয়ার করে এবং দুজনে মিলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে যায়। কখনো সমুদ্রের আশেপাশে, কখনো-বা গহীন অরণ্যে। তবে এই আনন্দের পাশাপাশি দুজনের উদ্দেশ্যই এক। আর তা হচ্ছে এই ছাত্রজীবনেই গবেষণার জন্য বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করা। প্রতিবারের মতো এবারও সাদ এবং নিক্স মিলে নতুন অ্যাডভেঞ্চারে এসেছে। তবে এবারের গন্তব্য নির্দিষ্ট নয়। সাগরের বুক চিরে নির্দিষ্ট সময়ে যতদূর যাওয়া যায় তাই ওদের গন্তব্য। প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রের সাথে বড় আকারের একটা স্পিডবোট নিয়ে ওরা সেই বিকেলেই রওনা দিয়েছিল। এখন বাজে রাত ৯০টা। শুধু শুধু বোটের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে বসে থেকে থেকে দুজনেই বোর হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সাদের ইঙ্গিত পেয়ে নিক্স দ্রুত কম্পিউটারের সামনে উঠে আসে। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে কিছু অদ্ভুত আকৃতিযুক্ত মাছ ওদের বোটের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংখ্যাটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না, তবে এগুলোর একেকটির আকার একেকরকম। কোনোটা ছোটো, কোনোটা একটু বড়ো। কম্পিউটার স্ক্রিন বাদ দিয়ে ওরা এবার সরাসরি বোটের আশেপাশে পানির দিকে নজর দেয়। প্রাণীগুলোর পিঠ দেখে এতক্ষণে আর বুঝতে বাকি নেই যে ওসব তেমন সুবিধের কিছু নয়। খাবার খাওয়ার পর ওরা যে পচনশীল উচ্ছিষ্টগুলো পানিতে ফেলেছিল, সেসব খেতেই হয়তো এখানে এদের আগমন।

হঠাৎ করেই সাদ ফিশিং নেট দিয়ে খুব ছোটো সাইজের একটা মাছ ধরে ফেলল। কিন্তু ওটার চেহারা দেখার পর সাদ আর নিক্স দুজনেরই পিলে চমকে উঠল। ঈষৎ গোলাপি রঙের একটি প্রাণী, দেখতে যেন শয়তানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়! গ্রিক পুরাণ বা হলিউড সিনেমায় বর্ণিত মনস্টারদের মতোই দেখতে তবে আকারে ছোটো। কিন্তু প্রাণীগুলো এতক্ষণ আক্রমণ না করলেও তাদের মধ্য থেকে একটিকে ধরে আনার পর বোটকে সবদিক থেকে

ধাক্কাতে আরম্ভ করল। ভীতসন্ত্রস্ত হলেও নিক্স মাথা ঠান্ডা রেখে চিন্তা করে পানির দিকে লাইট মারার পর সেগুলো পালাতে থাকল।

"These are the creatures from the deep and they're afraid of lights, aren't they?",

সাদের এই প্রশ্নে নিক্স শুধু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র বলে বেচারা অতটা অভিজ্ঞ নয়।

দুজনে মিলে একটু চেষ্টা করার পরেই প্রাণীগুলো সব চলে গেল। আর সাদ এবং নিক্স সেই গোলাপি হাঙর সদৃশ প্রাণী নিয়ে ফিরে এলো খুঁটিয়ে দেখার জন্য। প্রাণীটির দেহ গোলাপি, সম্প্রসারিত চ্যাপটা নাসারন্ধ্র যা খুবই প্রসারণশীল, মুখে নখের মতো দাঁতবিশিষ্ট, ছোটো ছোটো পাখনাযুক্ত।

এই প্রাণীটি হচ্ছে 'Mitsukurinidae' ফ্যামিলির একমাত্র সার্ভাইভার 'Goblin Shark' যা 'জীবন্ত জীবাশ্ম' নামেও পরিচিত। এদের বৈজ্ঞানিক নাম Mitsukurina owstoni। এদেরকে ধরা হয় হাঙরের সবচেয়ে পুরোনো প্রজাতি হিসেবে। গবলিন শার্ক প্রায় ৯৫ কোটি বছর আগে বিবর্তিত হয় এবং এদের ফ্যামিলিই এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা সবচেয়ে পুরাতন।

এদের প্রসারণশীল মুখ নাসারন্ধ্র পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে যদিও তা মাথার নিচ পর্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্ত। ওপরের পাটিতে ৩৬-৫৩ সারি এবং নিচে ৩২-৬২ সারি দাঁত থাকতে পারে। চোয়ালের মূল দাঁতগুলো লম্বা ও সরু, চোয়ালের মাঝে খাঁজকাটা। দেহ সরু ও তুলতুলে। দুটি পৃষ্ঠদেশীয় পাখনা গঠনগতভাবে একই, ছোটো ও বৃত্তাকার। পেকটোরাল পাখনাগুলোও ছোটো এবং বৃত্তাকার। এরা পরিণত বয়সে ৯৩-৯৪ ফিট কিংবা পরবর্তীতে তারও বেশি হতে পারে।

গবলিন শার্ক বাস করে পৃষ্ঠতলের প্রায় ৪৫০০ ফিট নিচে চরম বায়ুমণ্ডলীয় চাপে মহাদেশীয় উচ্চতর ঢালে, আন্তঃসাগরীয় গভীর খাদে। তবে বয়স্করা একটু বেশিই গভীর জলে থাকে। এজন্যই এরা আলো তেমন সহ্য করতে পারে না।

এদের প্রলম্বিত নাসারন্ধ্র থাকার কারণটা এখনো জীববিজ্ঞানীদের কাছে অস্পষ্ট। তবে তারা এটা জানেন যে এরা মুখ মুহূর্তের মধ্যেই কিছুটা প্রসারিত করতে বা ছুড়তে পারে। দেখতে মন্দ, শারীরিক গঠনগত কারণে এগুলো অনেকটা কুঁড়ে হয়ে থাকে। শুধু রাতেই পৃষ্ঠে আসে এবং জীবনের অধিকাংশ সময় অন্ধকারেই কাটিয়ে দেয়।

তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই রেয়ার গবলিন শার্ক দেখতে রাক্ষসের মতো হলেও তেমন আক্রমণাত্মক নয়। খাবার হিসেবে মূলত ছোটো মাছ, শুঁড়ওয়ালা শামুক, সামুদ্রিক খোলকী প্রাণী প্রভৃতি গ্রহণ করে থাকে। শুধু দেখতেই এলিয়েন ফ্রম প্রমিথিউসের মতো।

ব্যাঙাচি
কোরাল রিফ
ছবি: pinterest

মরা সাগর

সালমান আহমেদ

আবুল মিয়ার স্বপ্নযোগে এলিনা নামের এক পরীর সাথে যোগাযোগ হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মধ্যে ভালোবাসা জন্মায়। একদিন ছোটোখাটো ঝগড়ায় এলিনা আবুলকে ছেড়ে অন্য গ্যালাক্সিতে চলে যায়। ঝগড়ার সময় এলিনা বলে, "সাগরে ডুবে মরো তুমি"। এলিনা চলে যাওয়ার পর সে চিন্তা করল, "এলিনা যখন চলেই গেছে তাহলে আর এই জীবন রেখে লাভ কী? আমি তোমার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সাগরে ডুবেই মরব। কিন্তু কোন সাগরে?"

গুগলে 'মরার সাগর' লিখে সার্চ দিলো আবুল। সাথে সাথে নীল রঙের বড়ো বড়ো করে লেখা "মৃত সাগর" নামের একটি আর্টিকেলের লিঙ্ক ভেসে উঠল পর্দায়।

লিঙ্কে ঢুকে দেখল এটা আসলে সাগর না, একটা হ্রদ। একটু নিচে সে দেখতে পেল এ হ্রদে কোনো উদ্ভিদ বা মাছ বাঁচে না বলেই মূলত একে মৃত সাগর বলা হয়ে থাকে। কেবল সামান্য কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক অণুজীবের সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে। মনে

মনে ভাবল সে, "আরামসে মরতে পারব, তিমির পেটে যেতে হবে না।"

একটু স্ক্রল করে নিচে নামতেই সে দেখল, জিবুতির আসাল হ্রদের পর এটি বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লবণাক্ত পানির প্রাকৃতিক আধার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪২০ মিটার(১,৩৭৮ ফিট) নিচে এটি পৃথিবীর নিম্নতম স্থলভূমি। সর্বোচ্চ ৬৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং সর্বোচ্চ ১৫ কিলোমিটার প্রস্থবিশিষ্ট এই হ্রদটির অববাহিকার পরিমাণ ৪০,৬৫০ বর্গকিলোমিটার। এর গড় গভীরতা ১২০ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৩৩০ মিটার। এটা পড়ে একটু খুশি হলো সে। ভাবল, "সাগর না হোক, তবুও সাগরের চেয়ে কম কিছু না।"

এবার তার মন অন্য রকম বায়না ধরল, "মরবই যখন, তখন মৃত্যুস্থানের ইতিহাসটা জেনেই মরব।" এই বলে আরেকটু স্ক্রল করে নিচে নামল। পেয়েও গেল ইতিহাস। এবার পড়তে লাগল সে।

প্রায় তিন মিলিয়ন বছর পূর্বে বর্তমান জর্দান নদী, মৃত সাগর এবং ওয়াদি আরাবাহ অঞ্চল লোহিত সাগরের পানিতে বারবার প্লাবিত হতো। এর ফলে একটি সরু উপসাগরের সৃষ্টি হয়। উপসাগরটি জেজরিল উপত্যকায় একটি সরু সংযোগের মাধ্যমে লোহিত সাগরের সাথে যুক্ত ছিল।

প্রাকৃতিক তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রায় ২ মিলিয়ন বছর পূর্বে উপত্যকা এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী স্থলভাগ যথেষ্ট উচ্চতা লাভ করে। ফলে মহাসাগরের প্লাবনে এই অঞ্চলে সৃষ্ট উপসাগরটি পরিবেষ্টিত হয়ে হ্রদে পরিণত হয়।

৭০,০০০ বছর পূর্ব থেকে ১২,০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত ডেড সির পানির উচ্চতা বর্তমান উচ্চতার চেয়ে ১০০ থেকে ২৫০ মিটার বেশি ছিল। ২৬,০০০ বছর পূর্বে এটির পানি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছিল। প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্বে এর পৃষ্ঠোচ্চতা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেতে শুরু করে, যা সম্ভবত বর্তমান পৃষ্ঠোচ্চতার চেয়েও কম ছিল। গত কয়েক হাজার বছর ধরে এর পানির পৃষ্ঠোচ্চতা মোটামুটি ৪০০ মিটারের আশেপাশে অবস্থান করছে।

এবার সে একটু গান ধরল, "চলে গেছ তাতে কী? মৃত সাগর পেয়েছি, সে আমার নতুন ঠিকানা।"

এরপরে আর স্ক্রল না করে গুগল থেকে বেরিয়ে এলো আবুল। ফলে নিচের লেখাগুলো আর পড়া হলো না, যেখানে লেখা ছিল, "বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মহাসাগরের পানির তুলনায় ডেড সির পানিতে মিশে থাকা খনিজ উপাদানগুলোর পার্থক্য আছে। মৃত সাগরের পানিতে মিশে থাকা লবণে ১৪% ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ৪% পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ৫০% ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এবং ৩০% সোডিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে। এর লবণাক্ততা শতকরা ৩০%। এটি সমুদ্রের পানির চেয়ে ৮.৬ গুণ

বেশি লবণাক্ত। ফলে পানির ঘনত্ব ১.২৪ কেজি/লিটার। উচ্চ প্লবতার জন্য যে কেউ মৃত সাগরের পানিতে ভেসে থাকতে পারে ।

পরদিনেই বিমান বাংলাদেশের একটি প্লেনে চেপে জর্ডানের উদ্দেশে রওয়ানা দেয় আবুল। সঞ্চিত টাকাগুলো সে দান করে দিয়েছে গতকাল। প্লেনে একজনের কাছ থেকে একটি নতুন তথ্য জানল সে; মৃত সাগরের তীরবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে উট, খরগোশ, খেকশিয়াল এমনকি চিতাবাঘ দেখতে পাওয়া যায়। অতীতে জর্দান নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্যাপিরাস এবং পাম গাছে সমৃদ্ধ বনভূমির অবস্থান ছিল।

বিমানবন্দর থেকে নেমেই সে ট্যাক্সি করে চলে গেল মৃত সাগরের কিনারে। তাকিয়ে দেখল চারপাশটা। কেউ নেই। এই ফাঁকেই কাজটা সারতে হবে। চোখ বুজে দিল এক লাফ। "আরে! আমি ডুবছি না কেন?" মনে মনে ভাবল সে। এরপর চিৎকার দিয়ে বলল, "দেখ এলিনা, আমার ভালবাসা সত্যি ছিল।"

এবার তার মুখে শোনা গেল অমর প্রেমের গান, "প্রেমের মরা জলে ডুবে না।"

ববিট ওয়ার্ম

BLUE PLANET II

A New World of Hidden Depths

রিভিউয়ার: সমুদ্র জিত সাহা

এলিয়েন ভাবতেই আমাদের মাথায় আসে অদ্ভুতদর্শন সব প্রাণী, এক চোখ বড়ো আরেক চোখ ছোটো বা লম্বা লম্বা শুঁড়ওয়ালা দেহ, গায়ের রঙ বদল করা অদ্ভুত সব প্রাণীর কথা। কিন্তু এর চেয়েও অদ্ভুত সব প্রাণী যে আমাদের পৃথিবীতেই আছে তা জানার জন্য আপনাকে দেখতে হবে **BBC Blue Planet** । আমার জীবনে দেখা ডকিউমেন্টরিগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে সেরার সেরা হলো **Blue Planet II** । 2001 এ Blue Planet রিলিজের পর জনপ্রিয়তা দেখে এর সিকোয়াল প্রায় একই জিনিসপত্র নিয়ে আধুনিক ক্যামেরাসহ নতুন সব প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০১৭ সালে রিলিজ হয় **Blue Planet II** । স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরোর অসাধারন ন্যারেশন, স্ক্রিপ্ট আর সমুদ্রের প্রচুর অজানা, অদ্ভুত ও অসাধারণ জিনিস তুলে ধরেছেন এখানে। এই সিরিজ সমুদ্রপাড়ের Seals থেকে সমুদ্র তলদেশের Toad fish বা ডাম্বো অক্টোপাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে আপনাকে। একই সাথে দেখাবে কোরাল রিফের অক্টোপাসদের বুদ্ধি। আবার গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের চরম পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বিবর্তিত অদ্ভুত সব রূপ ! আপনি দেখবেন পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা পাখি ওয়ান্ডারিং আলবাট্রোসদের কঠিন খাটনি, তাদের ছানাপোনাদের বড়ো করার জন্য। আবার দিনশেষে মনে করিয়ে দেবে কীভাবে এই অসাধারন সুন্দর প্রাণীগুলোর বাসস্থান মানুষ ধ্বংস করছে, কীভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং পৃথিবীর অধিকাংশ জীবের বাসস্থানের ক্ষতি করছে, আর পরিচয় করিয়ে দেবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে যেসব হিরোরা।

JAMES HONEYBORNE
and MARK BROWNLOW
Foreword by DAVID ATTENBOROUGH

সামুদ্রিক মৌমাছি

মনিফ শাহ চৌধুরী

ব্রিগিটা ভান টাসেনব্রুক একজন মেরিন বোটানিস্ট, যিনি কাজ করেন সমুদ্রে থাকা গাছপালা নিয়ে। কোনো এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে মেক্সিকান ক্যারিবিয়ানের কোনো সামুদ্রিক অঞ্চলে তিনি এগুলো নিয়েই গবেষণা করছিলেন, যখন তার নজরে আসে যে, কিছু ছোট্ট অমেরুদণ্ডী প্রাণীর লার্ভা পুরুষ এবং স্ত্রী ফুলের কাছে যাতায়াত করছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনে করেন যে লার্ভাগুলো খাবারের সন্ধানে ছোটো ছোটো গাছের আশেপাশে ঘুরছে। তবে, তার মাথায় আরেকটা চিন্তাও এলো বটে।

তার আগে একটা প্রশ্ন করে নিই। আচ্ছা, সমুদ্রে কি মৌমাছি আছে? আপনি ভাববেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? সমুদ্রে মৌমাছি আসবে কোথা থেকে?

এবার আসবে দ্বিতীয় প্রশ্ন। আচ্ছা, সমুদ্রে যদি মৌমাছি বা এরকম কোনো পোকামাকড় বা প্রাণী না থাকে তাহলে পরাগায়ন হয় কীভাবে?

আপনি তখন হয়তো একটু ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করে উত্তর দেবেন যে, স্থলে যেরকম বাতাসের সাহায্যে পরাগায়ন ঘটে ঠিক সেরকমভাবে পানির সাহায্যে সমুদ্রে পরাগায়ণ ঘটে। অভিনন্দন ! আপনি ঠিক বলেছেন !

বিজ্ঞানীরাও তাই ভাবতেন। সমুদ্রে পরাগায়ণ হয় পানির স্রোতের কারণে। পুরুষ ফুল তার অ্যান্থার (anther) থেকে সূর্যাস্তের পর পরাগ ছেড়ে দেয় এবং স্ত্রী ফুল তার stigma উন্মুক্ত করে রাখে সকাল থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত। পানির স্রোতের কারণে পরাগ ভেসে ভেসে স্ত্রী ফুলের stigma তে যায় এবং সেখানে যেয়ে পরাগ টিউব তৈরি করে ধীরে ধীরে নিচে, গভীরে থাকা ডিম্বাশয়ে চলে যায়। নিষিক্ত হয় পুরুষ ও স্ত্রীর নিউক্লিয়াস !

একদম খাপে খাপ ! তবে গল্প আরও বাকি আছে।

ব্রিগিটা ও তার কলিগরা যা করলেন তা হলো, বিশাল বড়ো বড়ো দুইটা অ্যাকুরিয়াম নিলেন। দুটোই সমুদ্রের পানি দিয়ে ভর্তি করলেন। এরপর, দুটো অ্যাকুরিয়ামে একই প্রজাতির সামুদ্রিক ফুলেল গাছ নিলেন। পুরুষ ফুলগুলো যখন পরাগ ছাড়া শুরু করল তখন তারা একটি অ্যাকুরিয়ামে

অনেকগুলো অমেরুদণ্ডী প্রাণীর লার্ভা ছেড়ে দিলেন।

এখানে তাঁরা বেশ কিছু অবজার্ভেশন করলেন। প্রথমত, লার্ভাগুলো পুরুষ ও স্ত্রী, উভয় ফুলের কাছেই যাচ্ছিল এবং তাদের স্পর্শ করছিল। তবে, শুধুমাত্র পুরুষ ফুলগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলো লম্বা সময় ধরে অবস্থান করছিল এবং এমন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করছিল যাতে মনে হচ্ছিল তারা কিছু খাচ্ছে।

খাচ্ছে কি খাচ্ছে না সেই বিষয়টা পরিষ্কার হয় পরে, যখন তারা লার্ভাগুলোর পেটে আলো মেরে দেখে সেখানে আগে থেকে কেমিক্যাল মার্কার দিয়ে রাখা পরাগ উপস্থিত, অর্থাৎ, পরাগ খেয়েছে। আবার বেশ কিছু পরাগ এদের গায়েও লেগে রয়েছিল। অর্থাৎ, এরাও পরাগ গায়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যান।

লার্ভাগুলো অ্যাকুরিয়ামে দিয়ে দেওয়ার প্রায় কয়েক মিনিটের মাথায় স্ত্রী ফুলের stigma তে পরাগ বেশি করে আসছিল। কিছু কিছু পরাগ মাঝে মাঝে stigma থেকে সরেও যাচ্ছিল, কারণ লার্ভার গায়ে সেগুলো আবার লেগে যাচ্ছিল, তবে নতুন পরাগ stigma তে আসার হার বেশি ছিল।

অপর অ্যাকুরিয়াম, যেটায় লার্ভা ছিল না, সেখানে নতুন করে কোনো পরাগ যোগ হয়নি। অর্থাৎ, লার্ভাগুলো মোটাদাগে পরাগায়নের জন্য দায়ী ছিল।

শুধু পরাগায়ন হলেই হবে ? সেটা ডিম্বাশয় পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে না ? এদের লার্ভাভর্তি অ্যাকুরিয়ামের স্ত্রী ফুলগুলোর style এ পরাগ টিউব তৈরির হার বেশি দেখা গেছে। অপর অ্যাকুরিয়ামে, যেখানে কোনো লার্ভা ছিল না, সেখানে খুবই অল্প পরাগ টিউবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, তাদের মতে, সেখানে কোনো পরাগ টিউব পাওয়ার কথাই ছিল না যদি না অ্যাকুরিয়ামে গাছগুলো রাখতে যেয়ে আগে থেকেই তাদের মাঝে পরাগ চলে আসে। সেটাই হয়েছে। নচেৎ লার্ভাও নেই, সমুদ্রের পানির স্রোতও নেই, পরাগায়ন হওয়া কন্ট্রোল অ্যাকুরিয়ামে কোনোমতেই সম্ভব নয় ।

ওপরের অবজারভেশনে এই প্রমাণ হয় যে সমুদ্রের এই ফুলেল গাছগুলো পরাগায়নের জন্য ছোটো ছোটো লার্ভার ওপর নির্ভরশীল। যদিও এই গাছ ক্লোনিং করে নিজেদের পপুলেশন বাড়াতে পারে, তারপরেও জেনেটিক বৈচিত্র্যের জন্য পরাগায়ন প্রয়োজন এবং সেটার হার বজায় রাখতে লার্ভাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

এই যে নতুন জ্ঞান লাভ হলো, এ থেকে আমরা কী জানলাম? আমরা জানলাম যে আমরা খুবই কম জানি। কেন ? কারণ এই গবেষণা শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির গাছের ওপর করা হয়েছে। কিন্তু সমুদ্রে বৈচিত্র্যের অভাব কখনোই ছিল না। এই এত এত বৈচিত্র্যময় প্রজাতি ঠিক কোন কোন প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল পরাগায়নের জন্য, তা আমরা

এখনও জানি না এবং যে হারে সামুদ্রিক দূষণের কারণে কিছু কিছু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাতে জীববৈচিত্র্য কোন হারে লোপ পাবে তা কি আমরা আদৌ চিন্তা করতে সক্ষম ? আমরাও কি কোনোভাবে এই খাদ্যচেইনের অংশ না ? জীববৈচিত্র্য নষ্ট হলে তা কি দিনশেষে আমাদেরও আঘাত করবে না ? মানুষই পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী হিসেবে কতদিন টিকে থাকবে ?

৯৯৯ মিটার পর্যন্ত বসবাস dentex-এর সূর্যের আলো একেবারেই প্রায় পৌছায় না বলা চলে। Twilight zone এর খুব কাছে পৌছে গেছি আমরা।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ (সম্পাদিত)।

বাতিঘর

দিনাত জাহান মিলি তাসনিম

সমুদ্রপথে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জন্য জাহাজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে প্রচুর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়া ছাড়াও রাতের বেলা সমুদ্রের অগভীর স্থানে চোরাপাহাড়ে বা প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা লেগেও অনেক জাহাজ ডুবে যেত। তাই জাহাজ দুর্ঘটনা কমানোর জন্য রাতের বেলা জাহাজকে সমুদ্রের বিপজ্জনক স্থান সম্পর্কে সচেতন করতে লাইটহাউজের প্রচলন হয়। লাইটহাউজ বা বাতিঘর হচ্ছে একটি সুউচ্চ বিল্ডিং যার একদম চূড়ায় থাকা আলোক উৎস রাতের বেলায় আলো নিক্ষেপ করে সমুদ্রের জাহাজকে বিপজ্জনক জায়গার দিক প্রদর্শন করে বা বিপজ্জনক স্থান সম্পর্কে সচেতন করে। এটি সমুদ্রের ট্রাফিক সাইন এর মতো কাজ করে। কারণ, প্রাচীন কালে বাতিঘর দেখে সমুদ্রের নাবিকেরা সমুদ্রে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করত। বাতিঘর সাধারণত সমুদ্রের তীরে নির্মাণ করা হয়। ইতিহাসে সর্বপ্রথম নির্মিত বাতিঘর হলো 'আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর'। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ২৮০তে স্থাপিত হয় এবং এর উচ্চতা ছিল ১২০-১৩৭ মিটার যা ছিল ঐ সময়ের অন্যতম সুউচ্চ স্থাপনা। এই বিখ্যাত স্থাপনাটি প্রায় ১৫০০ বছর পর একটি ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে। বাতিঘরের আলোক উৎসের জন্য বর্তমানে ইলেকট্রিসিটি কিংবা অ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের পূর্বে কাঠ ও কয়লা ব্যবহার করে আগুন জ্বালানো হতো। জ্বালানি হিসেবে তিমির তেল, পশুর চর্বি ও কেরোসিনের ব্যবহার ছিল। ১৮৮২ সালে বাতিঘরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ফ্রেনেল লেন্স আবিষ্কৃত হয়। এর দ্বারা অসংখ্য ফ্ল্যাশিং কম্বিনেশন সৃষ্টি করা যায় এবং এটি আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি করে, ফলে আলো আরও দূর থেকে দেখা যায়। বর্তমানে কিছু কিছু লাইটহাউজে ফ্রেনেল লেন্স এর পরিবর্তে অ্যারোবেকন লাইট ব্যবহার করা হয়। কারণ, এতে ফ্রেনেল লেন্স এর চেয়ে কম রক্ষণাবেক্ষণ লাগে। জিপিএস, রাডারসহ বিভিন্ন প্রযুক্তির কারণে পৃথিবীতে লাইটহাউজের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় কিছুটা কমে গেছে। তবুও বর্তমান পৃথিবীতে লাইটহাউজের সংখ্যা ১৮,৬০০। বাংলাদেশে অবস্থিত লাইটহাউজের সংখ্যা ৭। জেদ্দা লাইটহাউজ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা লাইটহাউজ, যার উচ্চতা ৪৩৬ ফুট।

সাগরের বুকে উড়ে চলা মাছ

মো. বিপ্লব হোসেন

আটলান্টিকের বুকে ভেসে চলেছে একটি জাহাজ। হঠাৎই কোথা থেকে উড়ে এসে জাহাজের ডেকে আছড়ে পড়ল ৯ ফুট আকারের একটি মাছ। আশেপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াতে দেখা গেল এরকম মাছগুলোকে। "মাছ উড়তে পারে", এ কথায় অনেকের হাসি পেলেও ব্যাপারটা আসলেই সত্যি। এই মাছ দ্রুত সাঁতার কাটতে গিয়ে অনেক সময়ে জলের একেবারে উপরিভাগে চলে আসে এবং পাখনা মেলে বাতাসে উড়াল দেয়। এক্সোকোয়িটাইড গোত্রের এই মাছটি ঘন্টায় ৩৭ মাইল বেগে উড়তে পারে। এক্সোকোয়িটাইড শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ এক্সোকোয়িটাস থেকে । এর অর্থ 'বাসস্থানের বাইরে ঘুমায় যারা'।

প্রাচীনকালে মাছের এই উড়ার ক্ষমতার কারণে মনে করা হতো, এই মাছ সারাদিন পানিতে বিচরণ করলেও রাতে ঘুমানোর জন্য তীরে উড়ে যায়। উড়ুক্কু মাছের অধিকাংশই সামুদ্রিক এবং সাধারণত ঝাঁক বেঁধে চলে। অতি দ্রুত সাঁতার কাটতে কাটতে এরা পানির একেবারে উপরিভাগে চলে আসে এবং পাখনা প্রসারিত করে পাখিদের মতো বাতাসে উড়াল দেয়। তবে এদের ওড়ার মূল কারণ, আত্মরক্ষা বা খাদ্যগ্রহণ। বড়ো মাছ বিশেষ করে টুনা, ডলফিন কিংবা স্কুইডের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচার জন্য কখনো কখনো পানি ছেড়ে হাওয়ায় ভাসে তারা। সুগঠিত পাখনাবিশিষ্ট এসব মাছের কোনো কোনোটি বাতাসের গতি বা ঢেউয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে এরা ৩০ সেকেন্ড অবধি শূন্যে ভেসে থাকতে পারে। আবার কোনো কোনো প্রজাতি প্রায় ৬৬৫ ফুট পর্যন্ত চলতে পারে।

প্রশান্ত মহাসাগর, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর এমনকি ভারত মহাসাগরের কোনো কোনো অংশেও দেখা মেলে ফ্লাইং ফিশ বা উড়ুক্কু মাছের। সুদর্শন এই মাছটির ওপরের দিকটা নীলচে, পেটের দিক রুপালী। আকারে ৭ থেকে বারো ইঞ্চি এবং দুই জোড়া পাখনা থাকে। বিশ্বজুড়ে এরকম মাছের প্রজাতি রয়েছে প্রায় ৭৯টি। জনপ্রিয় লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের নোবেল বিজয়ী উপন্যাস ‘দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী’ বইটি পড়ার সময় সব পাঠকের যে বিশেষ জিনিসটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো এই উড়ুক্কু মাছ। তবে রঙ-বেরঙের আলোর প্রতি উড়ুক্কু মাছের রয়েছে মারাত্মক দুর্বলতা। এই আলোর নেশাকে কাজে লাগায় মাছ শিকারীরা। নজরকাড়া নানা রকম আলোর ফাঁদ তৈরি করে সুকৌশলে মাছগুলোকে জালের মধ্যে আটকে ফেলে তারা। জাপান, চীন, ভিয়েতনামে এই মাছের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা।

১৯৫ মিটার ! একটু দাঁড়ান। কারণ এখন শুরু হচ্ছে twilight zone বা অস্পষ্ট জোন। এই জোনে সমুদ্রে কোনো আলো নেই বললেই চলে। এই ১৯৫ থেকে ২০৭ মিটার রেইঞ্জে অলৌকিকভাবে এক পাখি ডুব দিয়ে শিকার করতে পারে। তার নাম Murre Dive।

২০৮ থেকে ২২০ মিটার। এই রেইঞ্জটা থেকেই মিলিয়ে গেল অবশিষ্ট আলো। এখন সমুদ্র খুবই অন্ধকার। আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না। এখানকার প্রাণীগুলোকে বলা হয় প্রেডেটর। কারণ এদের আকৃতি প্রেডেটরের মতো। এদের ফুলকা অনেক শক্তিশালী হয়। কারণ এত নিচে (প্রায় ৬৬০ ফুট নিচে) পানির চাপ কী পরিমাণ হবে ! যাহোক, এই রেইঞ্জে দেখা মিলবে Wolf Eel-এর।
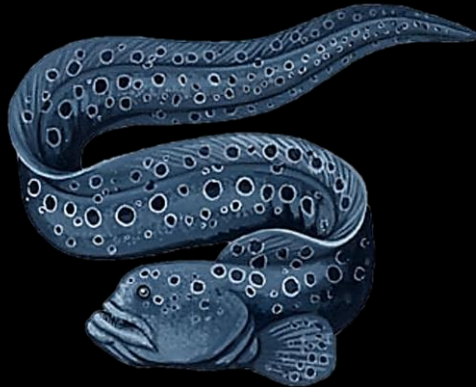
সমুদ্র সম্পর্কে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার

জহিরুল ইসলাম

১. বর্তমান সময়ে আমরা যে ম্যাপটা দেখতে পাই সেখানে কি অজানা কোনো জায়গা আছে ? নাই, অজানা কিছু নাই। কোন অংশের কী নাম, সেখানে কীভাবে যাওয়া যায়, আশেপাশে কী পাওয়া যায়, কী ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী আছে, তার সবই আমরা জানি। সেই সব তথ্যই আমরা ম্যাপে ঢুকিয়ে দেই। তবে কয়েকশ বছর আগেও সিচুয়েশনটা এমন ছিল না।

সেই সময়ের ম্যাপ প্রস্তুতকারকদের হাতে যে সব দেশ বা অঞ্চলের তথ্য ছিল, শুধু সেই দেশগুলোই তারা ম্যাপে আঁকত। ম্যাপ আঁকার পরে দেখা যেত, অনেক এলাকা খালি পড়ে থাকছে। ম্যাপ প্রস্তুতকারকরা তখন এই খালি জায়গাগুলাতে নিজেদের ক্রিয়েটিভিটি এবং প্রচলিত রূপকথার সাহায্য নিয়ে রাক্ষস, খোক্ষস, জলদানো, মৎস্যকন্যা, পানিমুড়া এবং আরও আজব আজব প্রাণী এঁকে দিত।

প্রাচীন ম্যাপগুলার দিকে তাকালেই এইসব আজব প্রাণী দেখতে পাবেন। প্রাচীন সাহিত্য বা রূপকথার গল্পগুলোতে পাবেন, নাবিকরা যখনই কোনো অজানা এলাকায় যায়, তখনই তারা আজব আজব সাগরের দানবদের মুখোমুখি হয়। হোমারের অডেসিতে ইউলিসিসের সমুদ্র অভিযান কিংবা আলিফ লায়লাতে সিন্দাবাদের সমুদ্রযাত্রাতে এই রকম আজব আজব প্রাণীর দেখা পাই আমরা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাবিকরা সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে এইসব গালগল্প বানিয়ে বানিয়ে বলত ভাইরাল হওয়ার জন্য, বেশি লাইক-কমেন্ট পাওয়ার জন্য। যেহেতু ভেরিফাই করার কোনো উপায় ছিল না, তাই সবাই তাদের কথা মেনে নিত। হোমারের মতো সাহিত্যিকরা তাদের বানানো গল্পে আরও রং চড়িয়ে সাহিত্যে স্থায়ীভাবে লিখে রাখত।

২.

স্পেনের কলম্বাস জাহাজ নিয়ে সমুদ্র অভিযানে বের হলেন। আবিষ্কার করলেন আমেরিকা মহাদেশ। পর্তুগালের ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসলেন। ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন জেমস কুক আবিষ্কার করলেন অস্ট্রেলিয়া। ইউরোপের সব দেশই বড়ো বড়ো পালতোলা জাহাজ নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল রেনেসার পরবর্তী যুগে। চীন, আফ্রিকা, আরবরাও একেবারে থেমে থাকেনি।

কিন্তু আমরা, ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের লোকেরা সমুদ্র যাত্রায় খুব একটা উৎসাহী ছিলাম না। নিজ এলাকা ছেড়ে জাহাজ ভাসিয়ে আমরা বেশি দূর কোথাও যাইনি। কারণ, এই এলাকার লোকদের মধ্যে কুসংস্কার ছিল, কালাপানি (সমুদ্র) পাড়ি দিলে জাত চলে যাবে। মুঘল সম্রাট আকবর হজ করার জন্য জাহাজে করে সৌদি আরবে হাজি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন কিছু মুসলমান সমুদ্রপথে ট্রাভেলিং শুরু করে। তবে হিন্দু সম্প্রদায় আগের মতোই কুসংস্কার নিয়ে বসে রইল। ১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায় কুসংস্কার ভাঙার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুব্রহ্মনিয়ম, চন্দ্রশেখরসহ অনেকেই জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, এখনো দিচ্ছেন অনেকে।

৩.

গ্রিকদের বিশ্বাস ছিল, সমুদ্রের দেবতা হলো ভয়ংকর পোসাইডন। সে থাকে সাগরের তলায়। তাকে বিরক্ত করলে সে রেগে যায়। একবার রেগে গেলে সে অনেক ক্ষতি করতে পারে। বিশ্বের অন্য অনেক এলাকাতেও এই ধরনের গল্প পাওয়া যায়।

আলিফ লায়লার গল্পে পাওয়া যায়, সমুদ্রের তলদেশে সিন্দুকে আটকে পড়া জিনের গল্প, যাকে উদ্ধার করে বিপদে পড়ে গিয়েছিল এক নিরীহ জেলে।

বর্তমান সময়ে কি আমরা সমুদ্রের কোনো অলৌকিক প্রাণী বা এইরকম কোনো সুপারন্যাচারাল জিনিসে বিশ্বাস করি ? নাকি আমরা সবাই শিক্ষিত হয়ে গেছি ?

২০১৬ সালের মার্চ মাসে ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়াসি দ্বীপের ব্যাংগুই প্রদেশে একজন জেলে খুব সুন্দর একটা নারী মূর্তি পান সাগরে। নরম শরীরের সুশ্রী সেই মূর্তিটির শরীরে কোনো কাপড়চোপড় ছিল না। জেলেরা সেটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন, ভদ্রস্থ কাপড় চোপড় পরান এবং 'দেবতা' বানিয়ে সেটাকে পূজা করতে শুরু করেন।

দেবতার ছবি, ভিডিয়ো এবং সাগর থেকে উদ্ধার হওয়ার এই অলৌকিক গল্প দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তদন্ত করতে আসে এক সময়।

দেখা যায়, জেলেরা যাকে দেবতা বানিয়ে পূজা করছে সেটা আসলে একটা সেক্স ডল।

(সেক্স ডল হচ্ছে যৌন কাজে ব্যবহৃত পুতুল। এই পুতুলগুলো পুরাপুরি মানুষের মতোই দেখতে হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসল ছেলে/মেয়ের চেয়েও বেশি আবেদনময় করে বানানো হয়। কিছু কিছু দেশে সেক্স ডল এতই পপুলার (যেমন : জাপান)যে, নিঃসঙ্গ ছেলে/মেয়েরা তাদের সেক্স ডলকে সাথে নিয়েই বাইরে ঘুরতে বের হয়।)

ইন্দোনেশিয়ার ওই গ্রামের মানুষদের কাছে ইন্টারনেট নেই। বহির্বিশ্বের মানুষদের সাথে তাদের যোগাযোগ

ছিল খুবই কম। সেক্স ডল বা কোনো ধরনের সেক্স টয় সম্পর্কে তাদের কোনো আইডিয়া ছিল না। এ কারণে তারা সেক্স ডলকে দেবতা বানিয়ে পূজা করছিল কয়েকমাস।

২৪০ থেকে ২৪৬ মিটার গভীরে মারাত্মক দাড়া বিশিষ্ট চিংড়ি পাওয়া যায়, যার নাম Terrible Claw Lobster।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ

ভারত মহাসাগরের জীববৈচিত্র্য

ইমদাদুল হক আফনান

এর আয়তন ৭০,৫৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর জলাভূমির ১৯.৮% জুড়ে ভারত মহাসাগর বিস্তৃত। এটি উত্তরে এশিয়া, পূর্বে অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিমে আফ্রিকা, দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। অ্যাভারেজ গভীরতা ৩৭৪১ মিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা ৭২৫৮ মিটার বা ২৩,৮১২ ফুট (জাভা ট্রেঞ্চ)।

ইন্ডিয়ান মহাসাগরের বিশেষ জীবগুলো হলো : আফ্রিকান পেঙ্গুইন, ডাস্কি ডলফিন, ফ্রাইগেট বার্ড, হ্যামারহেড শার্ক, Horseshoe crab, লায়ন ফিশ ইত্যাদি।

I. Aldabra Giant tortoise (অ্যালডাব্রা জায়ান্ট টরটয়েজ) :

পৃথিবীর সব থেকে বড়ো কচ্ছপদের একটি হলো এই প্রজাতি। বৈজ্ঞানিক নাম *Aldabrachelys gigantea* । Aldabra দ্বীপে এদের পাওয়া যায়। খোলস বাদামি বা তামাটে বর্ণের হয়ে থাকে, গলা লম্বা হয়। খোলস ১.২২ মিটার বা ৪ ফুট হয়। অ্যাভারেজ ভর ২৫০ কেজি (৫৫০ পাউন্ড)। এই প্রজাতির পৃথক গোষ্ঠী Changuu দ্বীপে থাকে। ফেব্রুয়ারি ও মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে নারীরা ৯-২৫ টা ডিম পাড়ে। অর্ধেকের কম ডিম থেকে বাচ্চা হয়। সাধারণত ৮০-১২০ বছর বাঁচে।

II. Dodo (ডোডো) :

এটি বিলুপ্ত প্রজাতির সামুদ্রিক পাখি। সর্বশেষ ১৬৬২ সালে ডোডো দেখা গিয়েছিল বলে জানা যায়। এরা Mauritius দ্বীপ ও Madagascar এ পূর্বে বসবাস করত। বৈজ্ঞানিক নাম *Raphus cucullatus*। এদের সব থেকে কাছের আত্মীয় ছিল *Rodrigues solitaire*। দুই প্রজাতি মিলে 'Raphinae' সাবফ্যামিলি গঠন করে। জীবিতদের মধ্যে ডোডোর সব থেকে কাছের আত্মীয় হলো 'Nicobar pigeon'। এরা প্রায় ১ মিটার (৩ ফুট ৩ ইঞ্চি) লম্বা হতো, ভর ছিল ১০.৬-১৭.৫ কেজি। পালক বাদামি ও ধূসর, মাথা ধূসর ও অনাবৃত, ঠোঁট সবুজ, কালো ও হলুদ রঙের। মোটা হলদে পা এবং কালো নখর ছিল। পুরুষ ডোডোরা গড়ে ২১ বছর এবং নারীরা ১৭ বছর বাঁচত।

এবার কচ্ছপের ইতি টানা যাক। Oliver Turtle-এর রাজ্য ২৪৭-২৫৯ মিটার গভীরতায় এবং সেই সাথে কচ্ছপেরও সমাপ্তি।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

ক্র্যাকেন : দ্যা গ্রেট লেজেন্ড

আসিফ আফতাব সোহাগ

'Hungry shark evolution' এর সর্বশেষ এডিশনে মনস্টার হিসেবে ক্র্যাকেন (Kraken) সংযুক্ত করা হয়। শুধু ভিডিয়ো গেমসেই নয়, অনেক বই, মিথোলজি এবং মুভিতেও ক্র্যাকেনের অস্তিত্ব মেলে। এখন আমরা জানব ক্র্যাকেন কী, কোথায় থাকে এবং এর বৈশিষ্ট্য কী কী ?

ক্র্যাকেনকে সংক্ষিপ্তভাবে 'পাইরেটস অফ দ্যা ক্যারিবিয়ান : অ্যাট ওয়ার্ল্ড'স এন্ড' মুভিতে দেখা গেছে, যেখানে এটি লর্ড ক্যাটলার বেকেটের আদেশে ডেভি জোন্স দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।

আধুনিক 'ক্ল্যাশ অফ দ্যা টাইটানস' মুভিতে ক্র্যাকেন হলো একটি টাইটানিক যুগের দানব যা মহান ঈশ্বর জিউসের নিয়ন্ত্রণাধীন, যিনি ক্র্যাকেনকে ডেকে পাঠাতে বা ক্র্যাকেনের মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। সিনেমাটির এই দৃশ্য, প্রচারমূলক ট্রেইলার এবং বিজ্ঞাপনগুলিতে ক্র্যাকেন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং ক্র্যাকেন সংক্ষিপ্তভাবে একটি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। সাধারণত ছদ্ম গ্রিক মিথোলজি অনুসারে, গ্রিক দেবতা পোসেইডনের মহাসাগরগুলির ওপর আধিপত্য ছিল এবং ক্র্যাকেনকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি পছন্দ করতেন। তবে প্রকৃত ক্র্যাকেন কোনও ঐতিহ্যবাহী গ্রিক মিথের অংশ নয়।

সম্ভবত ক্র্যাকেনের সর্বাধিক বিস্তারিত বর্ণনা ডেনিশ ঐতিহাসিক এরিক পন্টোপিডানের নরওয়ের প্রাকৃতিক ইতিহাসে ১৭৫০ সাল থেকে এসেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "জন্তুটি গোলাকার, সমতল এবং বাহুতে বা শাখায় পূর্ণ।" মিথোলজিতে ক্র্যাকেন শারীরিকভাবে শক্তিশালী এবং চটপটে। গোপনীয় ও হঠাৎ আক্রমণে সক্ষম। ক্র্যাকেন অমর নয় এবং হত্যা করা যেতে পারে। এরা এদের শুঁড় দিয়ে বড়ো বড়ো জাহাজকে পেঁচিয়ে ধরতে পারে এবং নিমিষেই জাহাজটিকে সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যেতে পারে। এটি বৃহত্তম এবং সমস্ত জীবজগৎ এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।" তিনি রেফারেন্স হিসেবে বিভিন্ন জেলেকে উদ্ধৃত করেছেন যারা ক্র্যাকেনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের বর্ণনায় বিশেষ কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে,"আপনি গ্রীষ্মে নরওয়েজিয়ান সাগরে কয়েক

মাইল দূরে সরে গেলে আপনার ক্র্যাকেনের কবলে পড়ার মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে।"

আসলে গ্রিক এবং নর্স ক্র্যাকেনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, যেহেতু বাস্তবে এটার কখনই কোনও অস্তিত্বই ছিলো না।

ক্র্যাকেনের কিংবদন্তি অনেক পুরোনো। এরা আইসল্যান্ড ও নরওয়ের উপকূলে বাস করত বলে প্রচলিত রয়েছে। বিশাল আকার ও ভয়াল চেহারা বিভিন্ন কল্পকাহিনীতে সমুদ্রে বাসকারী একটি দানব হিসেবে ক্র্যাকেনকে স্থান করে দিয়েছে। কিংবদন্তিটির উদ্ভব হয়েছে সম্ভবত দানব স্কুইড অবলোকনের ঘটনা থেকে, যারা শুঁড়সহ ১৩-১৫ মিটার (৪০-৫০ ফুট) লম্বা হতে পারে বলে মনে করা হয়। মিথোলজি অনুসারে, এই প্রাণীরা সাধারণত অত্যন্ত গভীর সমুদ্রে বসবাস করে এবং এদের আকৃতি এত বৃহৎ যে এরা শুঁড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে যেকোনো জাহাজকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে। সমুদ্রপৃষ্টে এদের দেখা গিয়েছে এবং এরা জাহাজ আক্রমণ করেছে বলেও শোনা গিয়েছে। kraken শব্দটি krake এর রূপ, একটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শব্দ যার অর্থ অসুস্থ জন্তু বা বিকৃত কিছু। আধুনিক জার্মান ভাষায় krake অর্থ অক্টোপাস, কিন্তু এটি কিংবদন্তির ক্র্যাকেনকেও নির্দেশ করতে পারে।

যদিও 'ক্র্যাকেন' নামটি নর্স গাঁথাগুলোতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এ ধরনের সমুদ্র দানব, হাফগুফা (hafgufa) ও লিংবার্ক (lyngbakr) এর বর্ণনা রয়েছে ওর্ভার-ওডস গাঁথা (Örvar-Odds saga)-এ এবং আনুমানিক ১২৫০ সালের নরওয়েজিয় টেক্সট, Konungs skuggsjá-এ। ক্যারোলাস লিনিয়াস তার সিস্টেমা নেচারে, জীবিত প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগের একটি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ক্র্যাকেনকে একটি সেফালোপডস হিসেবে মাইক্রোকসমাস নামে অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলোতে প্রাণীটিকে বাদ দেন।

ক্র্যাকেনের বৈশিষ্ট্য এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সঠিক কোনও ধারণা পাওয়া যায় না, যেহেতু বাস্তবে এটার অস্তিত্ব কখনই ছিল না। মিথোলজিগুলো থেকে যে ক্র্যাকেনের বর্ণনা পাওয়া যায় তা জায়ান্ট প্যাসিফিক অক্টোপাসের দিকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পাওয়া সর্ববৃহৎ জায়ান্ট প্যাসিফিক অক্টোপাস (Enteroctopus dofleini) এর আকার প্রায় ৩০ ফুট এবং ওজন প্রায় ৬০০ পাউন্ড। গড়ে এরা ১৬ ফুট ১১০ পাউন্ডের হয়ে থাকে যা মিথিক ক্র্যাকেনের তুলনায় অনেক ছোটো। জায়ান্ট স্কুইডকে (Architeuthis dux) দীর্ঘকাল ধরে বৃহত্তম সেফালোপড মনে করা হয়েছিল। এখন জানা যায় যে কলোসাল স্কুইড (Mesonychoteuthis hamiltoni) আরও বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে। এখন পর্যন্ত দেখা দৈত্যাকার স্কুইডটির সর্ববৃহৎ আকার ছিল দৈর্ঘ্যে 30.3 ফুট এবং এর ম্যান্টলের দৈর্ঘ্য ছিল 5.9 ফুট। তাছাড়া ক্র্যাকেনের, অক্টোপাসের মতো রং পরিবর্তন করার বৈশিষ্ট্যও কোনো মিথোলজিতে পাওয়া যায় না। ক্র্যাকেন সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতের প্রাণী। লোকমুখে প্রচলিত
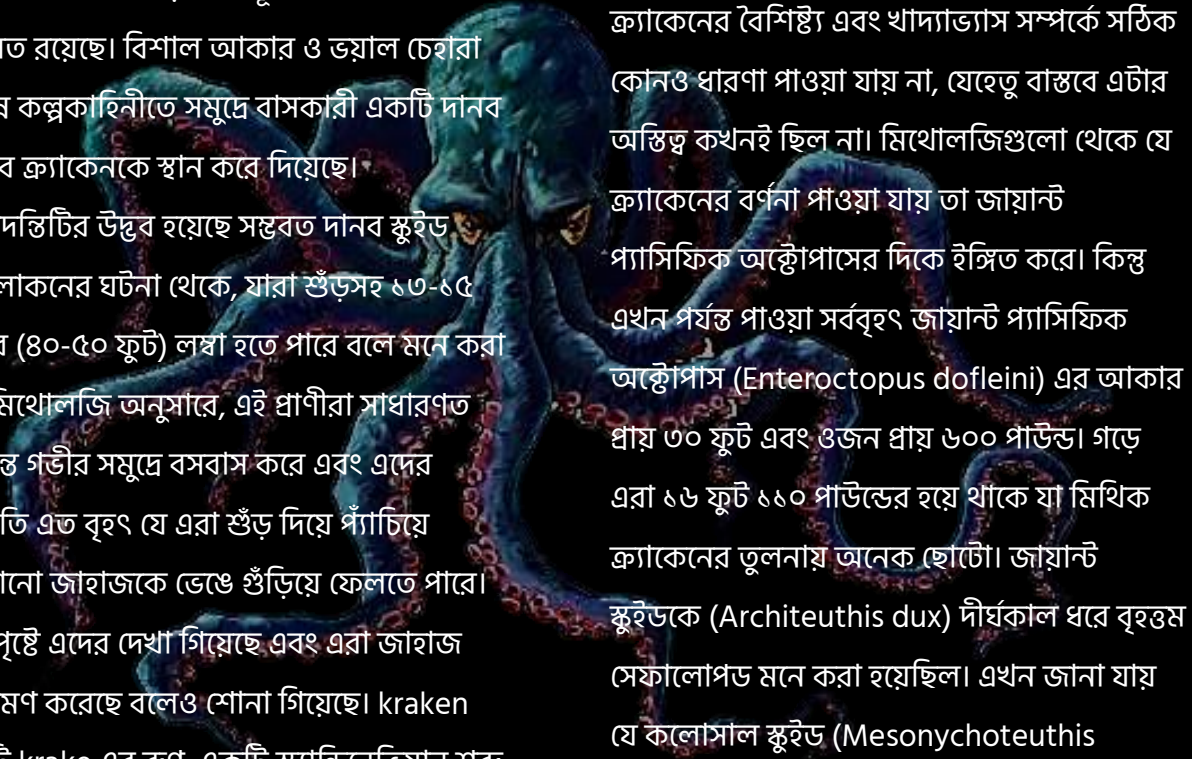
বলে অনেকেই ধারণা করেন এই ভয়ানক দানবটি বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে একটি প্রাণী। কিন্তু তেমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত একটাও জীবিত বা মৃত ক্র্যাকেনের দেখা মেলেনি। তাই কল্পনার জিনিস কল্পনাতেই সুন্দর, বাস্তব হিসেবে ধরে নেওয়াটা বোকামি।

আবারও শার্কের আরেক প্রজাতি নিয়ে হাজির আপনাদের সামনে। এবার পরিচয় করাব ২৭৫ মিটার পর্যন্ত বসবাস করা Great White Shark-এর সাথে

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

মা

নাঈম হোসেন ফারুকী

১। গভীর সমুদ্র।

১৪০০ মিটার মানে প্রায় ৪২০০ ফুট। একটা ৪২০ তলা বিল্ডিংকে উলটা করে ডোবালে যত গভীর হবে তত।

ব্রুস রবিনসন তাঁর সাবমারসিবল নিয়ে দেখতে এসেছেন সেখানকার আশ্চর্য সব প্রাণীকে।

মিডনাইট জোনে নিকষ কালো অন্ধকার। চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভূতুড়ে সব দানব।

এই জগতে খাবারের খুব অভাব। হয় শিকার হও নাহলে শিকার করো–এইটাই এখানকার নিয়ম।

এই দানবদের রাজ্যে দেখা মিলল পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীদের একজনকে- একটা মা

অক্টোপাস। কিছুদিন আগে সে ডিম দিয়েছে। তার বাসায় ছোটো ছোটো অশ্রুদানার মতো ঝুলছে ৯৬০টা ডিম।

এই ডিমগুলো মূল্যবান। মা অক্টোপাস জীবনে মাত্র একবারই ডিম পাড়ে। সে জানে এদেরকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়। একটু বাসা ছেড়ে গেলে আশেপাশের শিকারিরা তার ডিম চুরি করে ফেলবে। মা অক্টোপাস তাই কোনোদিন বাসা ছাড়ে না।

ডিমগুলো বড়ো হচ্ছে। শ্যাওলা যাতে না জমে সেজন্য সেগুলোকে কিছুক্ষণ পরপর নাড়াচাড়া করে দিতে হয়। অক্সিজেনের যাতে কোনোরকম অভাব না হয় সেজন্য একটু পরপর বাতাস দিতে হয়। যে-কোনো প্রাণী আশেপাশে এলে তাদের তাড়াতে হয়। মা অক্টোপাসের কাজের শেষ নেই।

ব্রুসের টিম ২৮ দিন পর ফিরে এলো। মা অক্টোপাস তখনও বাসা ছাড়েনি। অক্টোপাসের ডিম ফুটতে অস্বাভাবিক বেশি সময় লাগে। এই গভীর সমুদ্রের অক্টোপাস ডিমের ভেতর থাকে প্রায় চার বছর। এই চার বছরে ব্রুসের টিম বারবার ঘুরে গেছে, একবারের জন্যও মা অক্টোপাসকে বাসা ছাড়তে দেখেনি। এই জগতে খাবারের খুব অভাব, ঘরের কাছে খাবার

ঘুরঘুর করে না। এই চার বছরে মা অক্টোপাসকে একবারের জন্যও খেতে দেখা যায়নি।

আস্তে আস্তে দিন যায়। ডিমগুলো ছোটো থেকে বড়ো হয়। মা অক্টোপাস এক মুহূর্তও তাদের চোখের আড়াল করে না। তার বেগুনি চামড়া আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে ওঠে। তার চোখ মেঘাচ্ছন্ন হয়।

বাচ্চা ফুটতে প্রায় ৫৩ মাস লাগে। এই ৫৩ মাস মা অক্টোপাস না খেয়ে থাকে। গভীর সমুদ্রে তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রির কাছাকাছি। এই অস্বাভাবিক কম তাপমাত্রা, গর্ত থেকে অযথা বের হয়ে শক্তি খরচ না করা মা অক্টোপাসকে বাঁচিয়ে রাখে। একসময় ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার সময় হয়। অক্টোপাস মা তার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বাচ্চাদের ডিমের ওপর বাতাস দিয়ে তাদের বের হতে সাহায্য করে। তারপর তার কাজ শেষ হয়। বাচ্চা জন্মের পরপরই মা অক্টোপাস মারা যায়। ব্রুসের টিম পরেরবার ফিরে এসে তার দেহটাকে আর কোথাও খুঁজে পায়নি।

এই কাহিনি শুধু এই বিশেষ গভীর সমুদ্রের অক্টোপাসের না, পৃথিবীর সব অক্টোপাস মায়ের। গভীর সমুদ্রের এই অক্টোপাসের ডিম ফুটতে সাড়ে চার বছর লাগে, অন্য জায়গায় হয়তো লাগে কয়েক মাস। এই সময়টা বেঁচে থাকার তাগিদে অনেক সময় মা অক্টোপাসকে নিজের পা ছিঁড়ে খেতে দেখা গেছে, তবু সে বাসা ছেড়ে যায়নি।

Octopus mothers may **eat one of her own arms** to stay alive while protecting her eggs.

During the 40 days it takes for octopus eggs to hatch, mothers *will not leave* the eggs, not even to eat.

Source: Earth Unplugged

বউয়ের আঁচল তলে

নাঈম হোসেন ফারুকী

গভীর সমুদ্রে যে জায়গাটায় এক ফোঁটাও সূর্যের আলো পৌঁছে না, তার নাম মিডনাইট জোন। সেখানে অসহ্য চাপ, মানুষের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সেখানে যেতে হলে আপনাকে চড়তে হবে খুব শক্তপোক্ত একটা সাবমারসিবলে। আজকে সাবমারসিবলের গল্প বলতে ইচ্ছা করছে না, আজকে আমরা দেখে আসব তার জানালা দিয়ে যেসব ভয়ংকর দানবদের দেখা যায় তাদের একজনকে।মিডনাইট জোনে ঘুটঘুটে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে বায়োলুমিনেসেন্ট প্রাণীদের আলো। বিরাট বিরাট হেডলাইট জ্বালিয়ে মাছের দল সেখানে চষে বেড়াচ্ছে শিকারের খোঁজে।

জেলিফিশ সেখানে ঝাড়বাতির মতো তীব্র আলোর

ঝলক দেখিয়ে পালাচ্ছে শিকারির চোয়াল থেকে। ভ্যাম্পায়ার স্কুইডের রক্তলাল কাঁটাওয়ালা বাহুগুলো থেকে ঝিলিক দিচ্ছে উজ্জ্বল নীল আলো।

এই অদ্ভুত দুনিয়ায় কিছু আলোকে দেখা যাবে যেগুলো একেবারে নড়াচড়া করছে না, চুপ করে বসে আছে টেবিলের ওপর টেবিল ল্যাম্পের মতো। এদের ব্যাপারে সাবধান, আপনার বই পড়ার সুবিধার জন্য কেউ এমনি এমনি গভীর সমুদ্রে আলো জ্বেলে রাখবে না। বোকাসোকা মাছেরা অতশত বুঝে না, সহজ নিরীহ শিকার মনে করে পিছু নেয় ওই আলোর। তখন আলোর আসল চেহারা বের হয়ে আসে।

মানুষ যেমন বড়শির মাথায় কেঁচো গেঁথে মাছ ধরে, দানবীয় অ্যাংলার ফিশের নাকের ডগায় আছে তেমনি এক বড়শি। বড়শির মাথায় বাস করে অ্যাংলার ফিশের পোষা ব্যাকটেরিয়ারা। তারা আলো জ্বেলে বসে থাকে, অ্যাংলার ফিশ ওই আলো দেখিয়ে শিকারকে কাছে টানে। তার ভয়ংকর বীভৎস মুখটায় সারি সারি চোখা চোখা দাঁত, তার পেটটা বেলুনের মতো ফুলে নিজের চেয়ে বড়ো শিকার খেয়ে ফেলতে পারে, আর একেকটার সাইজ কয়েক ইঞ্চি থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। অতএব, মানুষের বাচ্চা, সাবধান!

অ্যাংলার ফিশ নানান জাতের হয়। কোনোটার বড়শিটা মশালের মতো, কোনোটার সারা শরীরে সংবেদনশীল রোম, কোনোটা ভূতের মতো সাদা ধবধবে। কিন্তু একটা ব্যাপার প্রায় সবার মধ্যেই কমন। এরা সবাই মেয়ে। বহুদিন পর্যন্ত ছেলে অ্যাংলার ফিশ বিজ্ঞানীদের কাছে বিরাট বড়ো রহস্যের মতো ছিল। শেষ পর্যন্ত তার জট খুলেছে।

অ্যাংলার ফিশদের সমাজ নারীতান্ত্রিক, নারীরা সেখানে ভয়ংকর, রোমহর্ষক, বিশাল। পুরুষরা খুব ছোটো, দুর্বল, অপুষ্ট। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে ভালো দেখে একটা বউ জোগাড় করে তার আঁচলের নিচে লুকিয়ে পড়া। পুরুষ অ্যাংলার ফিশের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল, অন্ধকার ঘুটঘুটে দানবদের রাজ্যে কারও পেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে আপ্রাণ চেষ্টা করে বউ জোগাড়ের। বউ জোগাড় হয়েছে ? গুড। ছেলে ফিশ এবার বউয়ের শরীর কামড়ে ধরে। সারাজীবনের মতো কামড়, একেবারে সুপার গ্লুর মতো বন্ধন। আস্তে আস্তে তার ঠোঁট গলে যায়। তারপর মুখ, চোখ। তার আর কোনোদিন খাবার প্রয়োজন হবে না। বউয়ের রক্তনালি থেকে আসা খাদ্য তাকে পুষ্টি জোগাবে। পাখনার আর দরকার নেই। বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আর দরকার নেই। সেগুলোও আস্তে আস্তে পচে যায়। শেষ পর্যন্ত দুইটা মাছ এক হয়ে যায়, বিশাল একটা মেয়ে মাছের সাথে লাগানো, পুরোপুরি ডেডিকেটেড, অসহায় তার স্বামী, শেষ পর্যন্ত যে কিনা ছোটো হতে হতে হয়ে যাবে একটা শুক্রাণুর থলি, তারপর হারিয়ে যাবে একদিন।
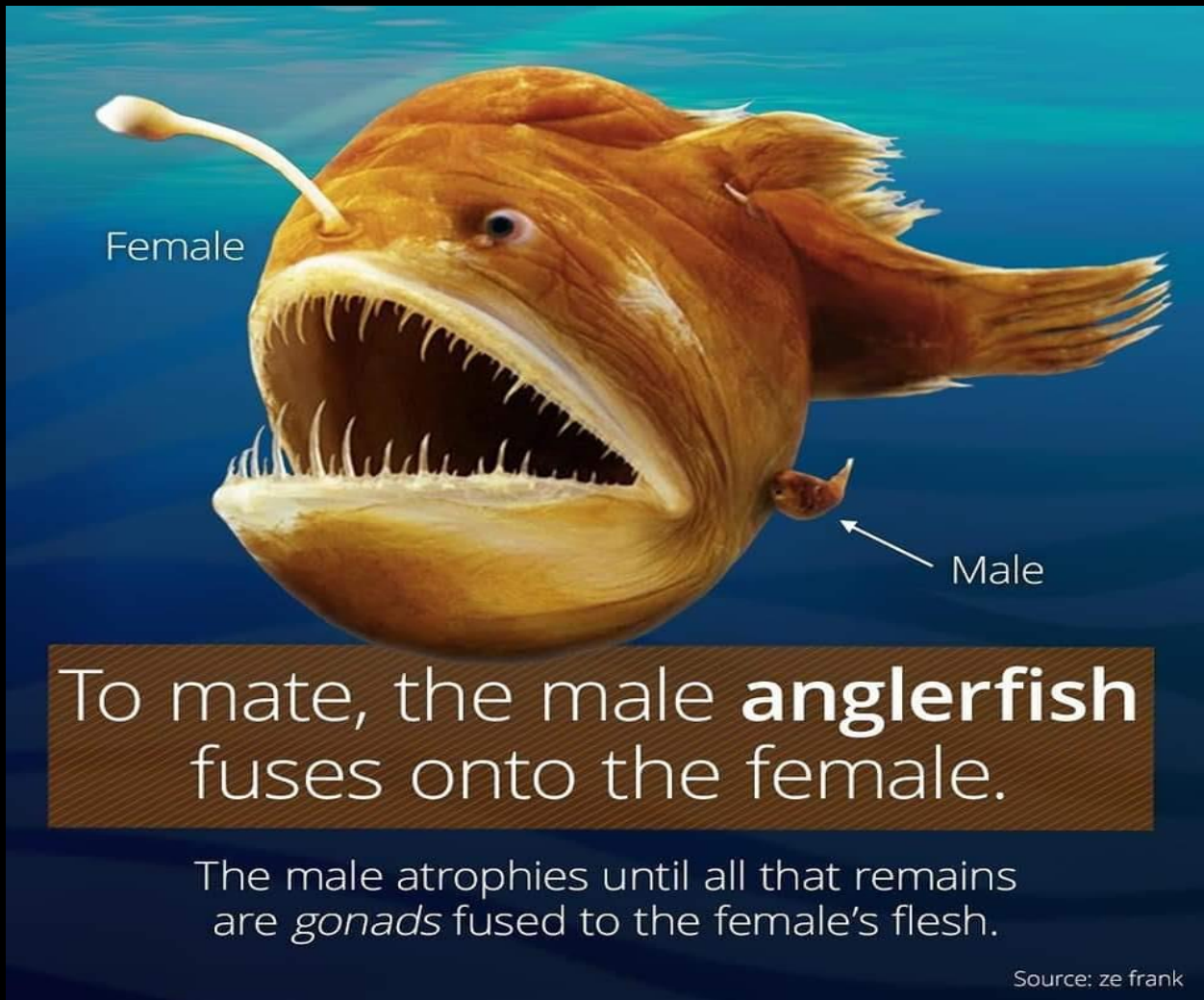
নিষ্ঠুর অ্যাংলার ফিশ একদিকে যেমন ব্যাকটেরিয়া পোষে শিকার ধরার জন্য, আরেকদিকে স্বামীও পোষে প্রজননের জন্য–একটা না, কয়েকটা !

অনেকক্ষণ হলো দুইশর ঘরে আলোচনা করছি। এবার একটু তিনশর ঘরে যাওয়া যাক। ২৭৬-৩০২ মিটারে দেখা যাচ্ছে Cockatoo Squid এবং Bottlenose Dolphin ।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ

সালমান আহমেদ

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি ছোটো প্রবাল দ্বীপ। এটি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ হতে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে ও মায়ানমার-এর উপকূল হতে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সমুদ্রপ্রেমিদের কাছে এটি ব্যাপক পরিচিত একটি নাম।

কবে প্রথম এই দ্বীপটিকে মানুষ শনাক্ত করেছিল তা জানা যায় না। প্রথম কিছু আরব বণিক এই দ্বীপটির নামকরণ করেছিল জিঞ্জিরা। উল্লেখ্য, এরা চট্টগ্রাম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াতের সময় এই দ্বীপটিতে বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করত। কালক্রমে চট্টগ্রাম এবং তৎসংলগ্ন মানুষ এই দ্বীপটিকে জিঞ্জিরা নামেই চিনত। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কিছু বাঙালি এবং রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ এই দ্বীপে বসতি স্থাপনের জন্য আসে। এরা ছিল মূলত মৎস্যজীবী। যতটুকু জানা যায়, প্রথম অধিবাসী হিসাবে বসতি স্থাপন করেছিল ১৩টি পরিবার। এরা বেছে নিয়েছিল এই দ্বীপের উত্তরাংশ। কালক্রমে এই দ্বীপটি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়। আগে থেকেই এই দ্বীপে কেয়া এবং ঝাউগাছ ছিল। সম্ভবত বাঙালি জেলেরা জলকষ্ট এবং ক্লান্তি দূরীকরণের অবলম্বন হিসাবে প্রচুর পরিমাণ নারিকেল গাছ এই দ্বীপে রোপণ করেছিল। কালক্রমে পুরো দ্বীপটি একসময় 'নারিকেল গাছ প্রধান' দ্বীপে পরিণত হয়। এই সূত্রে স্থানীয় অধিবাসীরা এই দ্বীপের উত্তরাংশকে 'নারিকেল জিঞ্জিরা' নামে অভিহিত করা শুরু করে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ব্রিটিশ ভূ-জরিপ দল এই দ্বীপকে ব্রিটিশ-ভারতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে। ।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এ দ্বীপের তিন দিকের ভিত শিলা যা জোয়ারের সময় তলিয়ে যায় এবং ভাটার সময় জেগে ওঠে। এগুলোকে

ধরলে এর আয়তন হবে প্রায় ১০-১৫ বর্গকিলোমিটার। এ দ্বীপটি উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ৫.৬৩ কিলোমিটার লম্বা। দ্বীপের প্রস্থ কোথাও ৭০০ মিটার, আবার কোথাও ২০০ মিটার। দ্বীপটির পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সাগরের অনেক দূর পর্যন্ত অগণিত শিলাস্তূপ আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের গড় উচ্চতা ৩.৬ মিটার।

সেন্ট মার্টিনের পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার প্রবালপ্রাচীর।

ভৌগোলিকভাবে এটি তিনটি অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশকে বলা হয় নারিকেল জিঞ্জিরা বা উত্তরপাড়া। দক্ষিণাঞ্চলীয় অংশকে বলা হয় দক্ষিণপাড়া এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিস্তৃত একটি সংকীর্ণ লেজের মতো এলাকা এবং সংকীর্ণতম অংশটি গলাচিপা নামে পরিচিত।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপটির ভূ-প্রকৃতি প্রধানত সমতল। তবে কিছু কিছু বালিয়াড়ি দেখা যায়। এ দ্বীপটির প্রধান গঠন উপাদান হলো চুনাপাথর। দ্বীপটির উত্তরপাড়া এবং দক্ষিণপাড়া দুজায়গারই প্রায় মাঝখানে জলাভূমি আছে। এগুলো মিঠা পানি সমৃদ্ধ এবং ফসল উৎপাদনে সহায়ক। দ্বীপটিতে কিছু কৃষি উৎপাদন হয়ে থাকে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে প্রায় ৬৬ প্রজাতির প্রবাল, ১৮৭ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ১৫৩ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল, ১৫৭ প্রজাতির গুপ্তজীবী উদ্ভিদ, ২৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, চার প্রজাতির উভচর ও ১২০ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে পেজালা নামে পরিচিত Sea weeds বা অ্যালগি (Algae) এক ধরনের সামুদ্রিক শৈবাল সেন্ট মার্টিনে প্রচুর পাওয়া যায়। এগুলো বিভিন্ন প্রজাতির হয়ে থাকে, তবে লাল অ্যালগি (Red Algae) বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয়। এছাড়াও রয়েছে ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে স্পঞ্জ, শিল কাঁকড়া, সন্ন্যাসী শিল কাঁকড়া, লবস্টার ইত্যাদি। মাছের মধ্যে রয়েছে পরী মাছ, প্রজাপতি মাছ, বোল করাল, রাঙ্গা কই, সুঁই মাছ, লাল মাছ, উড়ুক্কু মাছ ইত্যাদি। সামুদ্রিক কচ্ছপ, সবুজ সাগর কাছিম এবং জলপাইরঙা সাগর কাছিম প্রজাতির ডিম পাড়ার স্থান হিসেবে জায়গাটি খ্যাত।

দ্বীপে কেওড়া বন ছাড়া প্রাকৃতিক বন বলতে যা বোঝায় তা নেই। তবে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে প্রচুর পরিমাণে কেওড়ার ঝোপ-ঝাড় আছে। দক্ষিণ দিকে কিছু ম্যানগ্রোভ গাছ আছে। অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে কেয়া, শ্যাওড়া, সাগরলতা, বাইন, নারিকেল গাছ ইত্যাদি।

DEADLY KING OF WORM

নূর-এ নাঈম শান্ত

সমুদ্র, এক বিশালতার নাম। এক উদারতার নাম। এক দুর্বোধ্যতার নাম। এক সৌন্দর্যের মহিমাময়ী নাম। এক কুৎসিতের সীমা ছাড়ানো নাম। কী নেই এখানে ? এখানে আছে চোখজুড়ানো সৌন্দর্য নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মাছ। আবার এমন মাছও আছে যা দেখলে মনের বেখেয়ালেই বমি এসে যায় ! সুস্বাদু মাছেরও কমতি নেই এখানে। তবে এর আচরণ বড়োই দুর্বোধ্য। যাহোক, আমি কোনো মাছ বা সরীসৃপের গল্প নিয়ে আজ এখানে আসিনি। আসুন, ঘুরে আসি, এক পিচ্চি মাছ হয়ে; দেখে আসি অদ্ভুত, ভূতুড়ে সেই জগতের প্রাণীটাকে।

মনে করুন, আপনি একটি পিচ্চি বাটারফ্লাই ফিশ। সাধারণত খুব প্রয়োজন ছাড়া তলদেশের দিকে যান না। মাঝের দিকে ঘুরঘুর করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আজ বন্ধুদের সাথে রাগ করে দলছুট হয়ে গেলেন। ঘোরাফেরা করছেন একা একা। (পিছনে লুকিয়ে আমিও আসছি) চারপাশে কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ একসাথে তিনটা শার্কের ধাওয়া খেয়ে এসে পড়লেন একেবারে তলদেশে। ধাওয়া থেকে বাঁচতে অনেক শক্তি হলো শেষ। ক্ষুধায় পেটে যেন আগুন লেগেছে; তার ওপর ইঁদুর দৌড়াচ্ছে। সমুদ্রের এই জগতে তাদের (ছোটো মাছের) রাগের কোনো জায়গা নেই। কেউ নিজ জীবনে রাগকে জায়গা দিতে চাইলে তাকে নিজের জায়গাই ছেড়ে দিতে হয়। এই তলদেশে পৌঁছানোর পর তাদের একমাত্র খাদ্য আপনার ইট-পাথরের পিছনে লুকিয়ে থাকা পোকা-মাকড়। আপনি জানেন, এখানে আপনাকে শিকার হিসেবে দেখছে অনেকগুলো প্রাণী। তবুও ক্ষুধার কাছে সবকিছুরই তো হার। তাই একেবারে বালুর সাথে গা এলিয়ে খুব ধীরে ধীরে খাবার খুঁজছেন। হঠাৎ দেখলেন এই বালুর মধ্যে দিয়েই বেরিয়ে এলো কোনো একটা অদ্ভুতুড়ে জীব। ভাবলেন, অদ্ভুতুড়ে কোনো মাছ এসেছে। কিছু বোঝার আগেই এক কামড়ে আপনাকে অবশ করে টেনে নিয়ে গেল এমন এক জায়গায় যেখানে খুব বেশি জীব যায়নি আর যারা গেছে তারা কখনোই ফিরে আসেনি। গর্তের ভিতরে গিয়ে আপনাকে দুই খণ্ড করে ফেলল খুব দ্রুত এবং পেটেও পুরল সাথে সাথে। কিন্তু না, মাছটার পেট থেকে নিচে নামা শুরু হয়েছে, এ যেন থামছেই না ! আপনি যেহেতু ছোটো একটা বাটারফ্লাই ফিশ, মনে হবে, শেষই হবে না যেন এর পেট। কিন্তু ভাবনার কথা হলো এর পেটের ভিতর যেন মিলছেই না স্যারের পড়ানো সেই লেকচারের সাথে। আপনি শুধু বুঝতে পারলেন আর যাই হোক না কেন কোনো মাছ বা

সরীসৃপ হতে পারেই না! এই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই পেটের মাঝে মিলিয়ে গেলেন আপনি।

হ্যাঁ, ওটা কোনো মাছ বা সরীসৃপ ছিল না মোটেই। তাহলে কী ছিল সেটা? !

নাম 'Bobbit Worm'(ববিট ওয়ার্ম) ! নাম থেকেই বুঝে যাচ্ছে এটা একটি কৃমি। আপনি যদি পাঁচ ফুটের হন তাহলে ববিট ওয়ার্ম আপনার থেকে দ্বিগুন বড়ো হতে পারে প্রায় ১০ ফুট (৩ মিটার)। ভয়ংকর নিশাচর প্রাণী, যার গর্তে একবার কোনো কিছু গেলে তা ফিরে আসার কোনো ইতিহাস নেই।

নামকরণ :

ববিট ওয়ার্মের নামকরণ নিয়ে আছে একটি করুণ ইতিহাস। Gary Williams এবং Terry Gosliner তাদের পিএইচডি রিসার্চ পেপারে এই নাম উল্লেখ করেন। এখানে এটা উল্লেখ্য যে 'worm' হচ্ছে প্রজাতিগত নাম। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 'লরেন ববিট' নামক এক মহিলা ধারালো ছুরি দিয়ে ওনার ঘুমন্ত স্বামীর দেহের স্পর্শকাতর অঙ্গে আক্রমণ করেন যা তখনকার সংবাদ মাধ্যমগুলোর হেডলাইনে পরিণত হয়েছিল। মহিলাটির এই নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড আর ববিট ওয়ার্মের তার শিকার করা প্রাণীকে নিমিষেই শিকার, গর্তে নিয়ে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলার মধ্যেই যেন ভয়ংকর একটি মিল দেখতে পেয়েছিলেন তারা। তাই হয়তো তারা প্রাণীটির নামকরণের ক্ষেত্রে 'ববিট' নাম ব্যবহার করেন।

ওয়েট, ওয়েট, নামকরণের ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। এই নামকরণ থেকেই ছড়িয়ে পড়ে আরেকটা মিথ। মিথটি হলো : "একটি স্ত্রী ও পুরুষ ববিট ওয়ার্ম সঙ্গী হওয়ার পর স্ত্রী ওয়ার্মটি পুরুষ ওয়ার্মের স্পর্শকাতর অঙ্গ কেটে ফেলে যার কারণে ববিট নাম দেওয়া হয়েছে।"

মিথ খণ্ডন : আদতে এমন কোনো ঘটনা ঘটে না, এমনকি ঘটার কোনো চান্সই নেই। পলিচাইট এক্সপার্ট Leslie M. Harris জানান :

"First off, Polychaetes don't have penises or vaginas. Most of them are what we call broadcast spawners which means the males & females spew out eggs & sperm into the water. The eggs & sperm meet, the eggs get fertilized & start developing. There is no such thing as mating/copulation not do males & females come into contact. Only a very few species exhibit parental care which is minimal. It consists of the female creating a mucus cocoon for the eggs & keeping it clean or brooding the eggs within her own tube. Some species of Marphysa (which are in the same family as the genus Eunice) produce egg cocoons. Females do not care for larvae or juveniles & they certainly do not feed them."

যাকগে, চোখ দিয়েই শুরু করা যাক। এই নিয়েও অনেকের ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন, ববিট ওয়ার্মদের কোনো চোখই নেই ! এদের এক জোড়া চোখ আছে বটে, তবে দৃষ্টিশক্তি খুব একটা কাজের না। তাহলে কীভাবে শিকার করে এরা ? দৃষ্টিশক্তি কম হলেও তার জন্য ববিট ওয়ার্মদের আছে পাঁচটি শক্তিশালী অ্যান্টেনা ! আর ঘ্রাণশক্তিও ভালো, যা তাকে শিকার ধরতে সাহায্য করে। কোনো মাছ যদি কাছাকাছি থাকে তবে অ্যান্টেনার মাধ্যমে সেটা তারা বুঝে যায়। এদের ঘ্রাণশক্তি ভালো হওয়ায় কোনো নেগেটিভ কিছু সামনে এলে শিকারেও সাহায্য করে। ঘ্রাণশক্তি আর অ্যান্টেনা একে খুব ভালো শিকারি করে তুলেছে। ববিট ওয়ার্মরা তলদেশের বালুর মধ্যে সম্পূর্ণ দেহ লুকিয়ে রাখে। বাইরে থাকে শুধুমাত্র এই অ্যান্টেনাগুলো। এই অ্যান্টেনার বেইজেই থাকে এক জোড়া চোখ। আশেপাশে শিকার আছে এটা টের পেলেই ক্ষিপ্রতার সাথে মাথা বের করে ফেলে। অ্যান্টেনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশানুযায়ী চলে যায় শিকারের খুব কাছাকাছি। এরপর মুখ বড়ো করে হা করে এবং বের হয়ে কাঁচির মতো দেখতে চোয়াল। নিমিষেই কামড় বসায় শিকারের গায়ে। সাময়িকভাবে অবশ করার জন্য এরা বিষ ব্যবহার করে। সাধারণত ওয়ার্মদের দাঁত থাকে না। এদের থাকে শক্তিশালী মাংসল মুখ। একে বলে Pharynx, কিন্তু ববিট ওয়ার্মের দুটি সুঁইয়ের মতো ধারালো দাঁতও আছে, যা দিয়ে শিকারকে এরা খুব সহজেই দ্বিখণ্ডিত করে।

এদের দেহ নলাকার এবং লম্বা। এপিথেলিয়াম নিঃসৃত পাতলা কিউটিকলে আবৃত। আংটির মতো অনেকগুলো একই রকম খণ্ডক নিয়ে দেহ গঠিত। এদের চলন অঙ্গ কাইটিনময় সিটি বা পেশল প্যারাপোডিয়া। দেহের খণ্ডকে অবস্থিত নেফ্রিডিয়া নামক প্যাঁচানো নালিকা প্রধান রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। দেহ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং প্রকৃত সিলোমযুক্ত। পৌষ্টিকনালি নলাকার ও সম্পূর্ণ; মুখ ও পায়ুছিদ্র সমন্বিত। রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির। রক্তরসে হিমোগ্লোবিন, হিমোএরিথ্রিন অথবা ক্লোরোক্রুয়োরিন দ্রবীভূত থাকে। দলবল বেঁধে থাকতে কখনোই দেখা যায় না। ববিট ওয়ার্মের দেহের উভয়পাশে বড়ো বড়ো কাঁটা থাকে। এগুলো এমনভাবে সাজানো যে মনে হয় দুটো করে কাঁটাযুক্ত মাংস এক এক করে সাজানো হয়েছে।

ববিট ওয়ার্মের মস্তিষ্ক থাকে না এমন একটি তথ্য প্রচলিত আছে। এটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়, আবার একেবারে ভুলও নয়। তাদের গ্যালিংওন বলে কিছু আছে যা হলো একটি স্নায়ুতন্ত্রীয় ক্লাস্টার। এদের কেন্দ্রীভূত স্নায়ুতন্ত্র ও জটিল সংবহনতন্ত্র বিদ্যমান। এদের কোনো পা থাকে না। সাপের মতো এগিয়ে চলতে পারে এরা। এরা প্রধানত মাংসাশী। ছোটো ছোটো মাছ, অন্যান্য কীট এমনকি ওয়ার্ম যেমন : detritus, seaweed, এবং অন্যান্য macroalgae ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বাগে পেয়ে গেলে অক্টোপাসকেও ছাড়ে না। তবে খাদ্যাভাবে পড়লে এরা নিজ ডেরা থেকে বের হয়ে আসে এবং শিকার খুঁজতে থাকে। এরপরও খাবার না পেলে এরা সাগরের উদ্ভিদ খেয়ে

থাকে। অর্থাৎ এরা 'ওমনিভরাস' প্রাণী, যারা প্রাণী ও উদ্ভিদ দুটোই খেতে পারে। মানুষও ওমনিভরাস।

যেহেতু ববিট ওয়ার্ম বের হয়ে গেল তার গর্ত থেকে, সেহেতু ভাবতে হয় তার শিকারিদের নিয়ে ! আসলে সত্যি বলতে কী, প্রাপ্তবয়স্ক ববিট ওয়ার্মদের কোনো শিকারি নেই। তবে ছোটো ববিট ওয়ার্মদের একঝাঁক ছোটো মাছ হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। So stay home, stay safe. এছাড়া তাদের শরীর অসংখ্য ব্রিস্টল দিয়ে গঠিত, তাই কখনোই কোনো ববিট ওয়ার্মকে স্পর্শ করা উচিত নয়।

বংশবিস্তার :

এখন প্রশ্ন হলো একটা বেবি ববিট ওয়ার্মের কোনো বাসা আছে কি ? প্রথমেই বলেছিলাম, ববিট ওয়ার্মরা ডিম পাড়ে এবং তা ভেসে যেতে দেয়। এরপর কোথায় কী হচ্ছে তার কোনো খেয়াল রাখে না আদৌ। মায়ের সাথে বাচ্চার কখনো দেখা হওয়ার চান্স তাই খুবই কম। ভেসে যাওয়া বেশিরভাগ ডিম প্লাঙ্কটনিক হয়ে থাকে। কিছু থেকে যায় ওয়ার্ম টিউবের সাথে আবার কিছু কোনো গর্ত বা জেলি জাতীয় জিনিসে আটকে যায়। ডিমগুলো Trocofora (ভাসমান) লার্ভায় পরিণত হয়। পরে তা থেকেই আসে বেবি ববিট ওয়ার্ম।

এবার যেতে যেতে ৪৭২ মিটার থেকে ৪৭৮ মিটার রেঞ্জে যখন এলাম, তখন দেখি দুটো পরিচিত মাছ ঘোরাফেরা করছে। একটাকে বলে 'Big Eye Tuna' আরেকটি হলো 'Chinhook Salmon'.

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

লোকালয়ে ববিট ওয়ার্ম :

যাহোক, এরা যে শুধু সমুদ্রেই থাকবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন ধরেন, যুক্তরাজ্যের নিওকাস ব্লু রিফ অ্যাকুয়েরিয়মে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেখানকার একটি রিফ ডিসপ্লে ট্যাঙ্কে একটি ববিট ওয়ার্ম ঢুকে গিয়েছিল। অ্যাকুয়েরিয়মের স্টাফরা লক্ষ করলেন, কোনো এক অদ্ভুত কারণে সেখানকার মাছ ও কোরালগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে। তারা বেশ কয়েকটি আহত মাছও খুঁজে পেল। অ্যাকুয়েরিয়মে লুকিয়ে পড়ায় কারো কোনো ধারণাই ছিল না কে করছে এসব। পরবর্তীতে তারা এই অজ্ঞাত প্রাণীটিকে ধরার জন্যে ফাঁদ পেতেছিল এবং ববিট ওয়ার্মটি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছিল। এদের খুব কাছাকাছি চলে গেলে এরা আপনাকেও কামড়াতে পারে তার আত্মরক্ষার জন্য। এটা একেবারে প্রাণঘাতী না হলেও বেশ ক্ষতি করতে পারে।

যদি আপনার ক্ষতি করে :

কোনোভাবে ভুলবশত আপনার বাসায় এরা ঢুকে পড়তেই পারে ! এখন প্রশ্ন হলো, এদের মারা যায় কীভাবে? ওয়েল, এদের মারতে তেমন কিছুই লাগে না। একটা লাঠি হাতে নিন এবং এর মাথা বের করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এবং মেরে ফেলুন। তাদের শরীর অসংখ্য ব্রিস্টল দিয়ে গঠিত, তাই কখনোই কোনো ববিট ওয়ার্ম স্পর্শ করা উচিত নয়। যদি এই ব্রিস্টলগুলির একটি ত্বকের মধ্যে ছিদ্র করে, তাহলে স্থায়ী স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে।

মৃত্যু :

ববিট ওয়ার্মরা সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছরের মতো বাঁচতে পারে। এরপর তারা এমনিতেই মারা যায়। বেবি ওয়ার্মদের অনেক সময় অবশ্য স্ট্রাগল করতে করতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

কিছু এলোমেলো তথ্য দিয়ে শেষ করা যাক।

বৈজ্ঞানিক নাম : *Eunice aproditiois*

পূর্বপুরুষ : *Websteroprion armstrongi* (যাদের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ওয়ার্ম বলে ধারণা করা হয়)।

ববিট ওয়ার্মরা প্রধানত অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে বাস করে। এছাড়া ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলেও এদের দেখা যায়। এরা 'অ্যানেলিডা' পর্বের প্রাণী। এরা প্রধানত মাংসাশী তবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে নিরামিষও খায়। এরা সাধারণত নিশাচর। উষ্ণ পানিপ্রীতি রয়েছে এদের। এরা ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হলেও প্রস্থে মাত্র ১ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এরা সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এরা জলজ প্রাণী হলেও পানি ছাড়াও কিছুদিন টিকে থাকতে পারে। এদের দেহ যেন একবারে রঙের মিশেল ! এদের অ্যান্টেনা ৫টি ও বিভিন্ন রঙের। এরা সমুদ্র তলদেশে গর্ত করে থাকে বলে এদের 'Sand stiker' ডাকা হয়। এছাড়া এদের আচরণ ও ক্ষিপ্রতার জন্য এদের বলা হয় 'ওয়ার্মদের টি-রেক্স' ! হরর ছবি Tremors-এ দেখানো প্রাণীটি ববিট ওয়ার্মদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি করা হয়েছে। 'ব্লু প্লানেট টু' ডকুমেন্টারিতে এর আগমনে এটি যেন হরর মুভিতে পরিণত হয় !

উত্তর মহাসাগরের জীববৈচিত্র্য

ইমদাদুল হক মিলন

এটি সবচেয়ে ছোটো, শীতল এবং অগভীর মহাসাগর। IHO (International Hydrographic Organisation) এটাকে মহাসাগর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যদিও কিছু সমুদ্রবিজ্ঞানী একে সমুদ্র বা সাগর বলে থাকেন। এটি ইউরেশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মাঝে বিস্তৃত। 'Arctic' নাম এসেছে গ্রিক শব্দ 'Arktikos' থেকে যার অর্থ 'near the bear' বা ভাল্লুকের কাছে অথবা 'northern' বা উত্তর। 'Arktikos' এসেছে 'arktos' থেকে যার অর্থ 'bear' বা ভাল্লুক। এর গড় গভীরতা ১,০৩৮ মিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা ৫,৫৫০ মিটার বা ১৮,২১০ ফুট (Molloy hole)। এর অ্যারিয়া ১৪,০৫৬,০০০ বর্গকিলোমিটার।

আর্কটিকের জীবসমূহ হলো : পোলার বিয়ার, ওয়ালরাস, স্পঞ্জ, লবস্টার, পুফফিন, কিলার হোয়েল, স্কুইড, steller sea cow ইত্যাদি।

I. Bowhead whale (বোহেড হোয়েল) :

এর বৈজ্ঞানিক নাম Balaena mysticetus। এটি 'Balaena' গণের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি। Baleen whale দের মধ্যে এরাই কেবল আর্কটিক ও সাব-আর্কটিক পানিতে স্থানীয়। এদের ত্রিকোণাকার খুলির কারণে এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'Bowhead whale'। প্রাণীদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়ো মুখগহ্বরের অধিকারী। এদের শরীরের এক-তৃতীয়াংশের সমান লম্বা মুখগহ্বর থাকে। এরা ৪ মিটার অবধি লম্বা হয়। এদের শরীরের রং কালো, নিচের চোয়ালের রং সাদা। জোড়া নাসারন্ধ্র থাকে, টাকরার হাড় যে-কোনো তিমির থেকে বড়ো। প্রায় ৩ মিটার লম্বা টাকরার হাড় পানি থেকে যে-কোনো ছোটো শিকার টেনে আনতে সক্ষম। এর চর্বিস্তর ৪৩-৫০ সে.মি. পুরু হয়। এদের ব্রিডিং সিজন মার্চ থেকে আগস্ট।

II. Narwhal (নারহোয়াল):

এরা গ্রিনল্যান্ড, কানাডা, রাশিয়ার আর্কটিক পানিতে থাকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম Monodon monoceros। লম্বা, সোজা, স্ক্রুর ন্যায় দাঁত দেখে পুরুষদের আলাদা করা যায়। এই দাঁতের ভর প্রায় ১০ কেজি হয়। এরা ৩.৯৫-৫.৫ মিটার অবধি লম্বা হয়। পৃষ্ঠদেশীয় পাখনা নেই। পুরুষরা ১১-১৩ বছরে এবং নারীরা ৫-৮ বছরে সেক্সুয়ালি ম্যাচিউরড হয়। শীতে পুরুষরা ১৫০০ মিটার গভীরতা অবধি সাঁতার কাটে। প্রায় ৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে এরা।
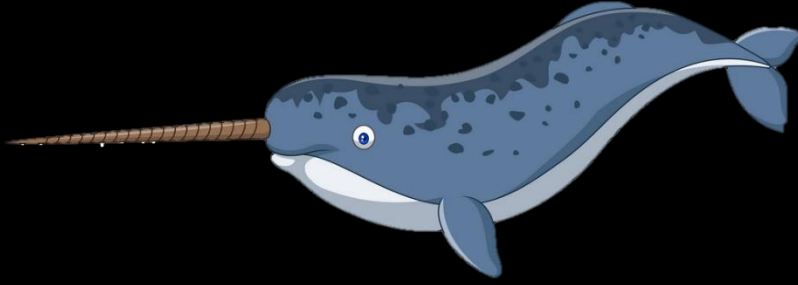
কাঁকড়া আর মাকড়শার পায়ের সম্মিলিত একটা প্রাণী আছে। নাম 'Spider Crab' । এর এমন নামের পিছনে কারণ হলো এই কাঁকড়ার মাকড়সার মতো লম্বা লম্বা পা আছে। এমন অদ্ভুত প্রাণী দেখতে হলে ৬৩৭ মিটারে যেতে হবে।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ

অঙ্কন: রওনাক আহমেদ সামিন

জানা-অজানা:

স্কুবা ডাইভিং তো শুনেছেন আপনারা, তাই না ? মানুষের পক্ষে এ পর্যন্ত সমুদ্রে স্কুবা ডাইভ করে সর্বোচ্চ যে গভীরতায় যাওয়া সম্ভব হয়েছে তা হলো ৩৩২ মিটার। ২০১৪ সালে করা এই রেকর্ডের মালিক আহমেদ গাবর। মিশরের অধিবাসী এই লোকটি আরব সাগরে ডাইভ দিয়ে এত দূরে চলে যান এবং ফিরে আসেন।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

সমুদ্রঝড়/ঘূর্ণিঝড়ের আদ্যোপান্ত

আবু রায়হান

১।
সাগর যেমন অসীম সম্পদের ভান্ডার, ঠিক তেমনই সাগর সর্বনাশা হয়ে হাজির হতেও জানে। সাগরের সেই সর্বনাশা রূপেরই একটি বহিঃপ্রকাশ হলো ঘূর্ণিঝড়।
আর আমরা হলাম পৃথিবীর অন্যতম ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চলের বাসিন্দা।

ভূমিকা দীর্ঘায়িত করব না।
তো, দেরি না করে চলুন জেনে নিই ঘূর্ণিঝড়ের নাড়িভুঁড়ি সম্বন্ধে।
ধৈর্য ধরে না পড়লে সব মাথার ওপর দিয়ে যাবে।

ঘূর্ণিঝড় কীভাবে হয় সেটা বোঝার আগে কর্কটক্রান্তি রেখা, মকরক্রান্তি রেখা, উত্তর গোলার্ধ, উত্তর মেরু, দক্ষিণ গোলার্ধ, দক্ষিণ মেরু এসব চেনা প্রয়োজন। এসব চিনতে নিচের চিত্রে ভালোভাবে খেয়াল করুন, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে।
আমরা জানি, পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টনকারী কাল্পনিক কর্কটক্রান্তি রেখা ও মকরক্রান্তি রেখার অক্ষাংশ একই কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখা হলো পৃ্থিবীর নিরক্ষ/বিষুবরেখার উত্তরে আর মকরক্রান্তি রেখা বিষুবরেখা থেকে দক্ষিণে। সূর্যের আলো এই রেখাব্যাপী লম্বভাবে কিরণ দেয়।

ডিসকভারি চ্যানেলে একটা প্রোগ্রাম আপনারা অনেকেই দেখেছেন। প্রোগ্রামটার নাম হলো 'Deadliest Catch' অর্থাৎ বিভিন্ন টিম সাগরে মাসের পর মাস থেকে 'King Crab' ধরে। সমুদ্রের ৭৩২ মিটার গভীরতায় যখন পৌঁছেছি তখন দেখা মিললো এই কিং ক্র্যাবের।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ

চিত্রে দেখুন-নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তি রেখা, মকরক্রান্তি রেখা।

এই দুটি রেখাব্যাপী যে অঞ্চলগুলো রয়েছে তাতে সূর্যের আলো সবচেয়ে বেশি পতিত হয়। ফলে এই অঞ্চলগুলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল/ক্রান্তীয় অঞ্চল (Tropics) বলে।
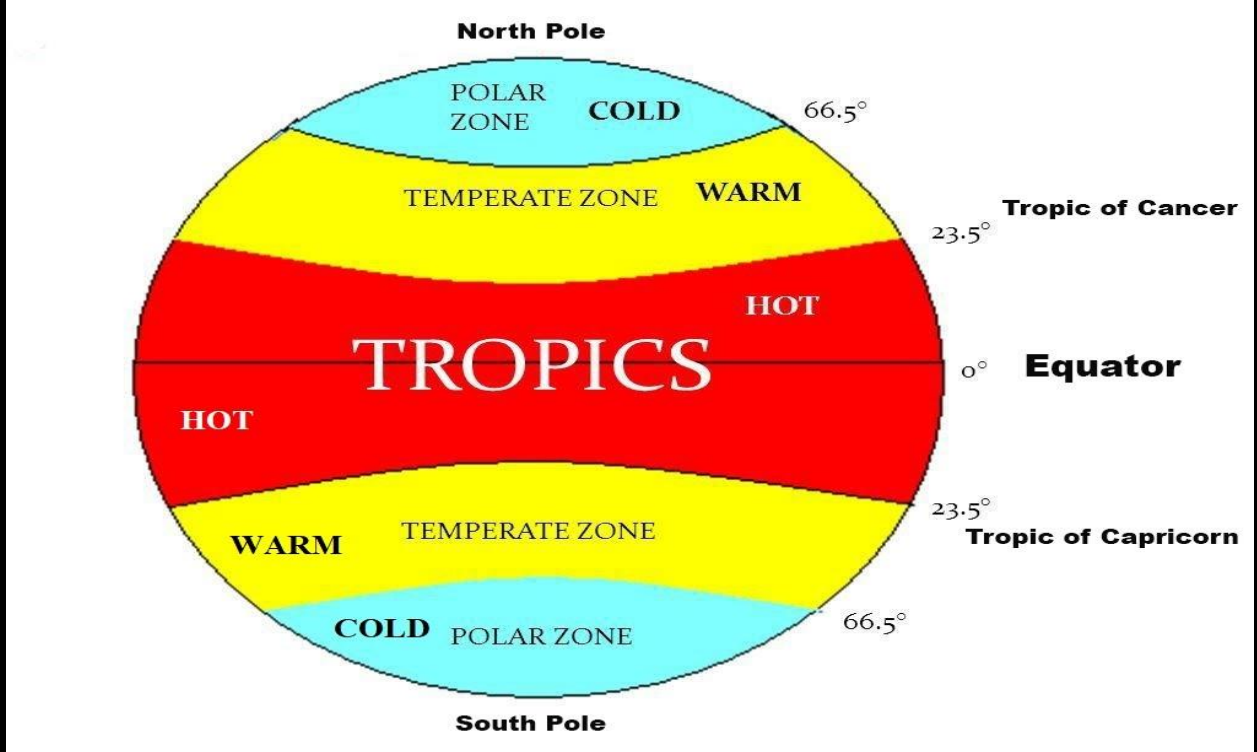
চিত্রে দেখুন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল।

এই দুই ক্রান্তিরেখার মাঝের অঞ্চলটুকু এবং এই দুটি রেখার হালকা আশেপাশের বা বাইরের অঞ্চলে সূর্যের আলো তুলনামূলক তীব্রভাবে পতিত হয়ে থাকে বা পেয়ে থাকে

কেন এ অঞ্চল অধিক উত্তপ্ত থাকে ?

আমরা জানি, লম্ব/খাড়াভাবে কোথাও সূর্যের আলো পড়লে তাতে তাপের প্রভাব বেশি থাকে, কারণ তাপ বেশি ছড়িয়ে পড়ে না। কিন্তু কোনো স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে যদি সেখানে সূর্যালোক একটু কাত/তীর্যক হয়ে পড়ে, তবে তার আলো আশেপাশের বৃহত্তর এলাকায় ছড়িয়ে যাবে। ফলে তীর্যকভাবে সূর্যালোক পড়েছে এমন এলাকা লম্বভাবে আলোকপ্রাপ্তির চেয়ে কম মাত্রায় আলো ও তাপ পাবে।

সমুদ্রে একটা গিরগিটি আছে যে কিনা ক্ষণে ক্ষণে দেহের রং বদলাতে পারে। হ্যাঁ, বলছি অক্টোপাসের কথা। এর দেখা পেতে হলে ৭৫৮ মিটার গভীরতায় চলে যেতে হবে।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।
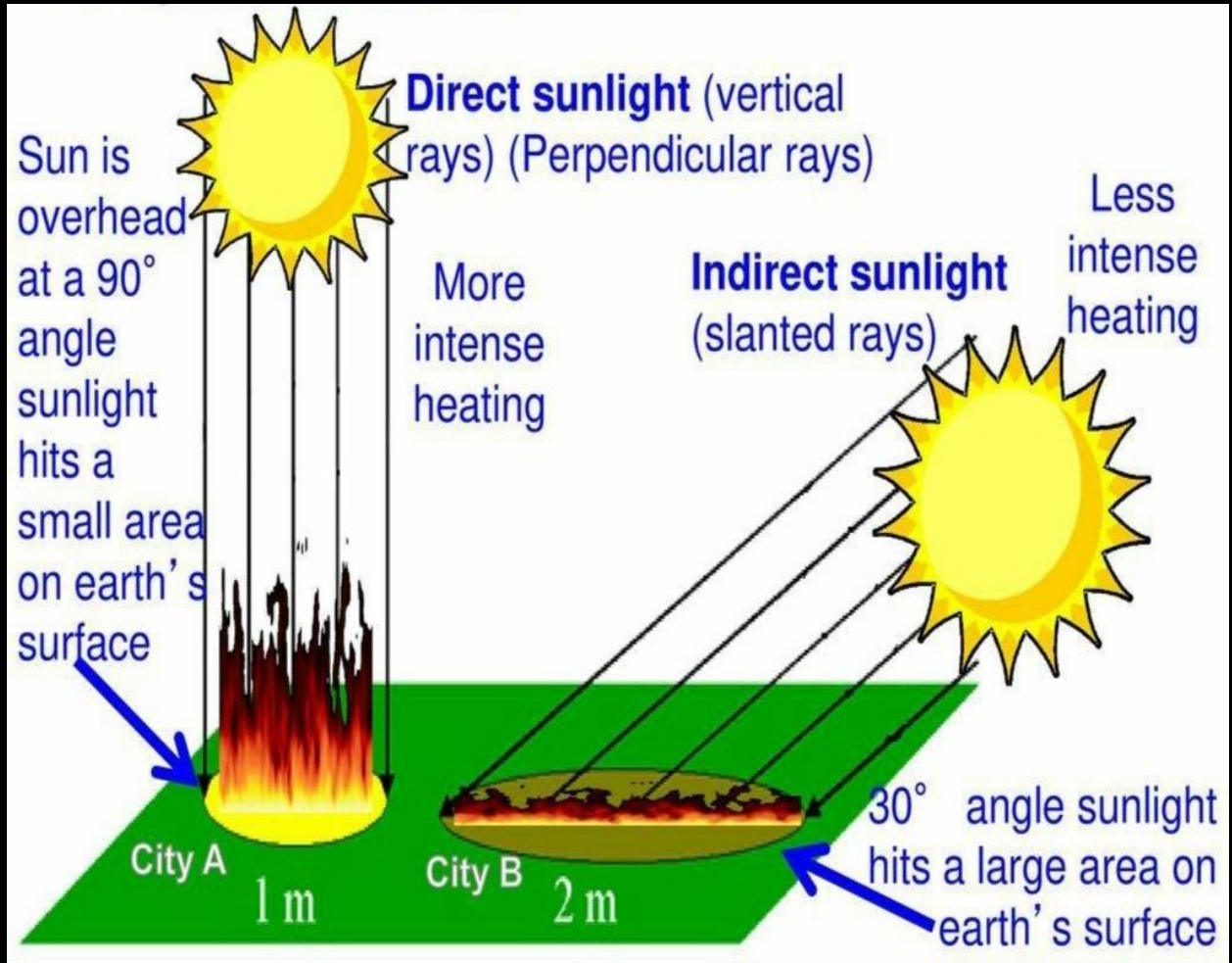
চিত্রে দেখুন ক্রান্তীয় অঞ্চলে সূর্যালোকের খাড়া পতন।

২।

Clockwise এবং Anti/ Counter Clockwise :

আমরা জানি, ঘড়ির কাঁটা সবসময় ডান থেকে বামে যায়।
ঘড়ির কাঁটা যেমন ডান থেকে বামে যায় ঠিক তেমনই যদি কেউ যায় বা গতিশীল থাকে তবে তার গতির দিককে বলি ঘড়ির কাঁটার দিক বা clockwise।

আর যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে মানে ১ থেকে ২,৩,...১১ না গিয়ে
উলটা মানে ১,১২,১১,১০...... .এভাবে যায় তবে তার গতির দিককে বলা হবে Anti বা Counter Clockwise।
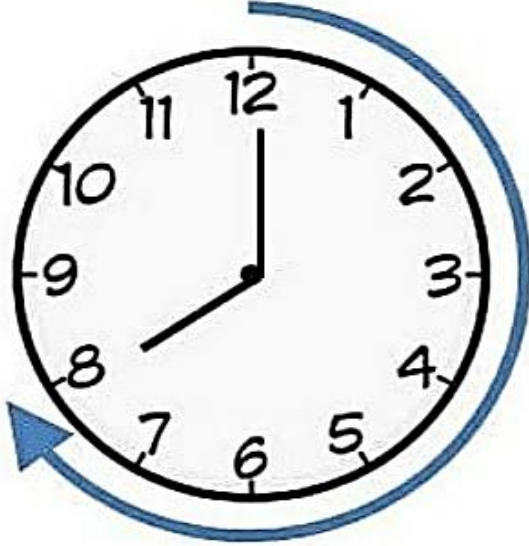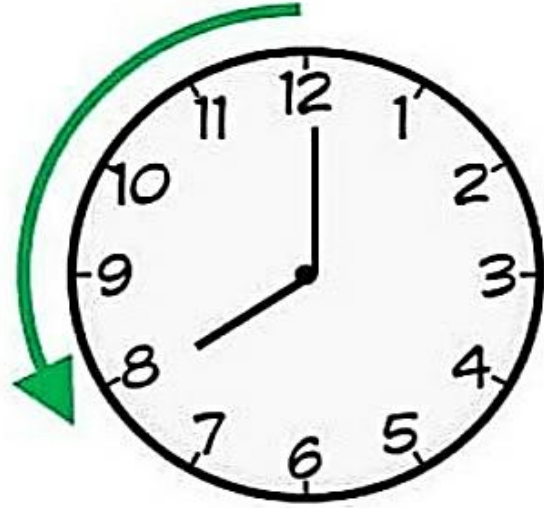
চিত্রে দেখুন ক্লকওয়াইজ, অ্যান্টিক্লকওয়াইজ।

নিম্নচাপ এবং উচ্চচাপ কী ?

এ দুটো জানার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে বায়ুচাপ কী।

বায়ুচাপ :

পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডল বেষ্টন করে আছে। পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে বায়ুমণ্ডলকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। ফলে অন্যান্য পদার্থের মতো বায়ুরও ভর অনুভূত হয়। বায়ুর এই ভরকেই বায়ুচাপ (Pressure of Air) বলে।

সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ এক বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৪.৬৯৬ পাউন্ড বা প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১ কিলোগ্রাম ভরের সমান।

যতই ওপরে ওঠা যায় বায়ুস্তরের গভীরতা ততই কম হয় (আরও ওপরে ভিন্ন রকম)। সেজন্য চাপও কমে যায়। বিভিন্ন স্থানের বায়ুর চাপের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এমনকি সকল সময়েও একই স্থানে বায়ুর চাপ সমান থাকে না।

বায়ুচাপ মূলত দুই প্রকার। যথা–

১। উচ্চচাপ (High Pressure)

২। নিম্নচাপ (Low Pressure)

উচ্চচাপ :

ভূপৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুর চাপ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা বেড়ে গিয়ে যখন সেটি ১০১৩.২৫ মিলিবারের তার বেশি হয়, তখন তাকে বায়ুর উচ্চচাপ (High Pressure) বলা হয়।

নিম্নচাপ :

ভূপৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুর চাপ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা কমে গিয়ে যদি সেটি ৯৮৬ মিলিবার বা তার কম হয়, তখন তাকে বায়ুর নিম্নচাপ (Low Pressure) বলে।

৩।

নিম্নচাপ এবং উচ্চচাপ কীভাবে সৃষ্টি হয় ?

আমরা জানি, তাপের ফলে পদার্থের কণার গতিশক্তি/কম্পনশক্তি বেড়ে যায়। যত বেশি তাপ, তত বেশি গতিশক্তি প্রাপ্তি। আর যত গতিশক্তি বাড়ে বা পদার্থের কণাগুলো যত বেশি কাঁপে তত তাদের, মানে কণাদের মাঝের আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়। আবার, বায়বীয় পদার্থ যেমন বাতাসের ওপর চাপ এবং তাপের প্রভাব উভয়ই বেশি। কোনো অঞ্চলে দীর্ঘক্ষণ সূর্যের তাপ পড়লে তাপের উষ্ণতায় সেখানকার বাতাস তাপশক্তি পেয়ে বায়ুর কণাগুলোর গতিশক্তি বেড়ে যায়। কণাগুলোর কম্পন বৃদ্ধি পেয়ে তাদের ছুটাছুটি বেড়ে যায়। ফলে বাতাস প্রসারিত ও হালকা হয় এবং সেখানকার বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়। ফলে এটি আশেপাশের বায়ুর চেয়ে তুলনামূলক অধিক হালকা হওয়ায় হালকা বায়ু ওপরে উঠতে থাকে এবং আশেপাশের ও উপরিস্তরের তুলনামূলক ভারী, ঠান্ডা বায়ু নিচে নামতে থাকে বা চারপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে ছুটে আসতে থাকে। আর নিম্নচাপ অঞ্চলের সে হালকা বায়ুর চাপও কম হয় কারণ বায়ুর ঘনত্ব তাতে তুলনামূলক কম।

অর্থাৎ যে অঞ্চলে অত্যধিক তাপ পতিত হয় সেখানকার বায়ুর চাপ কম হয়ে যায়। আর সে পরিবেশে বায়ুর সে কম চাপীয় অবস্থাকে বায়ুর নিম্নচাপ বলে।

আবার, সমুদ্র সমতল থেকে যতই ওপরে ওঠা হয় ততই বায়ুস্তরের গভীরতা কমতে থাকে। তাই বায়ুর চাপও কমে যায়। এই বিষয়গুলো জেনে রাখেন, সামনে কাজে আসবে।
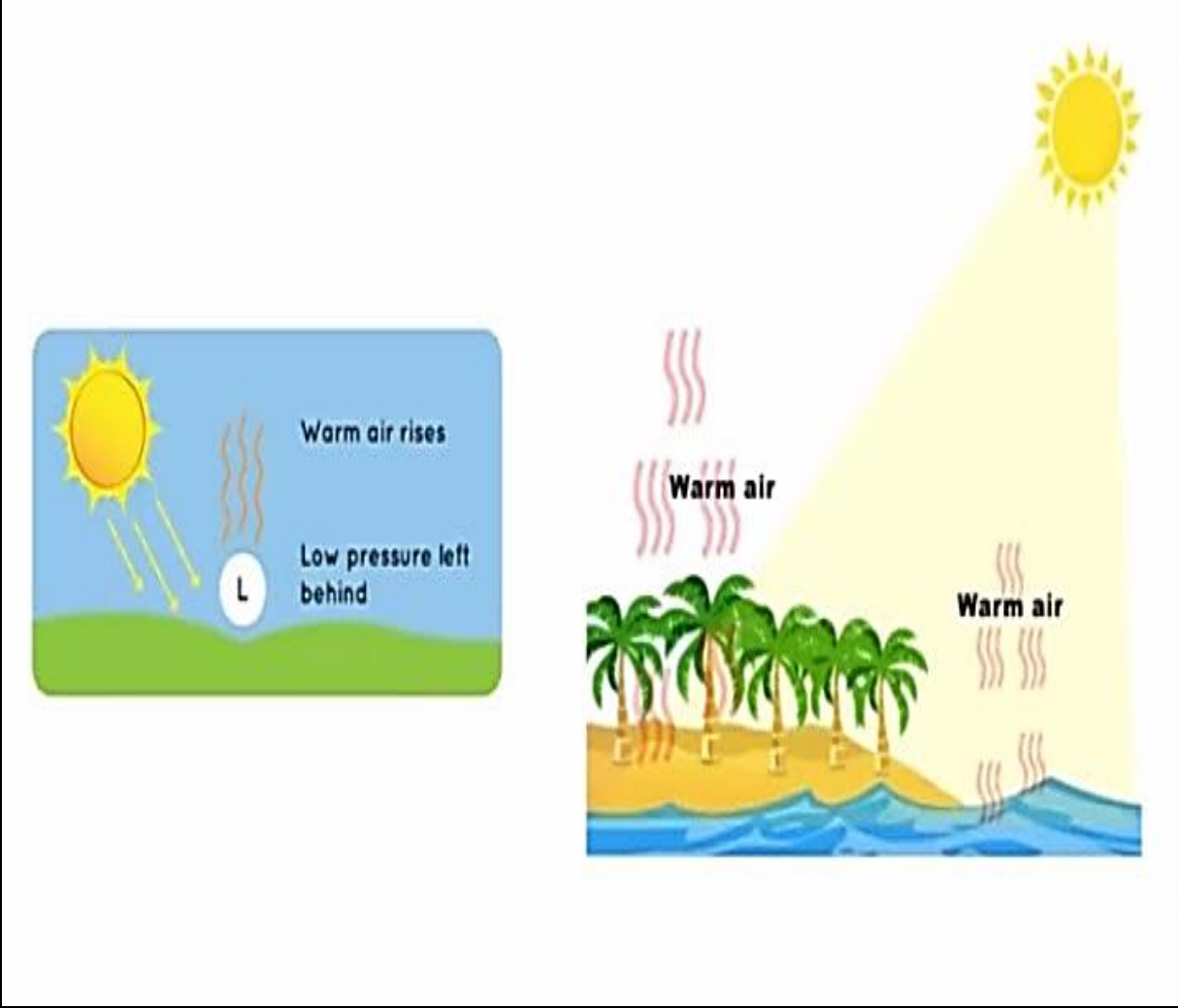
আর কোনো অঞ্চলে যদি সূর্যের তাপ তেমন একটা না পতিত হয় তবে সেখানের বায়ু এত হালকা হয় না বা প্রসারিত হয় না। ফলে সেখানকার বায়ুর ঘনত্বও তেমন একটা কমে না। সে অঞ্চলের বায়ু এই কারণে তুলনামূলকভাবে নিম্নচাপ অঞ্চলের বায়ু থেকে তুলনামূলকভাবে ভারী থাকে। সেখানকার বায়ু যেহেতু তেমন প্রসারিত হয়নি বা হালকা হয়নি ফলে সেখানকার বায়ুর ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় সেখানে বাতাসের উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়।

যাহোক, সারকথা হলো-

উষ্ণ বায়ু নিম্নচাপ সৃষ্টি করে এবং ভারী ও ঠান্ডা বায়ু উচ্চচাপ সৃষ্টি করে।

এখন, যে অঞ্চলে বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় বা যে অঞ্চলের বায়ু তাপের ফলে বেশি হালকা ও প্রসারিত হয়ে ওপরে উঠে যায় সে অঞ্চলে কিন্তু বায়ুশূন্য অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। সে শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য উচ্চচাপ অঞ্চলের বেশি ঘনত্বের ভারী ও ঠান্ডা বাতাস সে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ফলে আমরা বায়ুর প্রবাহ দেখতে পাই যা

মাঝেমাঝে ভয়ংকর আকার ধারণ করে কালবোশেখির সৃষ্টি করেও থাকে।
চলুন এখন ঘূর্ণিঝড়ের আলোচনায় সরাসরি প্রবেশ করি। ওপরে যা যা আলোচনা করলাম তা না জানলে ঘূর্ণিঝড়ের ম্যাকানিজম বুঝতে পারা কঠিন হতো।

৪।
বিভিন্ন নাম :

সাইক্লোন, হারিকেন ও টাইফুন
শুনতে তিনটি পৃথক ঝড়ের নাম মনে হলেও আসলে এগুলো অঞ্চলভেদে ঘূর্ণিঝড়েরই ভিন্ন ভিন্ন নাম।
আসলে এই সবগুলো একই জিনিস। চীন সাগরে চীন ও জাপানের আশেপাশে এটি টাইফুন নামে পরিচিত।
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার কাছাকাছি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের এলাকায় এটি হারিকেন নামে পরিচিত এবং বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর এলাকায় এটি সাইক্লোন নামে পরিচিত।

অ্যাটলান্টিক মহাসাগর এলাকা তথা আমেরিকার আশেপাশে ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ১১৭ বা মতান্তরে ১১৮   কি.মি.-এর বেশি হয়, তখন জনগণকে এর ভয়াবহতা বোঝাতে হারিকেন শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মায়া দেবতা হুরাকান-যাকে বলা হতো ঝড়ের দেবতা, তার নাম থেকেই হারিকেন শব্দটি এসেছে। আর প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা তথা চীন, জাপানের আশেপাশে হারিকেন-এর পরিবর্তে টাইফুন শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যা ধারণা করা হয় চীনা শব্দ টাই-ফেং থেকে এসেছে, যার অর্থ প্রচণ্ড বাতাস। অনেকে অবশ্য মনে করেন ফার্সি বা আরবি শব্দ তুফান থেকেও টাইফুন শব্দটি আসতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় :

ঘূর্ণিঝড় হলো ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রে সৃষ্ট বৃষ্টি, বজ্র ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাতাস সম্বলিত আবহাওয়ার একটি নিম্নচাপ প্রক্রিয়া যা নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন তাপকে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে।

মেরু অঞ্চলের দিকে কেন ?

কারণ, মেরু অঞ্চল তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা অঞ্চল। এ কারণে তাপ গতিবিদ্যার নিয়ম মেনে বাতাস অধিক গরমের স্থান (ক্রান্তীয় অঞ্চল) থেকে তুলনামূলকভাবে শীতল স্থানের (মেরু অঞ্চল) দিকেই যাবে।

এই ধরনের ঝড়ে বাতাস প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলে বলে এর নামকরণ হয়েছে ঘূর্ণিঝড়।
ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (Anti/Counter Clockwise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise)
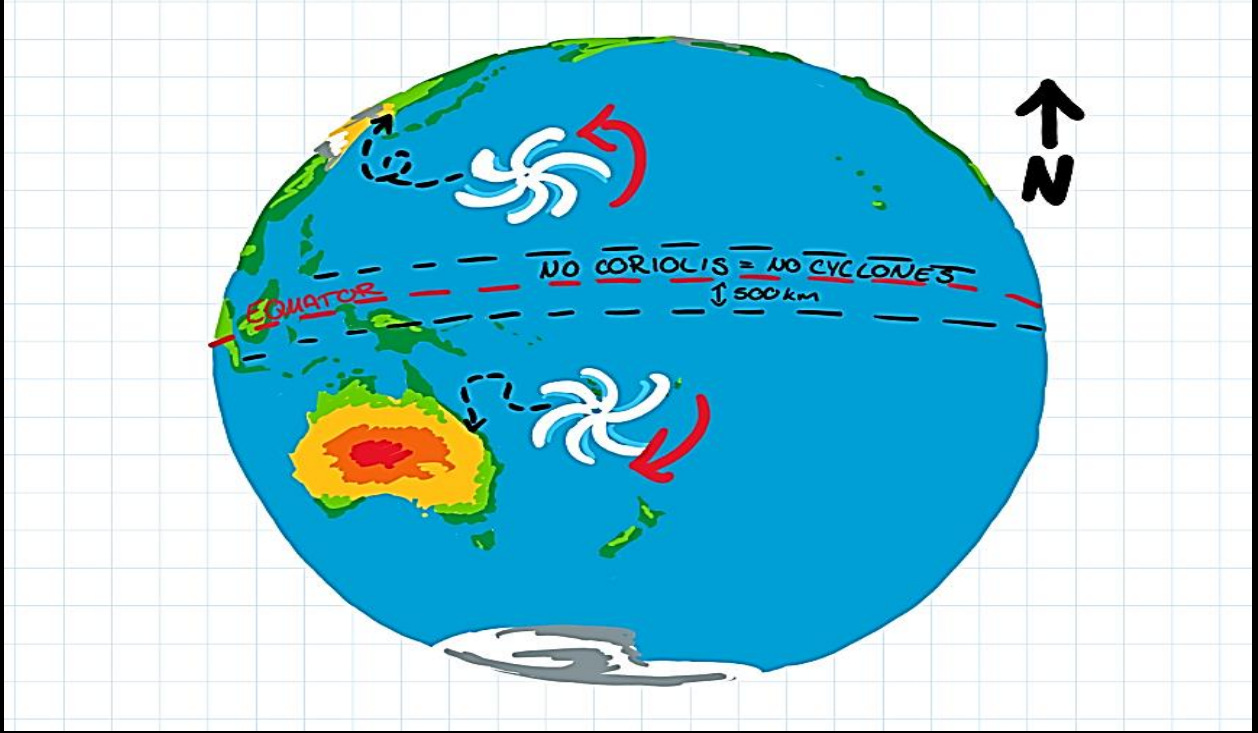
চিত্রে দেখুন ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টিক্লকওয়াইজ ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানলে যদিও দুর্যোগের সৃষ্টি হয়, কিন্তু এটি আবহাওয়ার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা পৃথিবীতে তাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। অধিকাংশই ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রে মিলিয়ে যায়, কিন্তু যে অল্প সংখ্যক উপকূলে আঘাত হানে তা অনেক সময় ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রকারভেদ :

উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঘূর্ণিঝড়/ঘূর্ণিবাত দুই প্রকার।

1) ক্রান্তীয় বা উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিবাত
 2) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় বা মধ্য অক্ষাংশীয় ঘূর্ণিবাত

ক) ক্রান্তীয় বা উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিবাত।

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় কে নিয়ে। সিংহভাগ ঘূর্ণিঝড় এখানেই ঘটে।

৫।

কীভাবে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় ?

গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে স্থলভাগের বাতাস গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়।

তাহলে সমুদ্র কি সূর্যের তাপের কোনো প্রভাব নেই ? সমুদ্রে কি গ্রীষ্মকাল নেই ?

আছে। তবে সমুদ্রে তার প্রভাব স্থলভাগের চেয়ে কম। কেন কম ?

সেখানে কি লম্বভাবে সূর্যের আলো পড়ে না ? হ্যাঁ, সমুদ্রেও সূর্যের আলো পড়ে। সেখানকার বায়ুমণ্ডলও গরম হয়। তবে স্থলভাগের তুলনায় খুব অল্প।

কেন ?

সমুদ্র আর স্থল তো একই জিনিস না। স্থলে আছে সাধারণত মাটি, আর সমুদ্রে আছে পানি। সারা পৃথিবীর স্থলের আয়তনের তুলনায় প্রায় তিন গুণ পানি আছে সমুদ্রে। আর সেই পানির রয়েছে তাপকে ধরে রাখার ক্ষমতা। পানি বেশ ভালোই তাপ ধরে রাখতে পারে যা পানির মাঝে সুপ্ততাপ হিসেবে জমা থাকে। স্থলের চেয়ে পানি তুলনামূলকভাবে বেশি তাপ ধারণ করতে পারে। তাপ ধরে রাখার ক্ষমতার কারণে সে পানির তাপমাত্রা বাড়াতে সময় লাগে স্থলের চেয়ে বেশি।
আর তেমনই উত্তপ্ত পানিকে ঠান্ডা করতেও বা তাপ বর্জন করাতেও সময় লাগে বেশি।

এক কেজি পানিকে তাপ দিয়ে তাপমাত্রা যে পরিমাণ বাড়ানো যায়, ঠিক একই পরিমাণ তাপ লোহার ওপর দিলে লোহার তাপমাত্রা পানির তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

তার মানে, পানির নিজের বেশ ভালোই তাপধারণ ক্ষমতা আছে। খেয়াল করেন, পানিকে প্রদত্ত তাপ পানি নিজের মাঝে জমা রেখেই পানি তার বাহ্যিক তাপমাত্রা তেমন বৃদ্ধি হতে দিচ্ছে না। আর পানির নিজের মাঝে সে জমানো তাপই পানির সুপ্ততাপ/লীনতাপ (Latent Heat) হিসেবে জমা হচ্ছে।

পানিতে যদি তাপ প্রদান করা হয় তবে সে পানি তাপ গ্রহণ করে বাষ্প হতে পারে। বাষ্পের ভেতর তাপ জমা হলো। আবার বাষ্পকে যদি উলটা বা ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় পানির ফোঁটায় (যেমন : মেঘের কণা) পরিণত করা যায়, তবে সে জলীয়বাষ্প প্রকৃতিতে তার আগের গৃহীত তাপ নিঃসরণ করে দিতে জানে। মানে জলীয়বাষ্প পানিতে পরিণত হওয়ার সময় তাপ ছেড়ে দিতে পারে। (আগে গ্রহণ করেছিল, উলটা প্রক্রিয়ায় ছেড়ে দেয়)
এসব জেনে রাখুন। আলোচনা আসছে।

> পানি>জলীয়বাষ্প(বাষ্পীভবন) =
তাপ গ্রহণ (সুপ্ততাপ হিসেবে জমা)

> জলীয়বাষ্প>পানি (ঘনীভবন) =
তাপ বর্জন (সুপ্ততাপ বর্জন)

পানির আরও একটা বিরাট গুণ আছে। একশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি বাষ্পীভূত হয়, আবার একশ ডিগ্রি সেলসিয়াসেই পানি তরল অবস্থায় থাকে (নবম শ্রেণীর রসায়ন বইয়ের ৯ম অধ্যায়ের তাপীয় বক্ররেখাটা দেখুন)।
নবম শ্রেণির পদার্থ বইয়ের পদার্থের অবস্থা অধ্যায়টা দেখুন, আরও ক্লিয়ার হবে।

এই একশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় প্রচুর তাপ শোষণ করে নেয়। শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানি একশ ডিগ্রিতে পৌঁছাতে যে পরিমাণ তাপ শুষে নেয়, একশ ডিগ্রির পানি থেকে ১০০ ডিগ্রির বাষ্পে পরিণত হতে তাপ শুষে নেয় তার থেকে পাঁচ গুণেরও বেশি। পানির আরও একটি গুণ হলো তার নড়াচড়া করার

ক্ষমতা। সূর্যের তাপে সমুদ্রের উপরিভাগের পানি যখন গরম হয়ে যায়, তখন সে পানি নড়েচড়ে গিয়ে নিচের দিকে বা আশপাশের পানির মাঝে তাপ ছড়িয়ে দিতে পারে। বিশাল ও গভীর সমুদ্রের ব্যাপক পানির তাপধারণ ক্ষমতা কত বিশাল একটি সংখ্যা তা তো বুঝতেই পারেন।
অপরদিকে স্থল বা ডাঙা তুলনামূলকভাবে নড়াচড়া করতে পারে না, তাই তাপও তেমন ছড়িয়ে দিতে পারে না।

দেখা যায় পানি তাপ ধরে রাখে প্রচুর কিন্তু সামগ্রিকভাবে পানির তাপমাত্রা বাড়ে সামান্য। আর স্থলভাগের তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা কম, তাই তাপমাত্রা সহজেই বেড়ে যায়।

ভাত রান্না করার সময় ভাতের হাঁড়ি থেকে গরম বাষ্প যেমন ওপরে উঠে যায়, তেমনই স্থলভাগের গরম বায়ুও উঠে যায় ওপরে। গরম বায়ু ওপরে উঠে যাওয়ায় সে এলাকায় পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় এবং বাতাস তাপে প্রসারিত হয়ে হালকা ও ঘনত্ব কমে যাওয়ায় সৃষ্টি হয় পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বায়ুচাপের পার্থক্য। গরম বায়ু এলাকায় বা স্থলের দিকে নিম্নচাপ এবং আশেপাশের বা সমুদ্রের দিকে তুলনামূলকভাবে কম গরম এলাকায় উচ্চচাপ বিরাজ করে। এই পার্থক্য মেটাতে সমুদ্র থেকে স্থলের দিকে ছুটে আসে ভারী, ঘন ও ঠান্ডা বায়ু। সাথে নিয়ে আসে বৃষ্টি। এটা হলো সাধারণ ঝড়।
আবার বিশেষ কন্ডিশন সৃষ্টি হলে উলটাটাও ঘটে। উলটা অবস্থাতেই (স্থল থেকে সমুদ্রে বায়ু ছুটে আসা) সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিঝড়।

৬।
সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় কীভাবে ?

সমুদ্রে কোনো স্থানে বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পেলে সেখানকার বায়ু প্রসারিত, ঘনত্ব কমে হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। কেন ওপরে উঠে যায় তা আগেই জানিয়েছি। ফলে বায়ুর চাপ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। একে সমুদ্রের নিম্নচাপ বলে। এই নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রায় বায়ুশূন্য অবস্থা থাকে বলে আশপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ সমুদ্রের কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে। একে নিম্নচাপ কেন্দ্রমুখী প্রবল ঘূর্ণি বলে। সমুদ্রের উষ্ণ পানির কারণে বায়ু হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে এসব ঝড়ের তৈরি করে। তখন তুলনামূলকভাবে উষ্ণ বাতাস হালকা হয়ে যাওয়ার কারণে ওপরে উঠে যায়, আর সমুদ্রের ওপরের থাকা এবং উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে আসা ঠান্ডা, ভারী বাতাস সমুদ্রের সে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে চলে আসতে থাকে।

কী কী শর্ত লাগে ?

১। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা কমপক্ষে ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকা আবশ্যক।

২। একটি নির্দিষ্ট গভীরতা (কমপক্ষে ৫০ মিটার) পর্যন্ত এ তাপমাত্রা থাকতে হয়। সাধারণত কর্কট ও মকর ক্রান্তিরেখার কাছাকাছি অঞ্চলের সমুদ্রগুলোতে গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্মের শেষে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। অন্য কোথাও অতটা হয় না বললেই চলে।

৩। সমুদ্রের নিম্নচাপ অঞ্চলে আগত বাতাস কিন্তু চার দিক থেকে আসবে।
i) উত্তর দিকের উচ্চচাপ অঞ্চল
ii) দক্ষিণ দিকের উচ্চাচাপ অঞ্চল
iii) সমুদ্রের উপরিস্তরের উচ্চচাপ বায়ুস্তর অঞ্চল।
iv) আশেপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল।

এখন, বাতাসের তিনটা স্তর কল্পনা করি।
১.সবার নিচে ভারী বাতাস
২. তুলনামূলকভাবে হালকা উত্তপ্ত বাতাস (মাঝামাঝি পজিশনে)
৩. তার ওপরে উঠে যাওয়া আরও হালকা, উত্তপ্ত বাতাস (সবার ওপরে/উচ্চতর পজিশনে)।

এখন,
1.
তিন দিক থেকে ছুটে আসা এই উচ্চচাপ অঞ্চলের বাতাস একত্রিত হয়ে সমুদ্রের গরম পানির ওপরের বাতাসকে (মাঝামাঝি পজিশনের বাতাসকে) ঠেলে দেয় আরও ওপরের দিকে।

2.
তখন তাদের (মাঝামাঝি পজিশনের বাতাসকে) জায়গা করে দিতেই (মানে নিচের স্তরের বাতাসের ধাক্কা খেয়ে ওপরে উঠা বাতাসকে জায়গা দিতে) ওপরে উঠতে থাকা বাতাসের ধাক্কায় আগেই আরও ওপরে উঠে আছে যে বাতাস, তা ছুটে যায় নিচের দুই দিকে।

(কেন নিচের দুইদিকে যায় তার আলোচনা আসছে)

৭।

কেন নিচের দুইদিকে বাতাস নেমে যায় ?

উচ্চতর পজিশনে থাকা বাতাস ওপরে উঠে ঠান্ডা, ভারী হয়ে যায়। মানে উচ্চচাপ সৃষ্টি করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে সমুদ্রের ওপরের স্তরে বা তিন নাম্বার উচ্চতর পজিশনে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় এবং নিচের উত্তপ্ত সমুদ্রের ফলে বায়ুশূন্য হয়ে খালি হওয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করতে বা তাপের ভারসাম্য রক্ষার্থে সে উচ্চতর পজিশনের বাতাসই আবার উচ্চতর পজিশনের সেই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিচের উষ্ণ, নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে নেমে আসে।

3.
আবার নিচে নেমে আবার সমুদ্রের উষ্ণতায় উষ্ণ ও হালকা হয়ে আবার ওপরে উঠে যায়, আবার... এভাবে এ চক্র চলতেই থাকে।

ভাতের মাড় যেমন নিচের গরম পানির ধাক্কায় একবার ওপরে উঠে আবার হালকা ঠান্ডা হয়ে পাতিলের চতুর্পাশ দিয়ে নিচে নেমে যায় তেমন আর কি।

5. **সমুদ্র নতুন করে উষ্ণ হওয়া :**

ক)
সূর্যের তাপে বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং সাথে সাথে পানি উত্তাপে জলীয়বাষ্প হয়ে ওপরে উঠতে থাকে।
খ)
জলীয়বাষ্প গরম ও হালকা বাতাসের সাথে মিশে।

গরম, হালকা বাতাস জলীয়বাষ্প ধারণ করে বা জলীয়বাষ্পের সাথে মিশে স্যাঁতসেঁতে বাতাসে পরিণত হয়।

গ)

সে স্যাঁতসেঁতে জলীয়বাষ্পযুক্ত বাতাস হালকা হওয়ায় ওপরে উঠে ওপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং শীতলতার কারণে সে জলীয়বাষ্প যুক্ত হালকা বাতাস ঘনীভূত হয়।

ঘ)

আর সে জলীয়বাষ্পযুক্ত বাতাসই পরে দীর্ঘ অঞ্চলব্যাপী ভয়ংকর কালো মেঘে রূপ নেয়।

ঙ)

ওপরে উঠা গরম বাতাস ঘনীভূত হওয়ার সময় মানে জলীয় বাষ্প থেকে পানিতে পরিণত হওয়ার সময় বাষ্প তার সুপ্ততাপ প্রকৃতিতে বর্জন করে। সে সুপ্ততাপ তাপগতিবিদ্যার নিয়মে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

ছড়িয়ে পড়ার ফলে সমুদ্রের ওপরের স্তরটা বাষ্প থেকে ক্রমাগত বর্জিত নতুন মাত্রায় নতুন তাপ পাওয়ায় সেখানের সমুদ্র আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে যাবে।

সমুদ্র নতুন মাত্রায় উত্তপ্ত হলো।

চ)

অন্যদিকে, আশেপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল এবং সমুদ্রের ওপরের দিক থেকে তখনো ঠান্ডা, ভারী বাতাস নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে। কারণ ওপরের দিকে উচ্চচাপ অঞ্চল আর নিচের দিকে নিম্নচাপ অঞ্চল। আর বাতাস উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে সর্বদা নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়।

ছ)

খেয়াল করেন, বর্জিত তাপ পেয়ে সমুদ্র নতুন করে আগের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হলো।

তাপের কারণে সমুদ্রে আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় নিম্নচাপ সৃষ্টি হলো। সমুদ্রে তাপের আধিক্যের কারণে বাতাস হালকা হয়ে, প্রসারিত হয়ে, ঘনত্ব কমে গিয়ে আরও বেশি নিম্নচাপ সৃষ্টি করবে।

ফলে নিচের স্তরের গরম বাতাস সমুদ্রের ওপরের স্তরে আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় দ্রুততর উঠবে। ফলে নিচের দিকে আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় এবং পূর্বের চেয়ে দ্রুততর সময়ে বায়ুশূন্য স্থান সৃষ্টি হতে শুরু করবে। আর আশেপাশের উচ্চচাপ অঞ্চলের বাতাস পূর্বের চেয়ে অধিক দ্রুত গতিতে সে নিম্নচাপ অঞ্চলে আসতে থাকবে। যত বেশি নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে তত বেশি বেগে সেখানে মানে নিম্নচাপ অঞ্চলে বাতাস আসতে থাকবে।

৮০৬ মিটারে যখন নামব তখন দেখা পাওয়া যাবে 'Giant Ora fish' বা বৃহৎ দাঁড় মাছ। এর দেহের আকৃতি নৌকার দাঁড়ের মতো চ্যাপ্টা বলে এই নাম দেওয়া। লেখক- তানভীর আহমেদ।
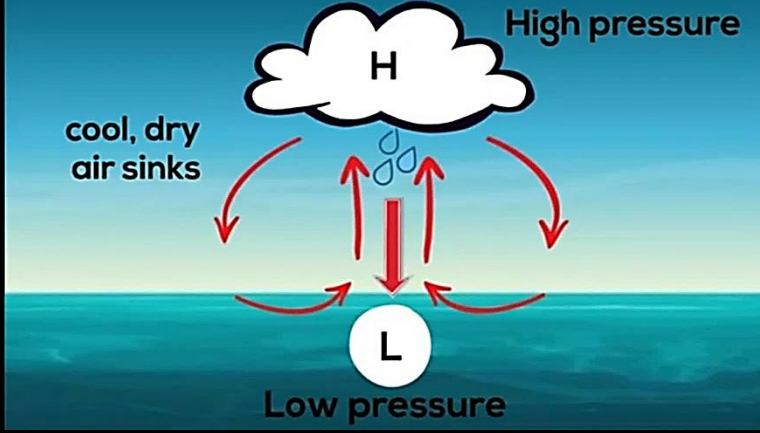
মানে সমুদ্রের সে নিম্নচাপ অঞ্চলে বা বায়ুশূন্য স্থান হতে যাওয়া স্থানে আগের চেয়ে দ্রুত বেগে ও বেশি মাত্রায় ভারী, ঠান্ডা উচ্চচাপ অঞ্চলের বাতাস এবং সমুদ্রের ওপর থেকে আগত উচ্চচাপ অঞ্চলের বাতাস নিম্নচাপ সমুদ্রের জায়গাটায় আসতে থাকবে। সমুদ্র কিন্তু মেঘের জলীয়বাষ্প থেকে বর্জিত নতুন তাপ পেয়ে আগের চেয়েও বেশি উত্তপ্ত। ফলে উচ্চচাপ অঞ্চল, সমুদ্রের ওপর থেকে আসা সেসকল ঠান্ডা, ভারী বাতাস সমুদ্রের নিম্নচাপ অঞ্চলে এসে সেখানের সমুদ্রের পরিবেশের অধিক তাপের কারণে সেসব বাতাস ঠান্ডা থেকে গরম হয়ে যাবে। অর্থাৎ উচ্চচাপ অঞ্চল (স্থল, সমুদ্রের ওপরের বায়ুমণ্ডল) থেকে আগত ঠান্ডা, ভারী বাতাসও উত্তপ্ত হয়ে গেল। আর সে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে, প্রসারিত হয়ে, হালকা হয়ে ওপরে উঠে যাবে। সাথে সাথে উত্তপ্ত পরিবেশের কারণে সমুদ্র থেকে পানি বাষ্প হয়ে ওপরে উঠতে থাকবে।

তার মানে, উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে আগত বাতাস সমুদ্রের নিম্নচাপ অঞ্চলে এসে উত্তপ্ত হয়ে সমুদ্রের বাষ্পের সাথে যুক্ত হয়ে ওপরে উঠে যাবে। আর ওপরে উঠে শীতল, ভারী বাতাসের উপস্থিতিতে সে বাষ্পযুক্ত হালকা ও উত্তপ্ত বাতাস ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র সৃষ্টি হতে থাকবে। এভাবে চক্রাকারে এটা ঘটতেই থাকে। পানিকণায় পরিণত হবে এবং কালো মেঘে পরিণত হয়ে যাবে। উত্তপ্ত বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানিকণায় পরিণত হওয়ার সময় সে আগের মতো সু্প্ততাপ বর্জন করবে এবং সমুদ্রের সেখানকার পরিবেশ আবারও উত্তপ্ত করবে (৩য় বার)। আবার উচ্চচাপ থেকে আসা ভারী, ঠান্ডা বাতাস প্রসারিত, উত্তপ্ত, হালকা হয়ে ওপরে উঠে যাবে, আবার মেঘ তৈরি হবে, আবার... এভাবে চলতেই থাকবে আর উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বাতাস সেখানের তাপীয় ভারসাম্য রক্ষার্থে আসতেই থাকবে, আর সমুদ্রের ওপরে কালো মেঘ সৃষ্টির পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। আর যত নিম্নচাপ সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে ততই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বাতাস আসতেই থাকবে। যত বেশি সময় যাবে তত বেশি সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়বে এবং উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে আগত বাতাসের পরিমাণ ও আসার গতিও বাড়তে থাকবে। সে উচ্চচাপ অঞ্চলের বাতাস আবার সে নিম্নচাপ অঞ্চলে এসে হালকা, উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হতে থাকবে+মেঘ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মেঘের জলীয়বাষ্প কণা থেকে বর্জিত তাপের পরিমাণও বাড়তে থাকবে। ফলে সমুদ্রের সে জায়গাটায় আরও ভয়ংকর নিম্নচাপ
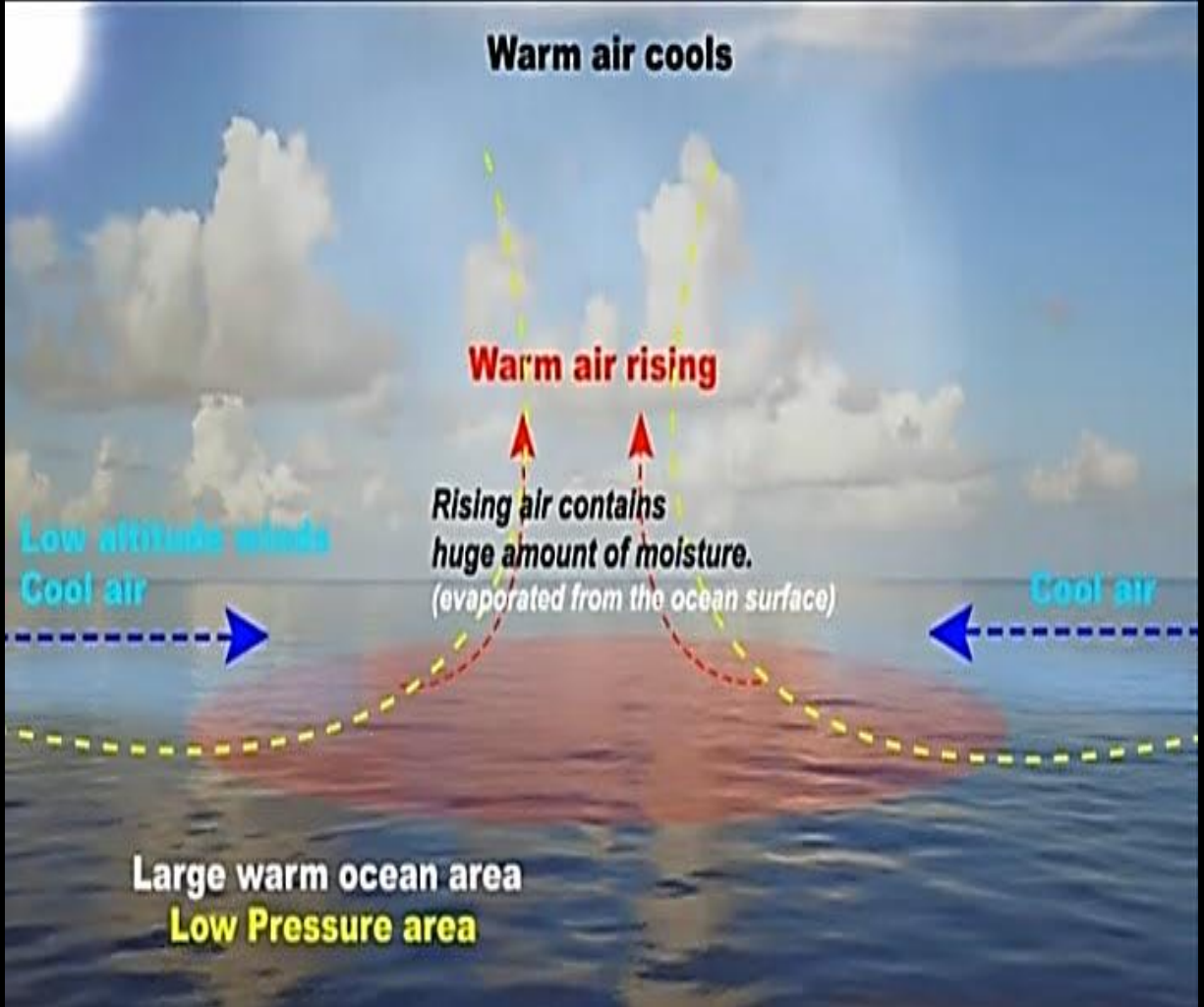
চিত্রে ঘূর্ণিঝড় হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি দেখুন।

প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প এবং তা থেকে বর্জিত সুপ্ততাপ নিম্নচাপ অঞ্চলের কেন্দ্রের দিকে বয়ে নিয়ে আসে যা ঘূর্ণিঝড়ের প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয়। উষ্ণ এ বায়ুই ঘূর্ণিঝড়ের জ্বালানি বলা যেতে পারে।
সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো ঘূর্ণায়মান বাতাস নিম্নচাপ অঞ্চলের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হলে সেখানে প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করে।

এতে ঝড়ের ঘূর্ণি আরও বড়ো হতে থাকে। তাছাড়া পূর্বদিক থেকে আসা ঢেউরাজিও ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কিছু ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয় বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি।

নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই ০-৫ ডিগ্রি পর্যন্ত জায়গায় কোনো ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় না।

যাহোক,
সাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে সে অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয়বাষ্পযুক্ত বায়ু ওপরের দিকে উঠে যায়। আর এই শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য উভয় মেরু অঞ্চল থেকে বাতাস নিরক্ষরেখার দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাবে সৃষ্ট কোরিওলিস শক্তির (coriolis force) কারণে এ বায়ু সোজাসুজি প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। এর ফলে উত্তর গোলার্ধে সৃষ্ট বায়ুপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বায়ু ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকে। নিরক্ষরেখার ওপর এ শক্তির প্রভাব শূন্য। কাজেই, এ অঞ্চলের তাপমাত্রা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির অনুকূলে থাকলেও নিরক্ষরেখার ০ ডিগ্রি থেকে ৫ ডিগ্রির মধ্যে সাধারণত কোনো ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায় না।
সাধারণত বিষুবরেখা থেকে ওপরে ৫° উত্তর থেকে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ এবং বিষুবরেখা থেকে নিচে ৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়গুলির উৎপত্তি ঘটে।

৮।

গোলাকার চক্র সৃষ্টি হয় কেন ?

প্রথমেই বলে নিই, আমরা ঘূর্ণিঝড়ের সময় যে চক্রের মতো কিছু ঘুরতে দেখি তা কিন্তু সমুদ্রের ওপরে সৃষ্ট ও জড়ো হওয়া বাতাস ও মেঘের ঘূর্ণন। এদের দাপটে নিচের সমুদ্রের পানিও উত্তাল থাকতে দেখা যায়।

সমুদ্রের দিকে যখন বাতাস ছুটে আসে তখন তা সরাসরি সরল রেখায় আসে না। পাক খেয়ে খেয়ে অগ্রসর হয়।

ওপরেই বলেছি পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাবে সৃষ্ট কোরিওলিস বলের (coriolis force) কারণে এ বায়ু সোজাসুজি প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বা বাম থেকে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে বা বাম দিকে বেঁকে যায়। এর ফলে উত্তর গোলার্ধে সৃষ্ট বায়ুপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বায়ু ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকে এবং ওভাবে ঘুরতে ঘুরতে বাতাস অগ্রসর হতে থাকে এবং সমুদ্রের ওপরে সৃষ্ট মেঘও সে গতির প্রভাব দেখা যায়।

আসলে পৃথিবী যদি স্থির থাকত, নিজের অক্ষের ওপর না ঘুরত তবে বাতাসটা ঠিক ঠিক উত্তর দিক থেকেই আসত। দক্ষিণের বাতাসও আসত দক্ষিণ দিক থেকেই। কিন্তু পৃথিবী প্রতিনিয়ত তার অক্ষের ওপর ঘুরছে। পৃথিবীর এই ঘূর্ণনবেগ বাতাসের বেগকেও প্রভাবিত করে। সে জন্যই উত্তরের আর দক্ষিণের বাতাস সামান্য বাঁকা হয়ে আসে। উত্তরের হাওয়া আসে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে, আর দক্ষিণেরটা আসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে কেন এমনটা হয় সেটাও বেশ জানার মতো জিনিস। বলছি ওয়েট, এটা না বুঝলে কিছুই বোঝা হলো না।

কোরিওলিস ইফেক্ট :

উনবিংশ শতকের ফরাসি গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী গুস্তাভ-গাসপার্ড ডি কোরিওলিস (Gustave-Gaspard De Coriolis, 1792-1843) সর্বপ্রথম ঘূর্ণন সাপেক্ষে গতিশীল বস্তুর দিক বিক্ষেপকারী এই প্রকার বলের বিষয়ে আলোকপাত করেন বলে তাঁর নামানুসারে এই বলের নাম কোরিওলিস বল রাখা হয়েছে।

পৃথিবীর আবর্তনজনিত ঘূর্ণনের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠস্থ যে-কোনো স্বচ্ছন্দ, গতিশীল বস্তুর ওপর একধরনের বল কাজ করে, যা উক্ত বস্তুর দিক বিক্ষেপ ঘটায়। এই বলকে কোরিওলিস বল (Coriolis Force) বলে।

কোরিওলিস বল ও তার প্রভাব :

আমরা জানি, পৃথিবী পশ্চিম-পূর্বে ঘূর্ণনশীল। তবে আপনার মনে একটি চিন্তা কৌতহলবশত জাগতে পারে যে, কাল্পনিকভাবে একটি বল যদি ক্ষিপ্রগতিতে উত্তর দক্ষিণ মুখে নির্দিষ্ট বিশাল দূরত্বে ছোড়া হয় তাহলে তো তা সঠিক স্থানে না পড়ে ডানে বা বামে পড়বে।
বলটি তো সোজাই গিয়েছিল, কিন্তু ঘূর্ণনের কারণে পৃথিবীর যে স্থানে পড়ার কথা সে স্থানটি কিছুটা দূরে সরে গিয়েছে। কিন্তু কেন ?

এর উত্তরটি একটু জটিল। বিষয়টির মূলে রয়েছে কোরিওলিস বল ও তার প্রভাব।

ধারণাটার ব্যাখ্যা :

কোরিওলিস বল বলতে পদার্থবিদ্যায় গতিশীল বস্তুসমূহের আপাত বিচ্যুতিকে বোঝায়। বস্তুসমূহের গতিকে এক্ষেত্রে একটি ঘূর্ণায়মান কাঠামোর সাপেক্ষে বর্ণনা করা হয়। যেমন–কাঠামোটিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণনে বস্তুর গতিবিক্ষেপ বাম দিকে এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণনে ডান দিকে বিচ্যুতি ঘটে। বিজ্ঞানী কোরিওলিস এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সর্বপ্রথম ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট গতিশীল বস্তুর গতিবিক্ষেপ সংক্রান্ত ধারণাটি গাণিতিকভাবে প্রকাশ করেন, যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই আবহবিদ্যায় পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাপেক্ষে গতিশীল বস্তুর গতিবিক্ষেপ সংক্রান্ত আলোচনার ভিত্তি হিসাবে কোরিওলিস বল নামে ব্যবহৃত হতে থাকে।

ব্যাখ্যা :

কোরিওলিস বল পৃথিবীর ঘূর্ণন ও বস্তুর জড়তার কারণে ক্রিয়াশীল হয়। সমগ্র পৃথিবীর ওপর কোরিওলিস বলের প্রভাব খুব সামান্যই অনুভূত হলেও গতিশীল বস্তু তথা–বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতির গতিবিক্ষেপের ক্ষেত্রে এই বলের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই অনুভূমিক বিক্ষেপ নিরক্ষরেখায় সর্বনিম্ন এবং মেরুদ্বয়ের নিকট সর্বোচ্চ হয়। মানে এই বলের প্রভাবের পরিমাণ পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়, বিভিন্ন অক্ষাংশে এর মান বিভিন্ন মাত্রার। যথা–নিরক্ষীয় অঞ্চলে তথা ০° অক্ষাংশে ০%, ৩০° – ৫০° অক্ষাংশে ৫০%, ৬০° – ৮০° অক্ষাংশে ৮৫% – ৯০% এবং মেরু অঞ্চলে তথা ৯০° অক্ষাংশে ১০০%।
এ বলের প্রভাবে বিষুবরেখা হতে উত্তর মেরু পর্যন্ত প্রশস্ত উত্তর গোলার্ধে বস্তুসমূহের গতির দিকের সাথে ডান দিকে (anti clockwise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে (clockwise) বিচ্যুতি ঘটে।

সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুপ্রবাহ এ নিয়ম মেনে চলে। সেই কারণে বড়ো বড়ো সাইক্লোন, হারিকেন, টাইফুন, টর্নেডোর জন্য এই বল দায়ী।

বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য নিচের আলোচনাটা লক্ষ করতে হবে।

৯।

উত্তর গোলার্ধে কোরিওলিস প্রভাব-১ :

নিচে A থেকে ওপরের জায়গাটুকু উত্তর গোলার্ধ ধরা যাক।

কল্পনা করা যাক, কদ্দুস উত্তর গোলার্ধে বিষুবরেখার কাছাকাছি মেক্সিকো উপকূলে A বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে একটি ক্রিকেট বল সোজা উত্তর মেরুর নিকটবর্তী তার বান্ধবী জরিনার নিকট, কানাডা বরাবর B বিন্দুতে পাঠাল।
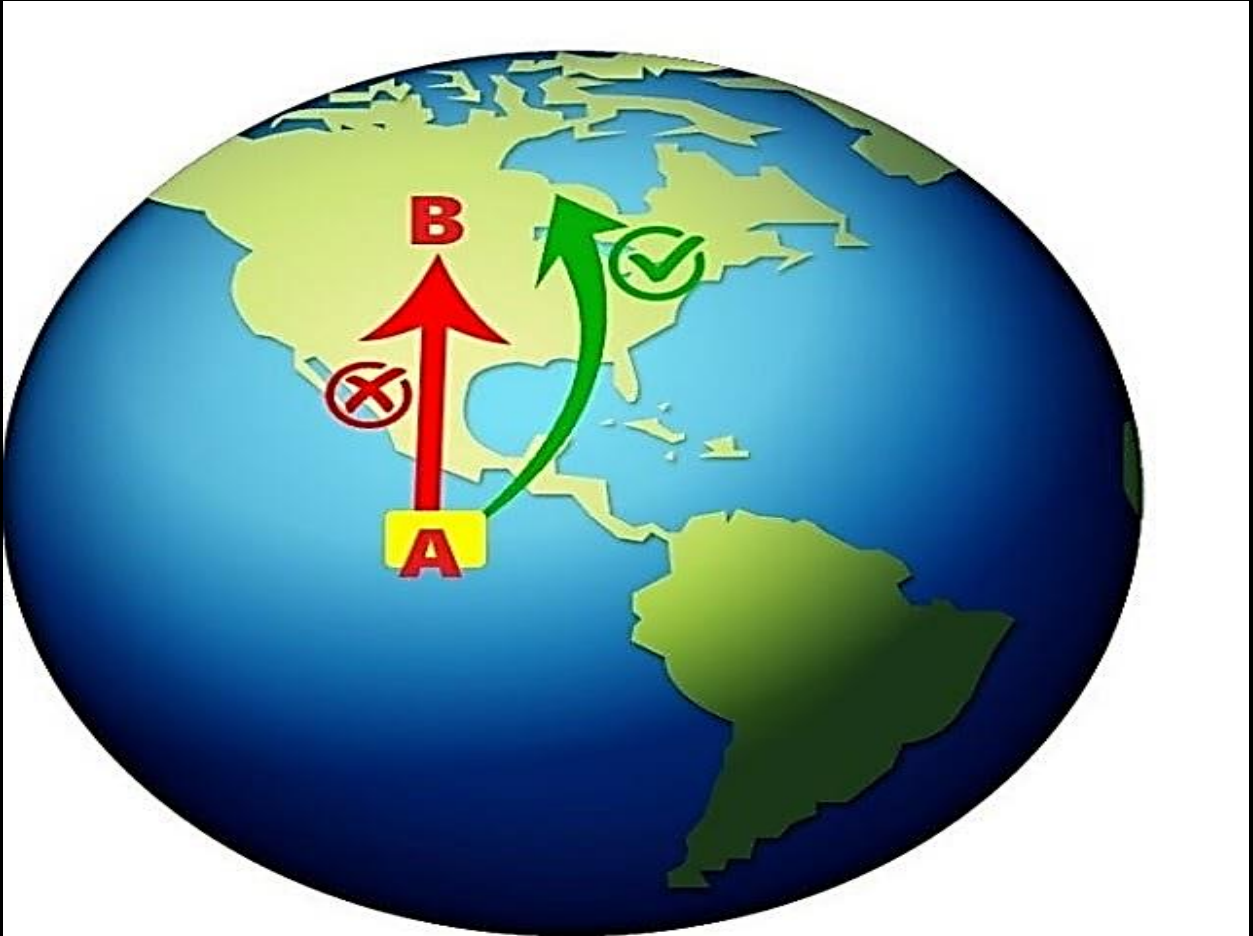
উত্তর গোলার্ধের কোরিওলিস প্রভাব ১

জানা আছে, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। কিন্তু সব প্রান্ত, পৃথিবীর সকল বিন্দু সমান গতিতে ঘূর্ণন সম্পন্ন করে না। উত্তর দক্ষিণ মেরু প্রান্ত কিছুটা চাপা। তাই এই দুই অক্ষের ব্যাস সবচেয়ে কম। পক্ষান্তরে বিষুবরেখায় ব্যাস সবচেয়ে বেশি। বিষুবরেখা থেকে যত উত্তর বা দক্ষিণ দিকে যাওয়া যায় অক্ষাংশের ব্যাস তত কমতে থাকে।

তাই, একটি নির্দিষ্ট সময়ে উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর কোনো অঞ্চল যে গতিতে ঘুরবে বিষুবরেখায় তার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে ঘুরে আসবে।

তাহলে, কদ্দুস A বিন্দু থেকে সোজা বল প্রেরণ করল। কিন্ত আগেই বলা হলো, উত্তর গোলার্ধে কোনো গতিশীল বস্তু ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরে অগ্রসর হয় বা ডান দিকে বেঁকে অগ্রসর হয়।

ফলে A বিন্দু হতে বলটি B বরাবর যেতে যেতে ডান দিকে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর বরাবর বেঁকে যাবে। (বলটাকে বাতাস হিসেবে মনে করুন।)

<u>উত্তর গোলার্ধে কোরিওলিস প্রভাব-২ :</u>

এখন জরিনা, সে এবার কদ্দুসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু জরিনাও উত্তর গোলার্ধেই আছে।
এখন ধরা যাক, বলটি জরিনা উত্তর মেরু A হতে B বিন্দু (মেক্সিকো) বরাবর প্রেরণ করবে। উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরায় বলটি উত্তর মেরু A থেকে B পর্যন্ত পৌঁছাতে গিয়ে বলটি প্রশান্ত মহাসাগর বরাবর আবারও নিজের গতির ডান দিকে বেঁকে যাবে।
কদ্দুসের সাপেক্ষে A থেকে ডান দিকে বেঁকে আসা বলটিকে কদ্দুসের কাছে বাম দিকে বেঁকে বলটি আসছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি গ্লোবটা উলটা করে জরিনার পজিশনে যান। দেখবেন বলটি জরিনার সাপেক্ষে বলটি ডান দিকেই বেঁকেছে।

এবার অদ্ভুত পলিপ জাতীয় প্রাণীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। এর নাম 'Marrus Orthocanna'। ৮৫৭ মিটার গভীরতায় এত অন্ধকারের মধ্যেও এই প্রাণীর সম্মুখভাগ থেকে নিঃসৃত হওয়া এক গ্যাসে সমুদ্র আলোকিত হয়।

লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

উত্তর গোলার্ধের কোরিওলিস প্রভাব ২

সুতরাং, বোঝা গেল উত্তর গোলার্ধে গতিশীল বস্তু সর্বদা তার নিজের গতির ডান দিকে বেঁকে যাবে, মানে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে।

দক্ষিণ গোলার্ধে কোরিওলিস প্রভাব-৬ :

এবার তাহলে দক্ষিণ গোলার্ধের কথা বিবেচনা করা যাক। কদ্দুস এবার দক্ষিণ আমেরিকার A বিন্দু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে তার বান্ধবী জরিনার দিকে B বিন্দুতে বলটি পাঠাবে। দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণনের জন্য বলটির বিচ্যুতি বাম দিকে বেঁকে যাবে। প্রথম দিকেই ক্লকওয়াইজ, অ্যান্টিক্লকওয়াইজ বোঝানোর সময় বলেছি বাম দিকে মানে ঘড়ির কাঁটার দিকে।
আপনাকে A বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে তাকিয়ে দিক বিবেচনা করতে হবে। যখন যেদিক থেকে ছুড়বেন সেদিক থেকে চিন্তা করতে হবে বলটি কোন দিকে গেল। গ্লোব উলটা করে A বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখুন, দেখতে পারবেন বলটি বাম দিকেই বেঁকে যাচ্ছে।

দক্ষিন গোলার্ধের কোরিওলিস প্রভাব ১

দক্ষিন গোলার্ধের কোরিওলিস প্রভাব-২ :

এবার, দক্ষিণ মেরু হতে জরিনা কদ্দুসকে A হতে B বিন্দু বরাবর বলটি ছুড়ে মারে। এবার বলটি প্রশান্ত মহাসাগরের দিক বরাবর কিছুটা বাম দিকে বেঁকে যায়। মানে ঘড়ির কাঁটার দিকে বিচ্যুতি।

আরেকটি জোনের পরিসমাপ্তিতে আমরা। এখন যে জোনে প্রবেশ করছি আমরা এর নাম 'Midnight Zone' । এই জোনের তাপমাত্রা হলো ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই জায়গায় চাপ হলো ৫৮৫০ psi ! এক হাজার মিটার গভীরতা থেকে শুরু এই জোন। এই জোনের প্রথম ও সবচেয়ে অদ্ভুত প্রাণী হলো 'অ্যাংলার মাছ' যা 'Angler fish' নামে পরিচিত। বায়োলুমিনেসেন্স এর জন্য এর মাথায় আলো জ্বলে যার ফলে শিকার তার কাছাকাছি আকৃষ্ট হয়ে এলেই রাক্ষসের মতো ধারালো ও লম্বা দাঁত দিয়ে শিকারকে কামড়ে ধরে খেয়ে ফেলে। এই মাছ নিয়ে ব্যাঙাচিতে একজন ইতোমধ্যে বিস্তারিত লিখেছেন। পড়ার জন্য এখানে ক্লিক করুন।
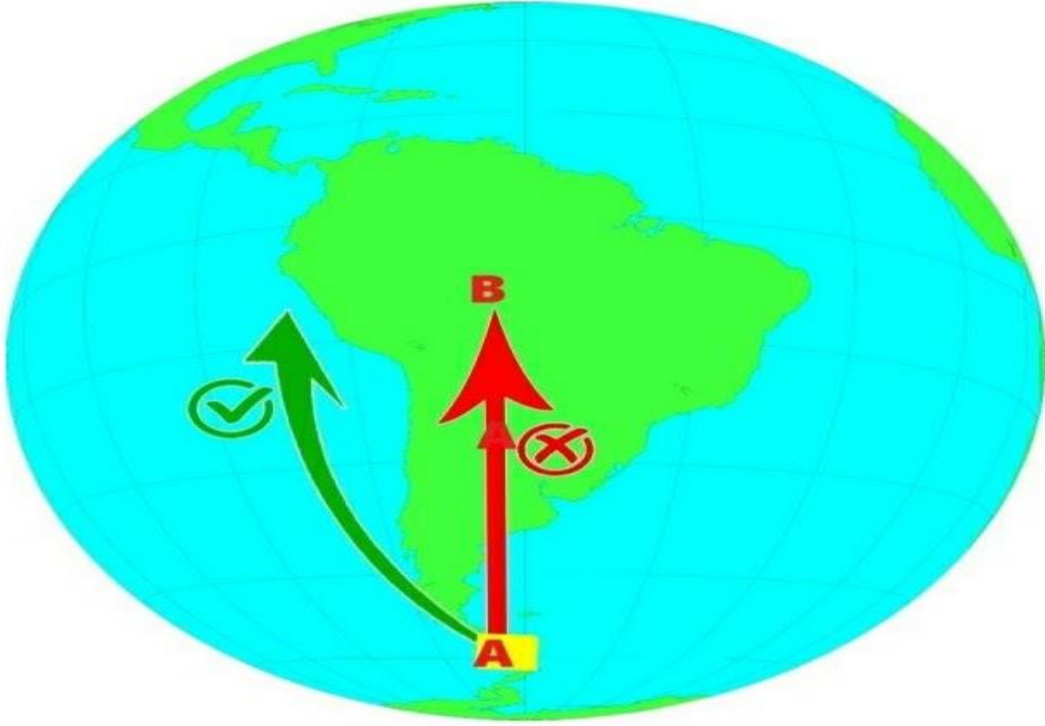
দক্ষিন গোলার্ধের কোরিওলিস প্রভাব ২

কারণ, ঘূর্ণনটি ঘড়ির কাঁটার দিকে সম্পন্ন হয় এবং মেরুর ব্যাসের চেয়ে B বিন্দুর ব্যাস অনেক বেশী হওয়ায় তা দ্রুত ঘুরে। ফলে বলটি বামে সরে যায়। বলটি সরাসরি সরলরেখায় B বিন্দুতে পৌঁছানোর আগেই B বিন্দু সামনে সরে যায় এবং B বিন্দুর পেছনের অংশ B বিন্দুতে এসে যায়। ফলে বলটি B বিন্দুতে না গিয়ে নতুন বিন্দুতে যায়, যাকে বেঁকে যাওয়া বলে মনে হয়।
এভাবে ওপরের সবগুলোই।

অতএব, বোঝা গেল দক্ষিণ গোলার্ধে গতিশীল বস্ত নিজের গতির বাম দিকে বিচ্যুত হয়।

সারমর্ম :

ওপরের আলোচনা ও পরীক্ষা দ্বারা বোঝা গেল কোনো গতিশীল বস্ত কোরিওলিস বলের প্রভাবে উত্তর গোলার্ধে নিজের গতির ডান এবং দক্ষিণ গোলার্ধে নিজের গতির বাম দিকে বেঁকে যায় বা বিচ্যুত হয়।

১০।

ঘূর্ণিঝড়ের গঠন :

সাইক্লোনের চোখ :

ঘূর্ণিঝড়ের চোখ বলতে কী বোঝায় ?
চোখ কিভাবে তৈরি হয় এবং বজায় থাকে ?
আই ওয়াল (eye wall) কি ?

ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে অবস্থিত গোলাকৃতি অঞ্চলকে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ (eye) বলা হয়। অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রকে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ বলে। ঘূর্ণিঝড়ের একদম কেন্দ্রে অর্থাৎ চোখের অঞ্চলে সবচেয়ে কম বায়ুচাপ থাকে।
এখানে বাতাস সর্বাধিক উষ্ণ থাকে। এই অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি থাকলেও বাতাসের গতি থাকে মাত্র ২০-২৫ কিলোমিটার/ঘণ্টার ভেতরে।
ঘূর্ণিঝড় যেখানে উৎপত্তি হয় সেখানে ৬০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাসার্ধে তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে এবং বায়ুর গতিবেগ খুব কম থাকে। সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম থাকে। এ চোখের বাইরে ৬৫০ থেকে ৭৫০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় বিস্তৃত হতে পারে এবং সেখানেই ঘন কালো মেঘের বিস্তার ও প্রবল বায়ুপ্রবাহসহ বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়াগত গোলযোগ সংঘটিত হয়। দুই দিক থেকে আগত বাতাস বেঁকে এসে নিম্নচাপ অঞ্চলে কেন্দ্রে ফাঁকা স্থান এবং চক্র সৃষ্টি করে।
এ চোখকে কেন্দ্র করেই ঘূর্ণিঝড় ঘুরতে থাকে। এটি নিম্নচাপ অঞ্চল বিধায় আশপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বাতাস বেঁকে বেঁকে এই কেন্দ্রের চোখের দিকেই ধাবিত হয়।
কোরিওলিস বলের প্রভাব চারপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে আগত বাতাস পাক খেয়ে খেয়ে অগ্রসর হওয়ায়, চোখের চারপাশে (দেওয়ালে) চক্র তৈরি করে ফেলে বিধায় চোখ অঞ্চল বাতাসের/ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবমুক্ত রয়ে যায় এবং এর ফলে চোখের ওখানে বাতাস শান্ত থাকে।

ঘূর্ণিঝড়ের চোখ অঞ্চল যত উষ্ণ থাকে, ঝড় তত বেশি শক্তিশালী হয়। কারণ যত বেশি উষ্ণ হবে তত বেশি উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বাতাস আসতে থাকবে এবং ঘূর্ণির পরিমাণ বাড়াতে থাকবে। এর ওপরে মেঘ থাকে না বললেই চলে।

Eye wall :

ঘূর্ণিঝড়ের চোখের চারপাশের অংশকে Eye wall বলে।
চোখটির বৃত্তাকার পরিসীমার বাইরে প্রায় ৬০-৬৫ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় যাকে চোখ-দেওয়াল বলা হয়, সেখানে বাতাসের বেগ এবং বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি।
চোখের এর চারপাশের অংশে শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ বিরাজমান থাকে এবং ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অংশ হলো এটা (দেওয়াল)। এই অংশে বাতাস খুব শক্তিশালী হয়, যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।
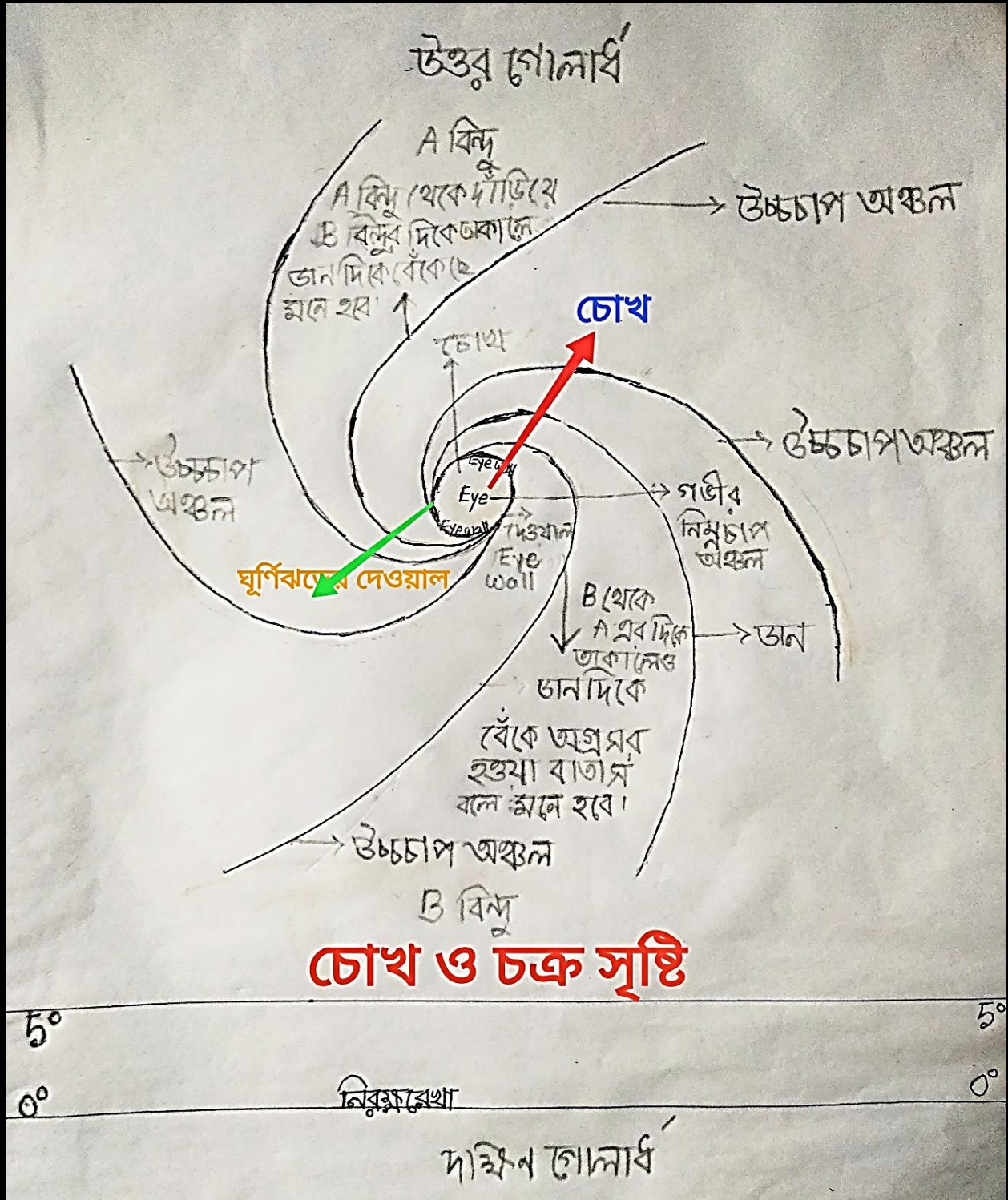
চোখের বাইরে যে ঝড়ো দেওয়াল তৈরি হয় তাতে ঝড়ের ক্ষমতা অনুসারে বাতাসের গতি ২৫০-৩০০ কিলোমিটার/ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। এই বাতাসের সাথে থাকে অবিরাম প্রচুর বৃষ্টিপাত। একই সাথে সমুদ্র থেকে উত্থিত দেওয়াল সদৃশ জলোচ্ছ্বাস। এই জলোচ্ছ্বাস ঝড়ের ক্ষমতা অনুসারে প্রায় ৭৫ মিটার

পর্যন্ত হতে পারে। সমুদ্রের জোয়ারের সময় জলোচ্ছ্বাস হলে, তা ভয়ংকর রূপ লাভ করে। উপগ্রহ চিত্রগুলিতে এ চোখের গঠন বা আকৃতি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

স্পাইরাল ব্যান্ড/রেইন ব্যান্ড :

মেঘের দেওয়ালকে ঘিরে থাকে দুটি স্পাইরাল ব্যান্ড। মেঘের দেওয়ালের চারদিকে দুটি স্পাইরাল ব্যান্ড থাকে যাকে উপগ্রহ থেকে দেখলে ছোটোখাটো গ্যালাক্সি মনে হয়। এটি বেশ কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ হতে পারে। এই অঞ্চলের প্রভাব স্থলভাগে যেখানে পড়ে সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটায় সেই কারণে এটির আরেক নাম রেইন ব্যান্ড।

চোখ-দেওয়ালের বাইরের সীমানা থেকে বাতাসের বেগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ঘূর্ণিঝড়গুলি প্রায়শই কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে একটি লম্বা লেজের মতো অঞ্চল নিয়ে আবর্তিত হয় এবং এ প্রলম্বিত অংশে একাধিক বলয় থাকে। সমগ্র বিষয়টি একটি সর্পিলাকার কাঠামো তৈরি করে যা অনেকটা ‘উলটানো কমা’ বা ‘উদ্ধরণ চিহ্নের’ মতো। ঘূর্ণিঝড়ের লেজটি কয়েক শত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের লেজের মতো অংশটি সাধারণত প্রাণকেন্দ্র বা মূল অংশটির পূর্বেই ভূমিকে অতিক্রম করে যার ফলে ঝড়ের পূর্বে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার শুরুতে প্রায়শই বৃষ্টিপাত ঘটে। এ ধরনের লক্ষণ সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত হতে পারে।

বহিঃসীমা অঞ্চল :

এটি ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বাইরের অঞ্চল। যখন কোনো ঘূর্ণিঝড় স্থলভাগে প্রবেশ করে তখন সবার প্রথম এই অঞ্চলের প্রভাব পরে। এটিকে ঘূর্ণিঝড়ের সীমানাও বলা যায়।

ঘূর্ণিঝড়ের স্থলভাগে আঘাত করা বা আছড়ে পড়া বলতে কী বোঝায় ?

ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ল্যান্ডফল (landfall) বা স্থলভূমিতে আছড়ে পড়া বলতে বোঝায় যে, ঘূর্ণিঝড়ের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে স্থলভূমিতে প্রবেশ বা আঘাত করা। ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রস্থল যে তীব্রতার সঙ্গে স্থলভূমিতে প্রবেশ করে তার ওপর নির্ভর করে ঘূর্ণিঝড়টি কোন শ্রেণীর তা নির্ণয় করা হয়। একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে সেটির চোখ (eye) স্থলভাগের ওপর ঘুরতে থাকে। এর ফলে স্থলভাগের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের চোখের চারপাশের অংশ অর্থাৎ eye wall অংশটিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাত ও ঝড় হয়। তবে স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি কমতে থাকে।

সমুদ্র থেকে ছুটে এসে স্থলে আঘাত হানার পর স্থলের কারণে জলীয়বাষ্প সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বা জলীয়বাষ্প সরবরাহ খুব কমে যাওয়ায়, ঘূর্ণিঝড়টি স্থলে এসে সাগরের মতো সুবিধা করতে পারে না। সাগরে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির মূল নিয়ামক সে উষ্ণবায়ু, জলীয়বাষ্প, সাগরের নিম্নচাপ অঞ্চল, এসব স্থলে এসে আর ওভাবে আর না পাওয়ায় ঘূর্ণিঝড় ক্রমশ দুর্বল হয়ে সমাপ্তির পথে হাঁটে।

নিউটনীয় মহাকর্ষ ও আইনস্টাইন
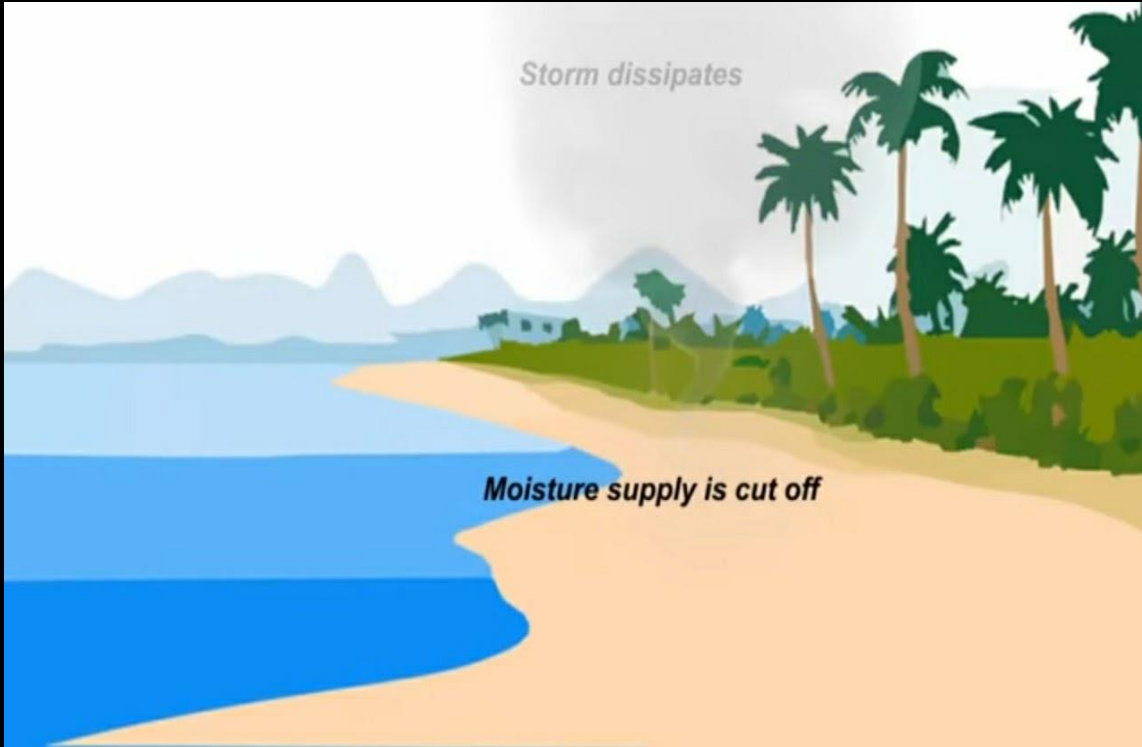
মোঃ শহিদুল্লাহ

শিক্ষার্থী, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ।

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে আমাদের কারোরই কৌতূহল কম নয়। অনেক আগে কোনো এক সময় ধারণা করা হতো, পৃথিবী সমতল। একটি প্লেটের ন্যায়। কিন্তু প্রকৃতির নানা আচরণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জাগায়। নদীতে বা সাগরে দিগন্ত থেকে আসা কোনো নৌকার দিকে তাকালে আগে নৌকার পাল দেখা যায়, তারপর নৌকা দেখা যায়। এমনটি কেন হয়? এরকম অনেক প্রশ্নই মানুষকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, পৃথিবী গোল। তারপর ধারণা করা হতো যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই চাঁদ, সূর্য সবাই ঘুরছে।

তারপর কোপার্নিকাস যদিও জানতে পারেন যে, সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে, তিনি তা প্রকাশ করতে ভয় পান। সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী কেপলার অনুভব করেন কোনো একটি বলের কারণে গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং তা বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার পথে। তবে কী ধরনের বল তা তিনি জানতেন না।

পরবর্তীতে মহাবিজ্ঞানী নিউটন নিয়ে আসেন তার মহান মহাকর্ষ সূত্র।

কাউকে যদি মহাকর্ষ সূত্র সম্পর্কে বলতে বলা হয় তাহলে তার জন্য হয়তো প্রথমে নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার ঘটনা বলা বাধ্যতামূলকই হয়ে ওঠে, তাই না? নিউটনের মাথায় আপেল পড়ল আর তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন মহাকর্ষ। কিন্তু নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার ঘটনার সত্যতা কী? আপেলের কাহিনির কোনো হদিস আছে কি নেই, তা আমার জানা নেই।

তবে আমাদের (শিক্ষার্থী) কাছে কখনো কখনো একটি কথা কী বলা হয়েছে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে কথাটি কীভাবে বলা হয়েছে। তাই হয়তো-বা শিক্ষকরা আপেল দিয়েই মহাকর্ষ শুরু করেন, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য।

"মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে আকর্ষণ করে। আর এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। এই বল বস্তু দুটির ভরের কেন্দ্রদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।" এটিই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র।

মহাকর্ষ বলের কারণেই সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে। উপবৃত্তাকার পথের কারণে গ্রহগুলো কখনো সূর্যের কাছে চলে আসে, আবার কখনো সূর্য থেকে দূরে সরে যায়। এভাবেই ঘুরতে থাকে। কোনো একটি গ্রহ যখন তার গতিপথে সূর্যের সবচেয়ে

কাছে অবস্থান করে সেটিকে তার অনুসূর অবস্থান বলে। আর গ্রহটির গতিপথের যে বিন্দুটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে সেটিকে ওই গ্রহের অপসূর বিন্দু বলে।
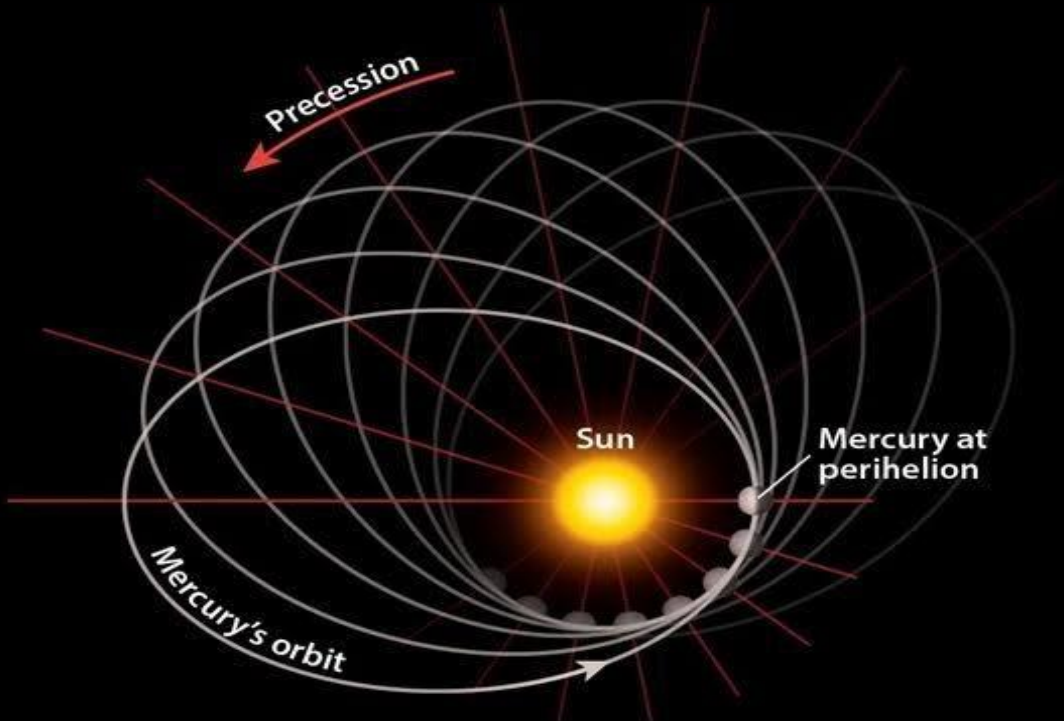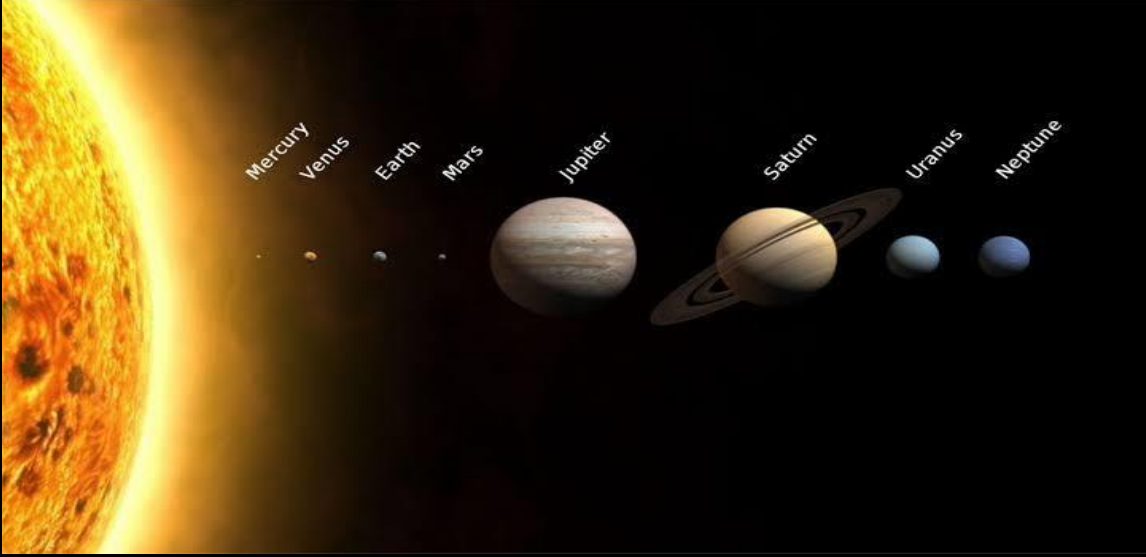
সৌরজগতে সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হলো বুধ গ্রহ। কিন্তু এটাকে নিয়েই তৈরি হলো বড়ো এক ঝামেলা।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী সৌরজগতের সকল গ্রহ একটি নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। আর একটি নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরলে গ্রহগুলোর অনুসূর বা অপসূর বিন্দুও নির্দিষ্ট হওয়ার কথা, তাই না?
গ্রহ "ভলকান"
কে কল্পনা করেন। কিন্তু বাস্তবে এই প্রস্তাবিত গ্রহ ভলকানের কোনো অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি।
তাহলে বুধের গতিপথ এর কী হবে?

নিউটনের সূত্র ব্যাখ্যা দিতে পারে না এটা শুনে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ আইনস্টাইন নিয়ে আসছেন মহাকর্ষের নতুন ব্যাখ্যা।

আইনস্টাইনের মতে-স্থান-কালের বক্রতার কারণেই গ্রহগুলো নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে

বুধ গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। আর সূর্যের যত কাছে যাওয়া যায় বক্রতা তত বাড়তে থাকে। বুধ গ্রহটি সূর্যের কাছে হওয়ায় এটি অন্যান্য গ্রহ

কিন্তু পর্যবেক্ষণ অন্য কথা বলে। পর্যবদিষ করে দেখা যায় বুধ গ্রহের অনুসূর বিন্দু আস্তে আস্তে একটু সরে যায়। বুধের এই ঘটনাকে অনুসূরের অগ্রগমন বলে। মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী অনুসূর বিন্দু নির্দিষ্ট থাকার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না! বুধ গ্রহের এই গতিবিধি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অনেকেই সূর্য ও বুধের মাঝে নতুন একটি

ঘুরছে। স্থান-কালের ওপর সকল ভরের বস্তুই একটি বক্রতা সৃষ্টি করে। আর এই বক্রতার কারণেই গ্রহগুলো নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। সকল ভরের বস্তুই স্থান-কালে বক্রতা তৈরি করে। নক্ষত্রের কেন্দ্রের দিকে বক্রতা থাকে সবচেয়ে বেশি। নক্ষত্র থেকে যত দূরে যাওয়া হয়, স্থান-কালের বক্রতাও তত কমতে থাকে।

অপেক্ষা বেশি বক্রতায় অবস্থান করে। অনেক বক্রতায় অবস্থান করার কারণে বুধ অনুসূর বিন্দুতে থাকাকালীন সময়ে সূর্যের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, যার কারণে তার অনুসূর বিন্দু একটু অগ্রসর হয়।
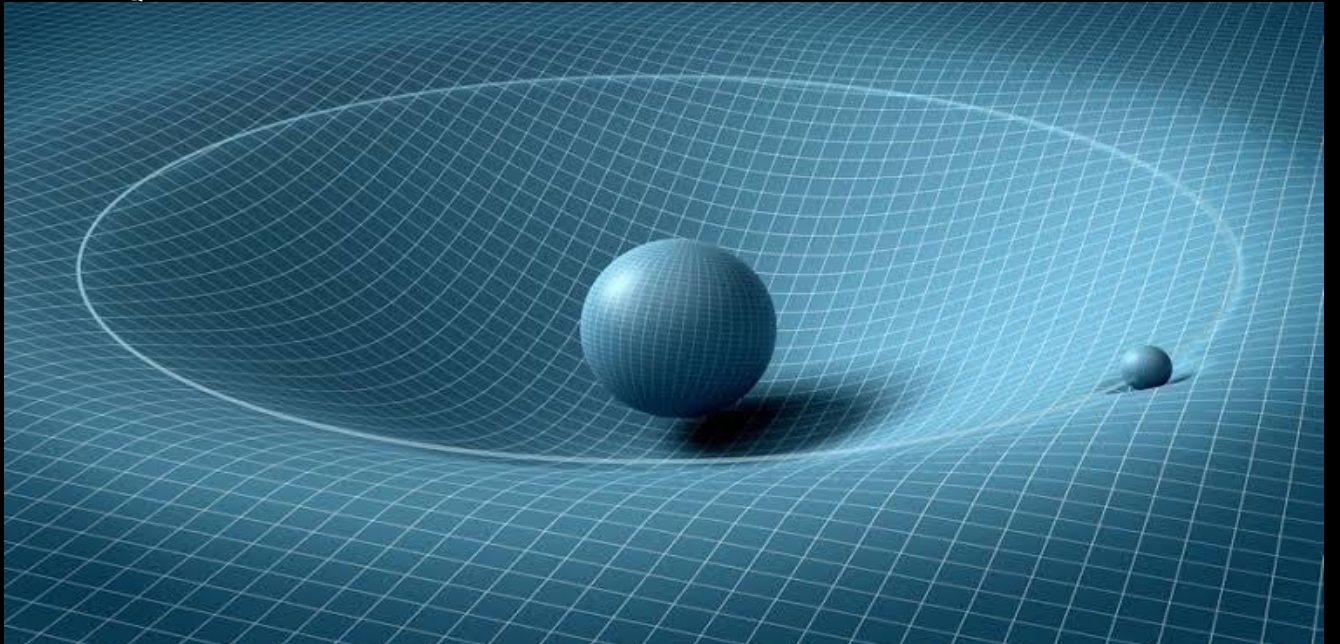
কলোসাল আর জায়ান্ট স্কুইড। গভীর সমুদ্রের সবচেয়ে রহস্যময় জায়ান্ট হলো এই স্কুইডগুলো। এদের বিশাল দানবীয় শরীর ক্র্যাকেনের গল্পের জন্ম দেয়। এদের ফুটবলের সমান চোখ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে শিকারের দিকে। লেখক- নাঈম হোসেন তারুকী; অঙ্কনে রওনাক আহমেদ সামিন

সুনামি

আবু রায়হান
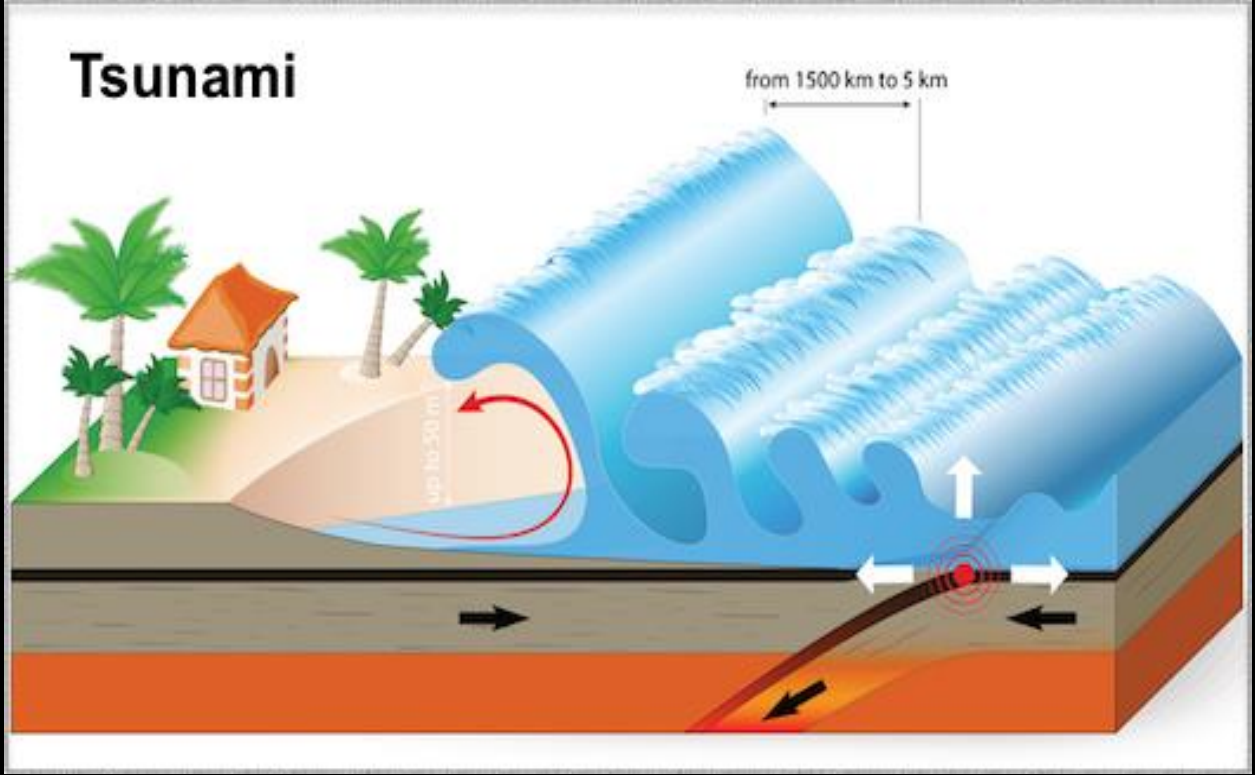
সুনামি:

সুনামি (Tsunami) 'সুনামি' জাপানি শব্দ। বাংলায় এর অর্থ 'পোতাশ্রয়/বন্দর ঢেউ'। সাগর বা নদী বা অন্য কোনো জলক্ষেত্রে ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, আগ্নেয়গিরির উদগিরণ কিংবা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকেই বলা হয় সুনামি।

কারণসমূহ :

বিভিন্ন কারণে সুনামির সৃষ্টি হতে পারে। কারণগুলো হলো :

১। ভূমিকম্প(Earthquake),

২। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত (Volcanic Eruption),

৩। ভূমিধ্বস (Landslide),
৪।তুষারধ্বস
৫। উল্কাপাত
৬। আর নিউক্লিয়ার বোমা টেস্ট করতে গিয়ে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিউক্লিয়ার বোমা দ্বারা কৃত্রিমভাবেও সুনামিও ঘটানো যাবে।

যাহোক, সুনামি সংঘটনের অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কারণটি হলো সমুদ্রতলে টেকটোনিক পেটের আকস্মিক উত্থান-পতন এবং তার ফলশ্রুতিতে সমুদ্রতলে ভূমিকম্প সংঘটন।
আজকের আলোচনা মূলত এ প্রধান কারণটা নিয়েই।

১। ভূমিকম্প দ্বারা সুনামি :

সমুদ্রতলে ভূমিকম্প হলে তা সমুদ্র তলদেশের মাটিকে যেমন নাড়া দেয় তেমনই স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্রতলের উপরিস্থ পানিতেও তার কম্পন সৃষ্টি হয়। ভূমির কম্পন যখন পানিতে সঞ্চালিত হয় তখন তার ফলে সুনামির উৎপত্তি হতে পারে। এছাড়াও সাধারণত ভূমির অভ্যন্তরে টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া হতে থাকে। এভাবে কখনো কোনো একটি প্লেট অপর প্লেটের দিকে অনবরত ধাক্কা দিতে থাকলে একসময় একটি প্লেট আরেকটি প্লেটের ওপর উঠে যায়। তখন ওই স্থানের ভূ-ত্বক আচমকা উঁচু হয়ে ছোটো টিলা থেকে পাহাড় সমান পর্যন্ত উঁচু হয়ে যেতে পারে। ফলে সে উঁচু হওয়া সমুদ্র অংশের পানি তার সাম্যাবস্থা বা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিশাল উঁচু ঢেউয়ে পরিণত হয় এবং সে উঁচু হওয়া ঢেউ অগ্রসর হয়ে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর দিকে ধাবিত হয় এবং ঢেউ যদি বেশি উঁচু হয়ে থাকে তবে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলো ঢেউয়ের নিচে পড়ে ভেসে যায়, সমুদ্রের পানি স্থলে প্রবেশ করে এবং তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষদের জীবন ভয়াবহ সংকটের মাঝে পড়ে যায়।

সমুদ্র, নদী, জলাশয় কিংবা বৃহৎ জলক্ষেত্রের পানিও হঠাৎ ফুলে উঠে সুনামির সৃষ্টি হয়। (এসব কেমনে হয়, কেন হয় বিস্তারিত আসছে)
গভীর জলে সুনামি প্রতি ঘন্টায় ৬০০ মাইল (প্রায় ৯০০-৯৫০ কিলোমিটার) গতিরও হতে পারে।
সুনামির ঢেউ সাধারণত ধারাবাহিক হয় এবং একটি ঢেউয়ের চূড়া থেকে আরেকটি ঢেউয়ের চূড়ার দূরত্ব (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) ১০০ মাইলের (১৬০ কিলোমিটার) মতো হতে পারে। তাই একটি বড়ো ঢেউ আঘাত করার মোটামুটি ১ ঘন্টা বা সামান্য বেশি সময় পর দ্বিতীয় আরেকটি এবং আরও ১ ঘন্টা পর তৃতীয় আরেকটি, এভাবে ঢেউগুলো ভূ-ভাগে এসে আঘাত করতে পারে।
সুনামি হওয়ার কারণ হিসেবে মূলত পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া, উত্থান-পতন এবং সে নড়াচড়ার কারণে সমুদ্রের ভূ-ত্বক উঁচু হওয়াকে প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করা যায় যদিও আরও কারণ আছে।
এখন প্রশ্ন হলো-
১। সমুদ্রের মাঝখানের ভূ-ত্বক উঁচু হয় কেন ?
২। টেকটোনিক প্লেট নড়াচড়া করে সমুদ্রতলের ভূ-ত্বক কীভাবে উঁচু করে দিতে পারে ?
৩। উঁচু হয়েই কীভাবে সুনামি ঘটায় ?

ওপরের দুইটি প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন টেকটোনিক প্লেট কেন নড়াচড়া করে এবং পৃ্থিবীর ভূস্তরগুলো কেমনে কী।

এসব জানতে বা বুঝতে পারলে ওপরের দুটি প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারা সহজ হয়ে যাবে।

টেকটোনিক প্লেট কেন সরে যায় ?   টেকটোনিক প্লেট সরে গিয়ে কীভাবে সুনামি ঘটে ?

আমরা অনেকেই বাসায় বিভিন্ন জাতীয় খাবার চুলায় সিদ্ধ করে থাকি। লক্ষ করলে দেখা যাবে যখন চুলার তাপ বৃদ্ধি পেয়ে পানি ফুটতে শুরু করে তখন রান্না করা খাবারগুলো গতিপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত পানির ওপরের দিকে ঠেলে উঠতে থাকে এবং এ প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাপ প্রবাহ বিদ্যমান থাকে।
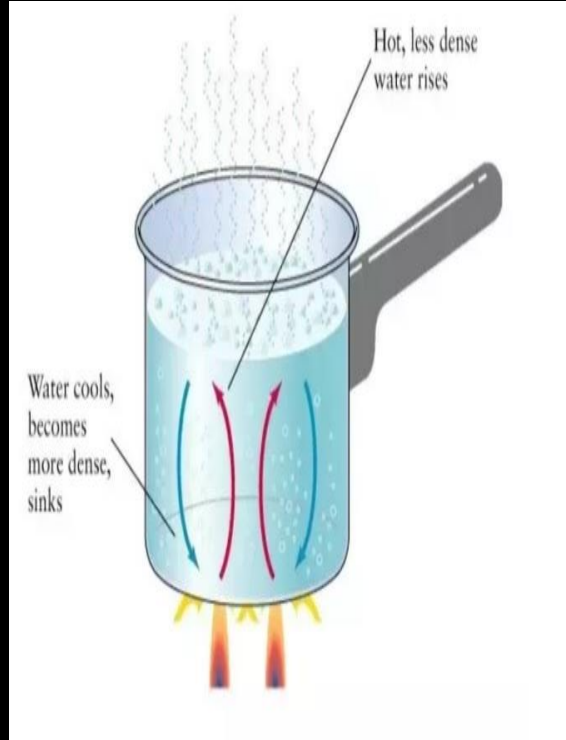
যখন তাপপ্রবাহ কমতে থাকে অথবা পানি শীতলতর হতে থাকে তখন আবার খাবারগুলো ধীরে ধীরে নিচে নামে এবং পানির নিচের স্তরে জমা হয়। যেহেতু পাত্রের নিচের দিকে তাপমাত্রা বেশি তাই সেই অংশ থেকে খাবারগুলো ওপরে উঠে আসে খুব দ্রুত এবং পাত্রের ওপরের তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকায় সেখানে খাবারগুলো তুলনামূলক ঠান্ডা হয়ে, ঘনত্ব বেড়ে ভারী হয়ে অভিকর্ষের টানে নিচের দিকে পতিত হয়। আবার সেগুলো নিচে এসে তাপ পেয়ে হালকা হয়ে বা ঘনত্ব কমে আবার ওপরে উঠে যায়, আবার নিচে নামে। এভাবে এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে। ফলে এ চক্রটিতে একটি কনভেকশন সেল সৃষ্টি করে
(চিত্রে দেখুন কনভেকশন সেল)
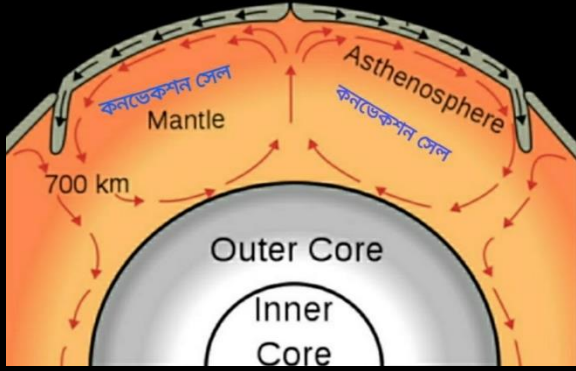
খেয়াল করবেন যে পানি যখন ওপরে টগবগ করে ওঠে তখন সে ফুটন্ত পানির টগবগ করার কারণে পানির ওপরে কোনো কিছু ভেসে থাকলে তার সরণ হয়, টগবগে পানির কারণে পানির ওপরে ভাসমান কোনো কিছু আর স্থির বা নড়াচড়াহীন হয়ে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে না, নড়াচড়া করতে বাধ্য হয়, স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়। এভাবে তাপের সঞ্চারণকে Thermal Convection (তাপের পরিচলন) বলে।

এ পদ্ধতিতে তাপ কোনো পদার্থের অণুগুলোর চলাচলের দ্বারা উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সঞ্চালিত হয়।
বিশেষত তরল ও বায়বীয় পদার্থগুলোতে এ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয়। তাপ গ্রহণ করে পদার্থের উষ্ণতর অংশের অণুগুলো শীতলতর অংশের দিকে প্রবাহিত হয়, এভাবে অন্য অণুগুলো স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজ গতির সাহায্যে তাপ সঞ্চালিত করে।

Convection Currents

Continents move apart

Continents move together

Mantle

Core

Mantle
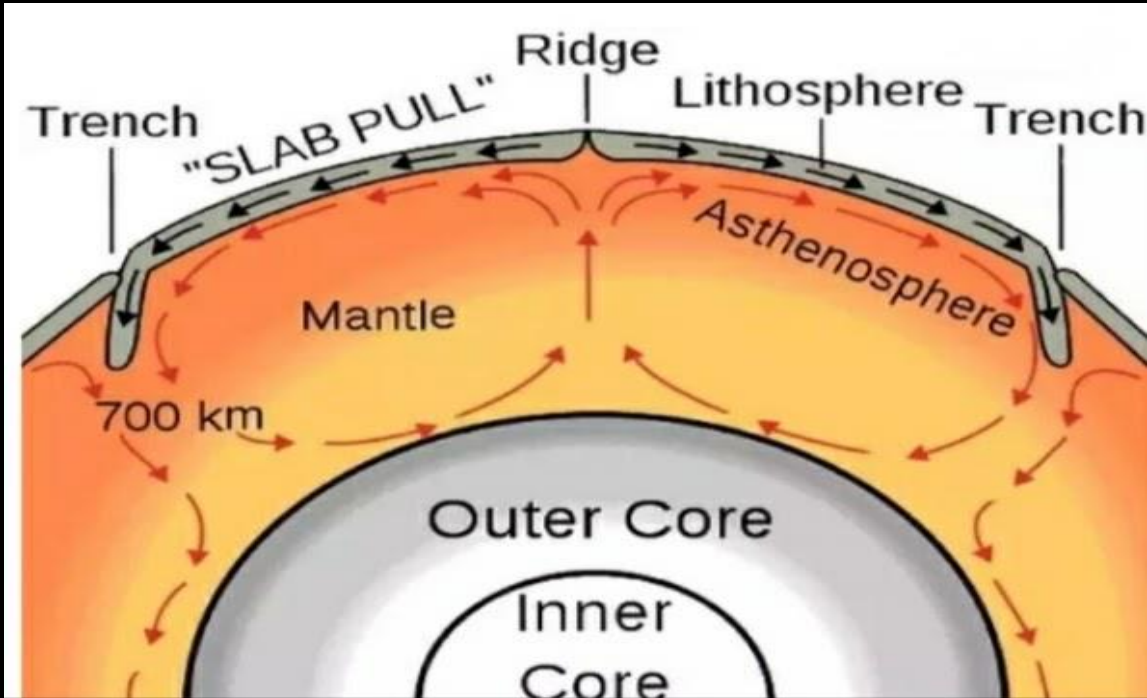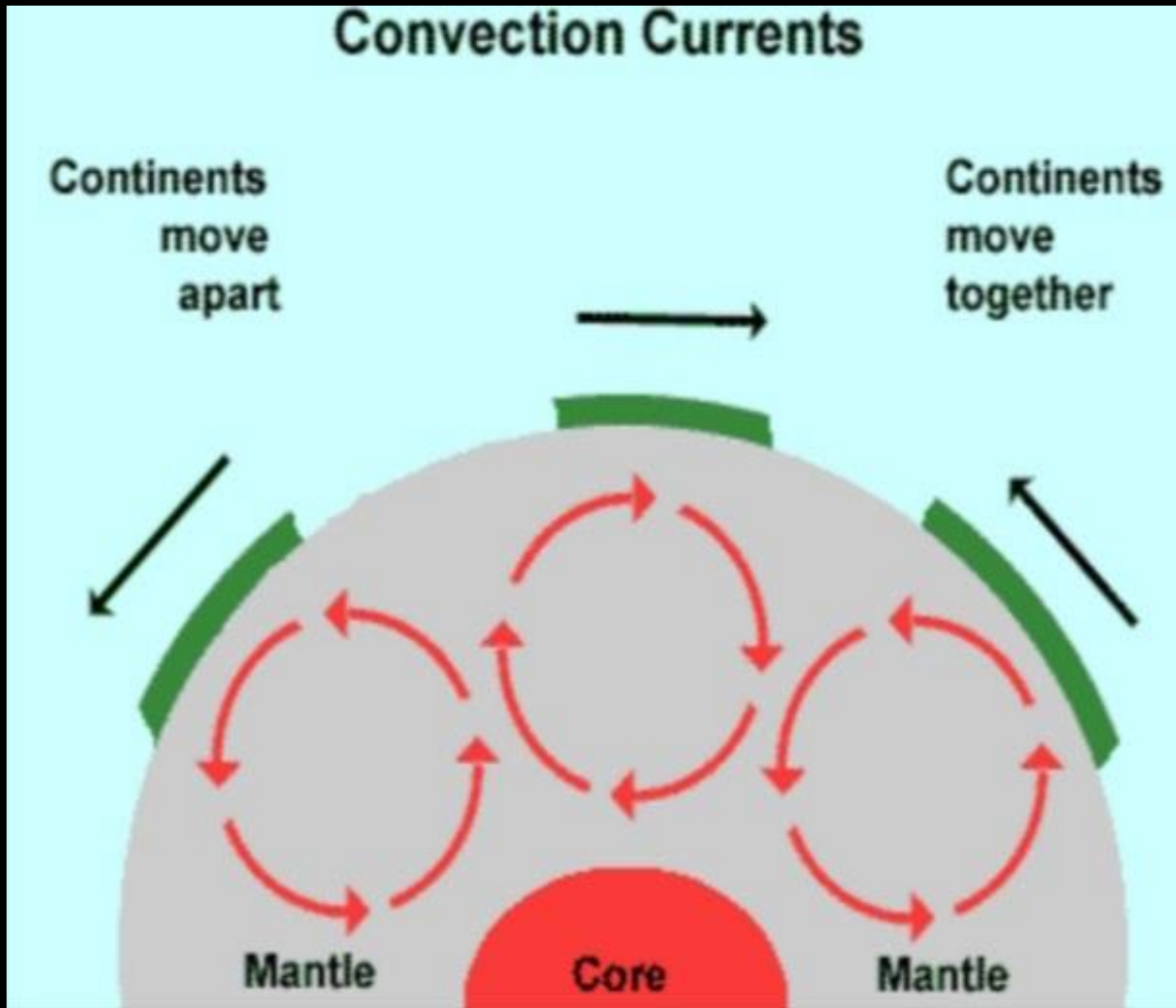
পৃথিবীর ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ঠিক একই প্রক্রিয়া ঘটে এবং এই ধর্মের প্রভাবে টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া হয় বলে মনে করা হয়।

পৃথিবীর ভূগর্ভের গঠন চিত্রে দেখুন।

এই গঠনটি কিছুটা পেঁয়াজের মতো, পেঁয়াজকে কাটলে অনেকগুলো স্তর পাওয়া যায় এবং একেক স্তরের পুরুত্ব একেক রকম। টেকটোনিক প্লেট নিয়ে আলোচনায় সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো ভূঅভ্যন্তরের গঠন জানা, Lithosphere ও Crust এর গঠন এবং কার্যপ্রণালী বিস্তারিতভাবে জানা।

EARTH STRUCTURE

CRUST
0-35 km

LITHOSPHERE
35-100 km

ASTHENOSPHERE
100-700 km

MANTLE
700-2890 km

OUTER CORE
2890-5100 km

INNER CORE
5100-6378 km
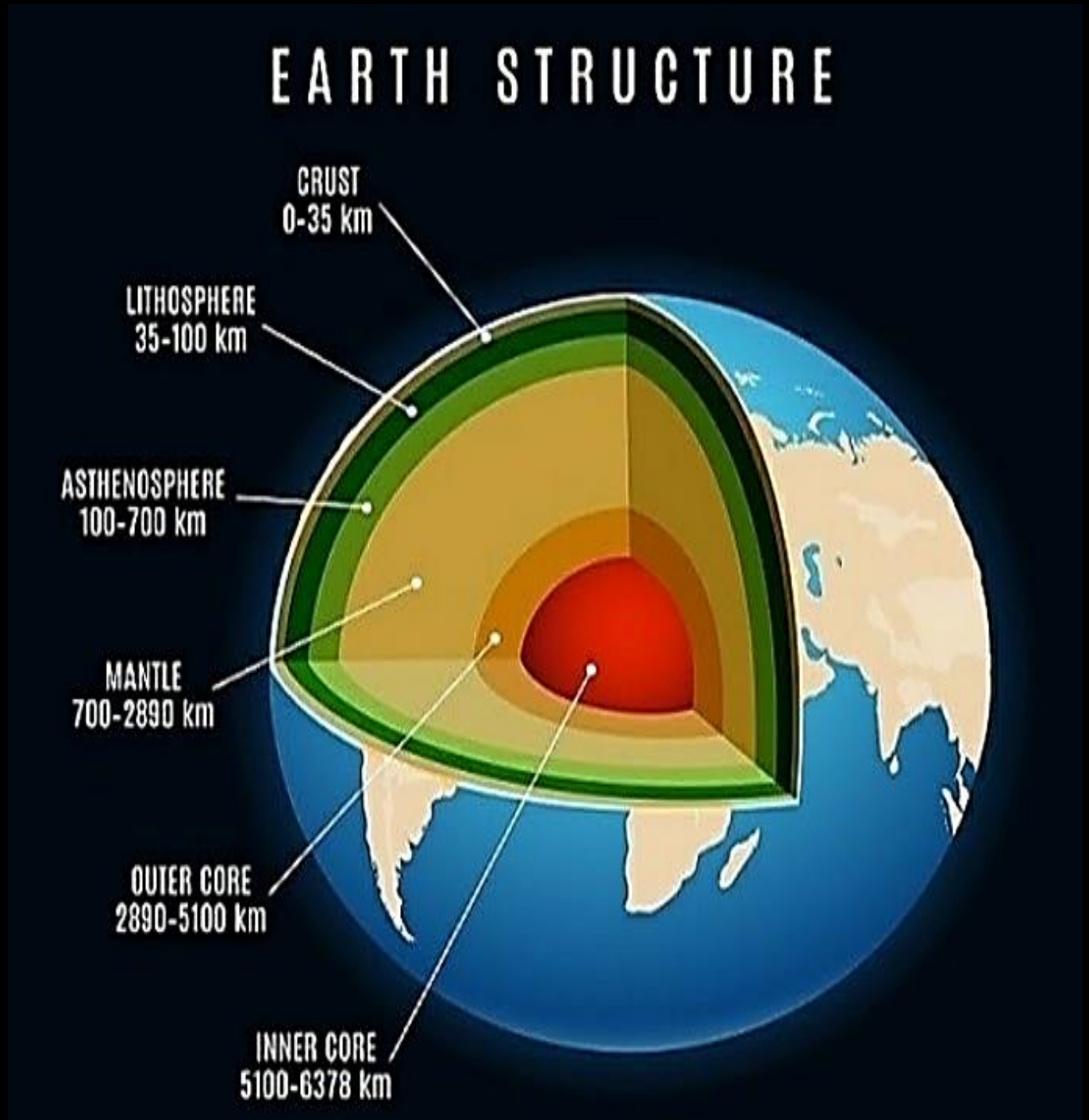
টেকটোনিক প্লেট কী ?

পৃথিবীর কেন্দ্রে যে গোলাকার রক্তিম বলয়টি (Inner core) দেখা যাচ্ছে সেটা অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং

এর তাপমাত্রা সূর্যের পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রার কাছাকছি। ইনার কোর (Inner core) মূলত কঠিন লৌহ পদার্থের তৈরী। এরপর যে আউটার কোর (Outer core) দেখা যাচ্ছে সেটা আসলে লৌহ এবং নিকেলের তৈরী তরল স্তর (Fluid layer)। এর ওপরে সলিড Mantle অবস্থিত। 'জার্নি টু দ্য সেন্টার অভ আর্থ' লেখাটা পড়ুন, ধারণা আরও সমৃদ্ধ হবে।

ম্যান্টেলের সবচেয়ে বাইরের দিকে Asthenosphere স্তর দেখা যাচ্ছে, সেটিও কঠিন পাথর, কিন্তু এটি বেশ দুর্বল স্তর, কারণ এটি আলকাতরা বা পিচের মতো (যেমন Tar) যেটিকে উত্তপ্ত করলে গলিত হয়ে গঠন পরিবর্তন করে এবং শীতল হলে আবার কঠিনে পরিণত হয়। মানে এ স্তরটি কঠিনও নয় তরলও নয়।

এর ওপরে যে ভাসমান কঠিন অশ্মমণ্ডল (Lithosphere) দেখা যাচ্ছে, সেখানেই টেকটোনিক প্লেট (Tectonic plate) এর অবস্থান। আমাদের ভূপৃষ্ঠ এসব কিছু খণ্ড খণ্ড টেকটোনিক প্লেটের সমন্বয়ে জিগস পাজলের মতো হয়ে তৈরি।

টেকটোনিক প্লেট Lithospheric plate নামেও পরিচিত। Crust হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠতল। ওপরের ছবিতে Crust এবং Lithosphere কে আলাদা স্তর হিসেবে দেখানো হলেও ভূতত্ত্ববিজ্ঞানে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এ দুই স্তরকে একটি স্তর হিসেবে ধরে নিতে পারি। অর্থাৎ, Crust হলো Lithosphere এর একটি উপ-স্তর।
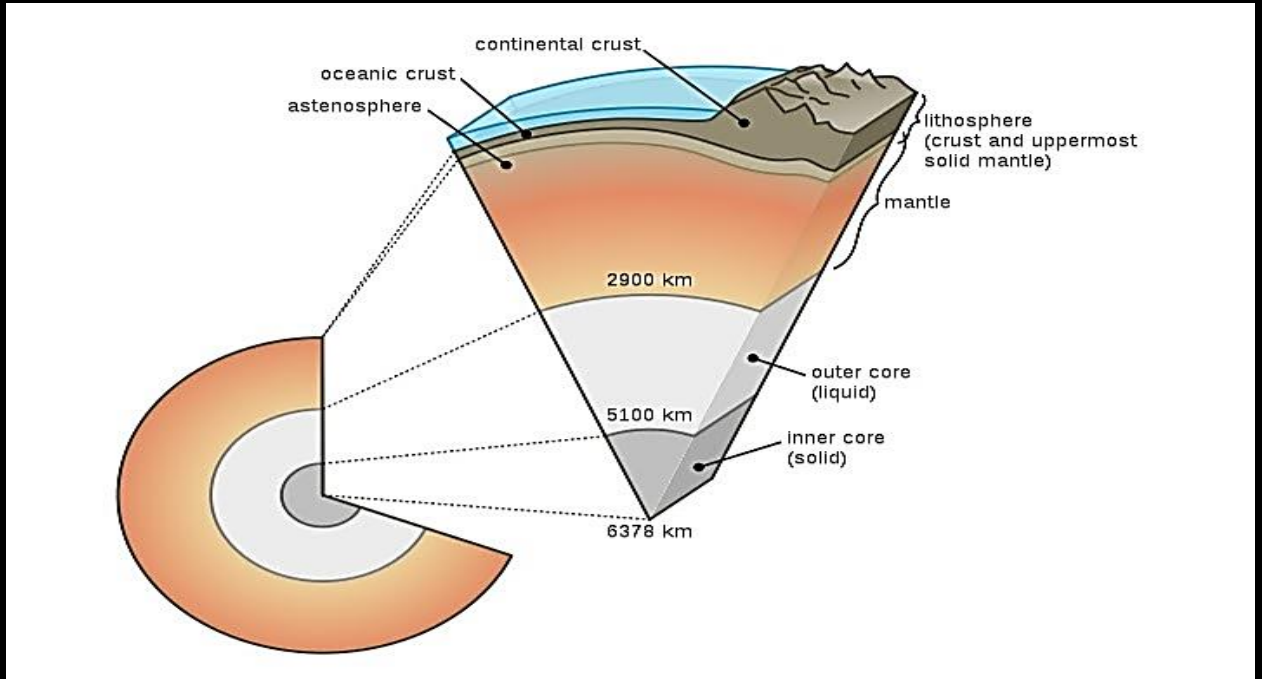
অশ্মমণ্ডল বা Lithosphere স্তর বেশ শক্তিশালী এবং দৃঢ় পাথর দিয়ে তৈরী। এ স্তরটি সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত:

একটি হলো Oceanic crust (পৃথিবীর যে অংশে সাগর) এবং আরেকটি হলো
Continental crust (স্থলভাগ)।

নিচের ছবিতে মাঝের উঁচু কালো অংশটা হলো Continental crust এবং দুইপাশের ঢালু (পানির নিচের) কালো অংশ হলো Oceanic crust।
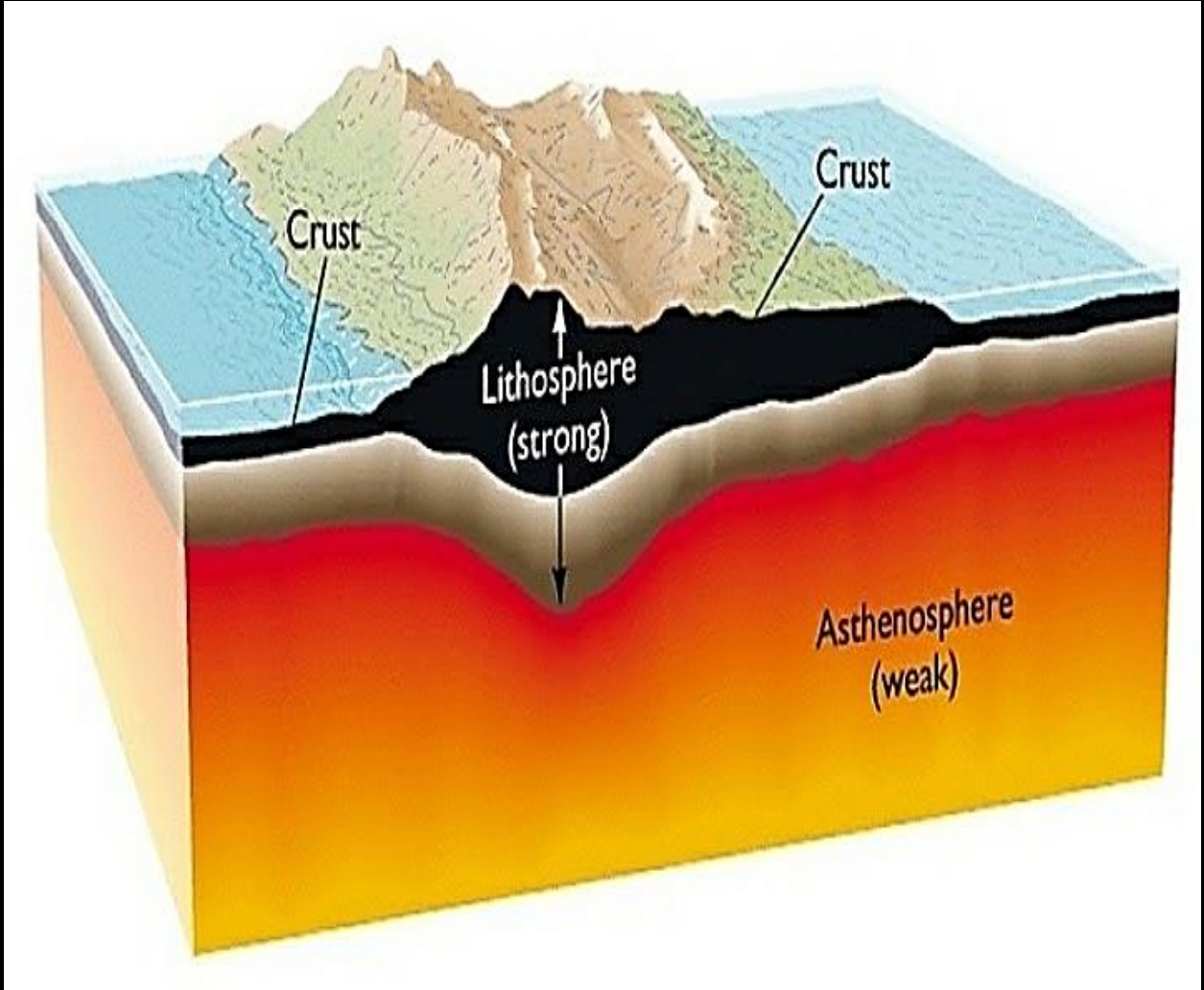
Oceanic crust এর পুরুত্ব খুব পাতলা (মাত্র ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার।) অন্যদিকে Continental crust- এর পুরুত্ব অনেক গভীর (প্রায় ৩০-৫০ কিলোমিটার)।
Lithosphere স্তর-এর ভূমির অভ্যন্তরীণ গঠনের জটিলতা এবং বৈচিত্র্যতার কারণে নানা সময়ে আমাদের প্রাকৃতিক আকস্মিক বিপর্যয় (যেমন : ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি ইত্যাদি)-এর সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিচের মানচিত্রে কালো মোটা দাগ দিয়ে টেকটোনিক প্লেটগুলোর সীমানা ভাগ করে দেখানো হয়েছে।
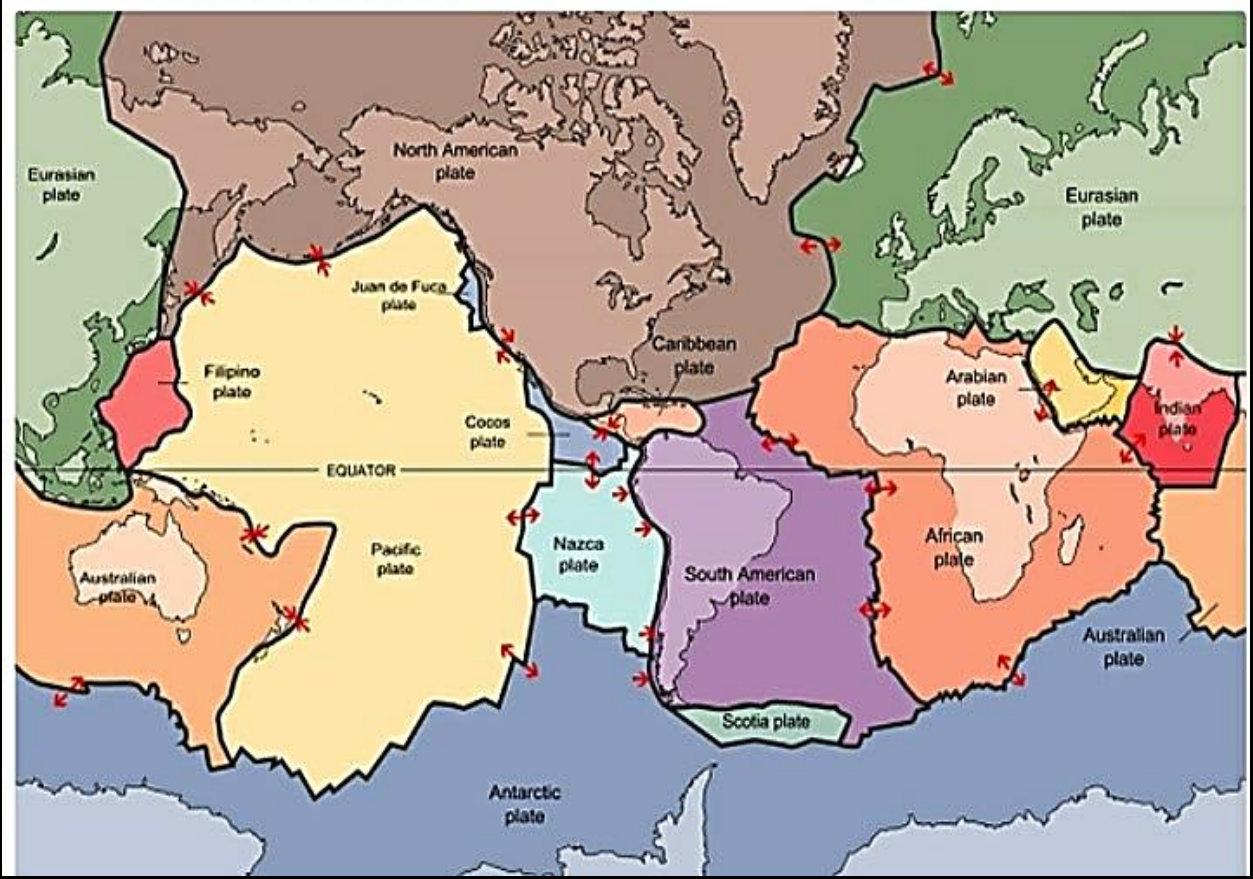
এবার চলুন আসল প্রশ্নের উত্তরে আসি। টেকটোনিক প্লেট কেন সরে যায় ?

প্রথমেই আমি ফুটন্ত পানিতে রান্না করা খাবারের উপমা দিয়ে বস্তুর গতির ধরণ বোঝাতে চেয়েছিলাম। তাপ প্রবাহের কারণে বস্তুর কণাগুলো ওপরে উঠে এবং তাপমাত্রা শিথিল (শীতল) হলে কণাগুলো নিচে নামে এবং এই ধর্মকে একটি চক্রাকার আবর্তন হিসেবে কল্পনা করা যায়।

পদার্থবিজ্ঞানে এটাকে থার্মাল কনভেকশন/তাপীয় পরিচলন (Thermal convection) বলে, থার্মাল কনভেকশন একধরণের হিট ট্রান্সফার (Heat transfer) প্রক্রিয়া (দেখতে কিছুটা নিচের ছবির মতো)।

মহাসাগর কী?

বারিমন্ডলের প্রায় ৯৭% পানিধারণ করে মহাসাগর। মহাসাগর হলো বিশাল আকৃতির পানির আধার যা মহাদেশগুলোকে একে অপরের থেকে আলাদা করে রেখেছে।
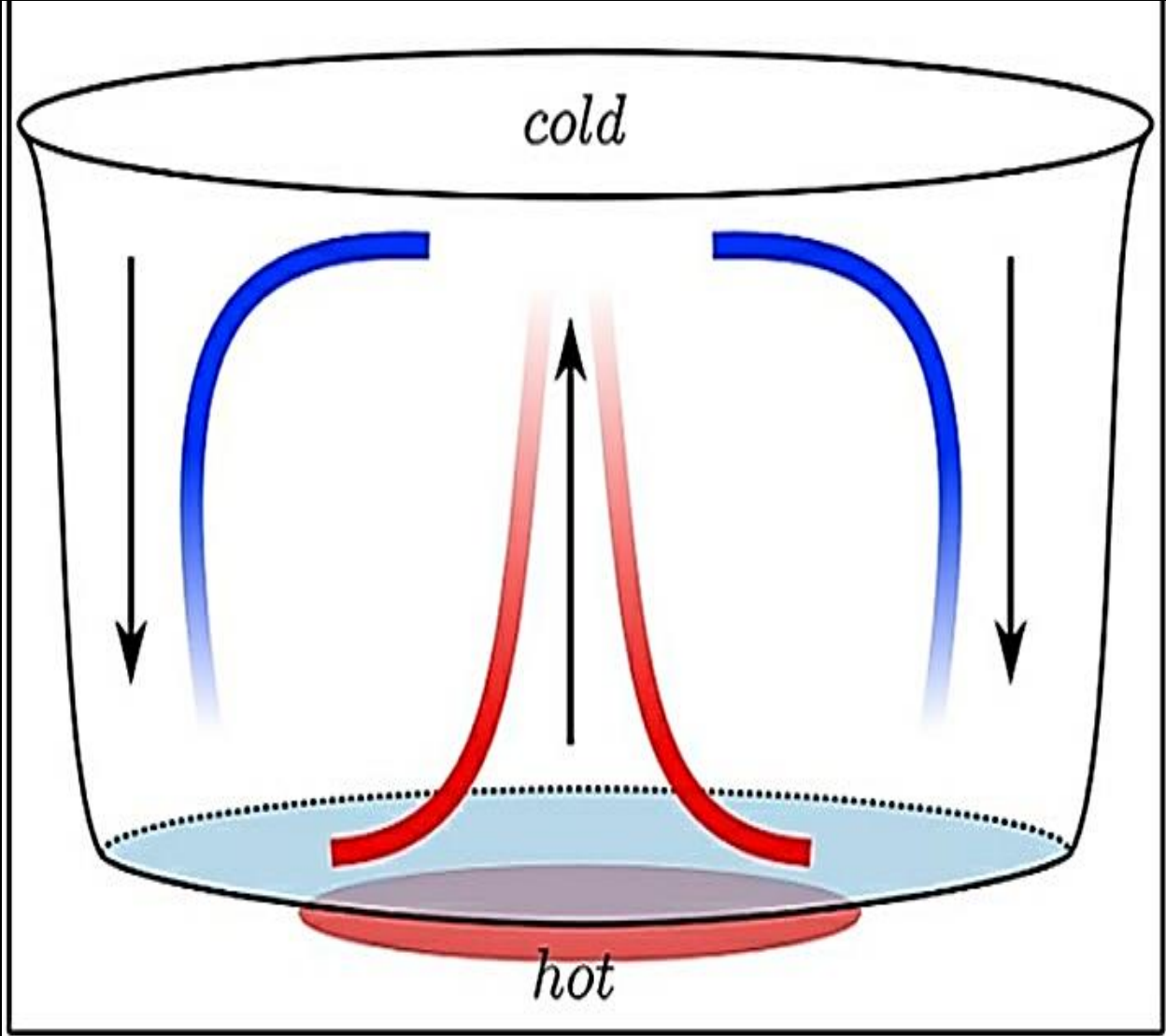
এবার নিচের ছবিটি দেখুন, ওপরের ছবির সাথে কোনো মৌলিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় কি না। এখানে মূলত যে ঘটনাটি ঘটছে সেটি হলো Inner core এর প্রচন্ড উত্তপ্ততার কারণে Outer core উত্তপ্ত হচ্ছে। ফলস্বরূপ ম্যান্টলের বাহ্যিক অংশ (Asthenosphere) এতটা উত্তপ্ত হয়ে যায় যে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের উপরিভাগ (লিথোস্ফিয়ার) পিচ্ছিল স্তরে (Lubricated layer) পরিণত হয় এবং যে-কোনো কঠিন পদার্থও (লিথোস্ফিয়ারে তৈরি হওয়া টেকটোনিক প্লেটগুলো) এই স্তরের ওপর ধীরে ধীরে পিছলিয়ে গিয়ে বা সরণ হয়ে একটি আরেকটির সাথে ধাক্কা খায়। ম্যান্টেল থেকে প্রভাবিত ও পরিচালিত পরিচলন প্রক্রিয়ার কারণে ম্যান্টলের ওপরে ভাসমান লিথোস্ফিয়ারেরও সরণ বা নড়াচড়া হতে থাকে এবং লিথোস্ফিয়ারের সরণের কারণে এর ওপর ভাসমান টেকটোনিক প্লেটগুলোরও সরণ ঘটে।

মনে করেন, কোনো ঠান্ডা স্থির পানির ওপরে কিছু শুকনো পাতা রেখে দিয়েছেন। পাতাগুলো মোটামুটি স্থির হয়ে ভেসে আছে। তারপর পানিকে ফুটতে দিন। দেখতে পাবেন টগবগ করে নিচের গরম পানি ফুটে

ওপরে উঠে গিয়ে সে টগবগিয়ে ওঠা পানি তার ওপর ভাসমান পাতাগুলোকে নড়াচড়া করছে বা পাতাগুলোকে স্থির থেকে গতিশীল করছে।

পাতাগুলো কেন নড়াচড়া করছে ?

কারণ তাপের পরিচলন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাপের ট্রান্সফার হচ্ছে, নিচের গরম পানি ওপরে ওঠে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে, ওপরে ওঠে ঠান্ডা হয়ে পানি আবার নিচে নেমে যাচ্ছে। এর ফলে পানিতে এরূপ ক্রমান্বয়ে পরিচলন প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ায় টগবগে পানি এর ওপরে ভাসমান পাতাগুলোকেও স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসছে, পাতার সরণ ঘটছে, নড়াচড়া করছে। একই প্রক্রিয়ায় টেকটোনিক প্লেটগুলোও নড়ছে, স্থান পরিবর্তন করছে।

সহজ ভাষায় এভাবে বোঝা গেলেও ব্যাপারটি এতটা সরল নয়। কেন নয় তা সামনে আসছে।

সুনামি সংঘটনের মূল কারণের মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম, আর ভূমিকম্পের পেছনে টেকটোনিক প্লেটগুলোর বিভিন্ন রকম চলাচল ও নড়াচড়া দায়ী।

যাহোক, আগেই বলেছি Oceanic crust এর পুরুত্ব খুবই কম এবং অন্যদিকে Continental crust বেশ পুরু। কিন্তু গঠনগত উপাদানের ভিন্নতার কারণে ওশেনিক ক্রাস্টের ঘনত্ব কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টের চেয়ে অধিক ঘন।

দুটি টেকটোনিক প্লেটের পারস্পরিক সংঘর্ষই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। প্লেটের সংঘর্ষের সময় যেটির ঘনত্ব বেশি সেটা গ্র্যাভিটির কারণে অন্য প্লেটটার নিচে তলিয়ে যায় যে ঘটনাকে Subduction বলা হয়। যে প্লেটটা তলিয়ে যায় সে প্লেটটাকে subducted plate এবং যে প্লেটটা ওপরে অবস্থান করে তাকে overridding plate বলে।

এর ফলে এ দুই প্লেটের ঘর্ষণ স্থলে এবং ম্যান্টেলে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। অবনমিত প্লেটের চাপে ম্যান্টেল থেকে ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে ওপরে উঠে আসে। তখন সমুদ্রতলে পানির নিচে বা কোনো দ্বীপে আগ্নেয়গিরির উদগিরণ ঘটতে দেখা যায় এবং প্লেটগুলোর একে অপরের সাথে ঘর্ষণে সমুদ্রতলে প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে সমুদ্রতলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এবং সাথে সাথেই তার প্রভাবরূপে সুনামি সৃষ্টি হয়ে যায়। সকল সুনামি ধ্বংসাত্মক নয় বলে আমরা ধ্বংসাত্মকগুলো বাদে বাকিগুলোর ওপর নজর দিই না।

যাহোক, টেকটোনিক প্লেটের বিভিন্ন রকম সরণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

টেকটোনিক প্লেটগুলোর বিভিন্ন রকম সরণ হয়।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দারা বিজ্ঞানীরা টেকটোনিক প্লেট/পাতগুলির প্রান্তসীমানায় প্রধানত তিনটি গতি লক্ষ্য করেছেন।

1. অভিসারী পাত সীমানা (Converging Plate Boundary)
2. প্রতিসারী পাত সীমানা (Divergent Plate Boundary)
3. প্রতিগামী পাত সীমানা (Transfom Plate Boundary)

1.অভিসারী পাত সীমানা (Converging Plate Boundary):

কনভেকশন কারেন্টের কারণে পাতগুলো কখনো একে অপরের দিকে বা বিপরীত দিকে অথবা সমান্তরাল হয়ে সরে যেতে পারে বা নড়াচড়া করতে পারে।

দুই বিপরীত দিক হতে পরস্পর মুখোমুখি দুটি পাত যখন পরস্পরের দিকে গতিশীল হয় তখন তাকে অভিসারী পাত সীমানা বলে।
এতে পরস্পর অভিমুখে আগত পাত দুটির মধ্যে একটি যদি মহাসাগরীয় পাত হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মহাদেশীয় পাতের নিচে প্রবেশ করে যা ওপরেই একবার বলেছি।

(দুটি পাতের মিলনের ফলে যে পাতটি বেঁকে অন্য পাতের নিচে অবস্থান করে সেই বক্রপাতযুক্ত ভূমিকম্প প্রবণ ঢালু প্লেটের সীমানাতলকে বেনীঅফ জোন বা Beneoff Zone বলে। এই বেনীঅফ জোন ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে 30 ডিগ্রি থেকে 80 ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে। তবে সাধারণত 45 ডিগ্রীর কাছাকাছি এই মণ্ডল থাকে)

এই অভিসারী প্লেট সীমানাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।
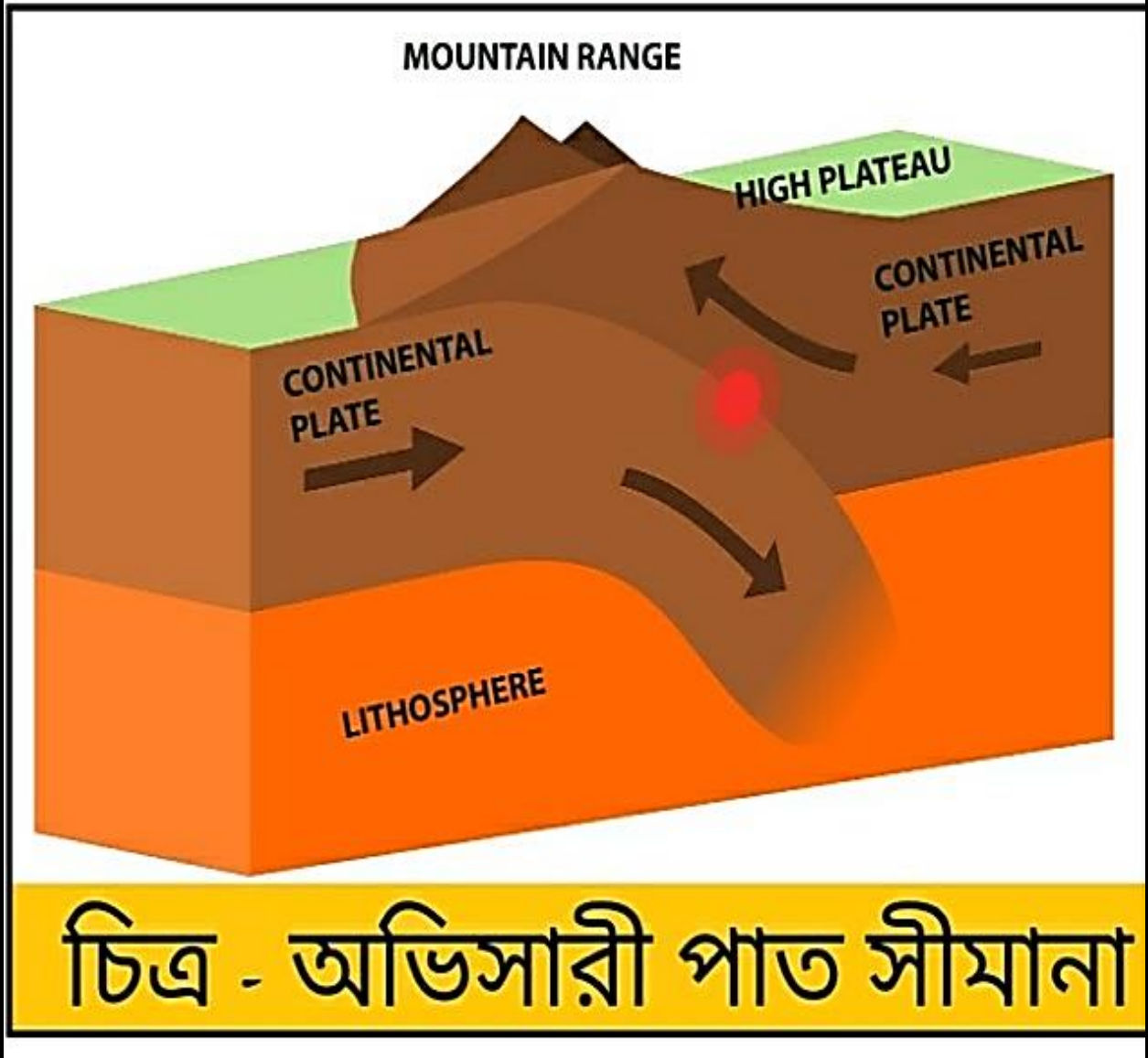
চিত্র - অভিসারী পাত সীমানা

1. মহাদেশ – মহাদেশ অভিসারী প্লেট সীমান্ত

2. মহাসমুদ্র – মহাদেশ অভিসারী পাত সীমানা:

এই ধরনের সীমানা মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় পাতের সংযোগস্থলে পরস্পর আসা পথের সংযোগে হয়ে থাকে। এখানে মহাসাগরীয় প্লেট অপেক্ষাকৃত ভারী শিলা দ্বারা গঠিত বলে এটা মহাদেশীয় পাতের নিচে প্রবেশ করে। প্রকৃতপক্ষে দুটি পাতের মধ্যে মহাসাগরীয় পাতটি বেঁকে ভূগর্ভস্থ Asthenosphere এর উত্তপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ঐ সকল লাভাজাত পদার্থের সঙ্গে মিশে যায়। দুটি পাতের মিলনস্থলে এক সমুদ্রখাতের সৃষ্টি হয়। যেখানে সামুদ্রিক পাত মহাদেশীয় পাতের নিচে নেমে যাচ্ছে তাকে অধঃপাত মণ্ডল বা Subduction Zone বলে।
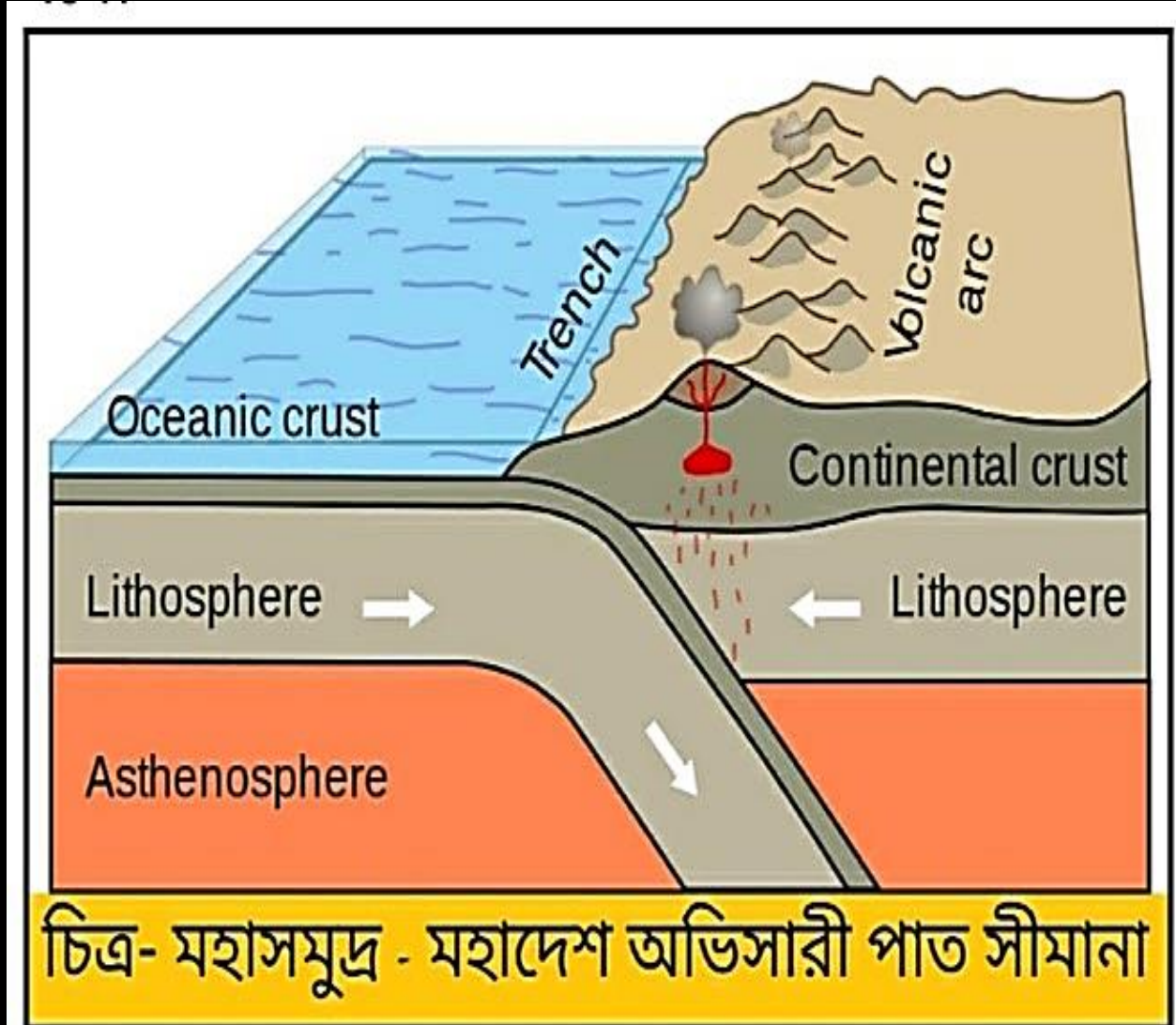
চিত্র- মহাসমুদ্র - মহাদেশ অভিসারী পাত সীমানা

উদ্ভূত ভূমিরূপ :
ভঙ্গিল পর্বতমালা–মহাসাগরীয় পাত প্রান্তে সমুদ্রখাতের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রখাতে পলি সঞ্চিত হয়। পাতের চলন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে সমুদ্র খাতে সঞ্চিত পলিরাশিতে ভাঁজ পড়ে ও ওই ভাঁজ বৃদ্ধি পেলে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি হয় এবং সুনামি সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করে যেহেতু সমুদ্রতলে পর্বত সৃষ্টি কর । তবে দীর্ঘকাল ধরে সৃষ্টি করলে সুনামির ভয় নেই।

এরই অনুগামী ঘটনা হিসেবে থাকে চ্যুতি ও ব্যাসল্ট এবং অ্যান্ডিসাইট জাতীয় লাভার নিঃসরণ হয় যা সুনামি সৃষ্টির আরেকটি পরিবেশ সৃষ্টি করে।

3 . মহাসমুদ্র – মহাসমুদ্র অভিসারী পাত সীমান্ত:

যখন দুটি মহা সামুদ্রিক প্লেট পরস্পর মুখী হয় তখন সংঘর্ষের ফলে একটি অপরটির নিচে নিমজ্জিত হয়। এর ফলে ওই অংশ থেকে লাভা প্রবাহিত হয়ে ভূপৃষ্ঠের ওপরে বা নীচে সঞ্চিত হয়ে হয়ে আগ্নেয়দ্বীপশিলার উৎপত্তি ঘটে।

চিত্র- মহাসমুদ্র - মহাসমুদ্র অভিসারী পাত সীমান্ত

উদ্ভূত ভূমিরূপ :

আগ্নেয় দ্বীপমালা– যদি দুটি মহাসাগরীয় পাত পরস্পরের সম্মুখীন হয় তাহলে সামনাসামনি ধাক্কা বা সংঘর্ষের ফলে একটি অপরটির নিচে নিমজ্জিত হয় এবং নিমজ্জমান অংশ হতে লাভা প্রবাহিত হয়ে ভূপৃষ্ঠের ওপরে বা নিচে সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হয়ে আগ্নেয় দ্বীপমালার। উদাহরণস্বরূপ- প্রশান্ত মহাসাগরের অ্যালুউশিয়াল দ্বীপপুঞ্জ এবং জাপান ও ফরমোসা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সৃষ্ট দ্বীপমালা উল্লেখযোগ্য।

2। প্রতিসারী পাত সীমানা (Divergent Plate Boundary):

যখন দুটি পাত স্থানচ্যুত হয়ে পরস্পরের বিপরীত দিকে দূরে চলে যায় তখন তাকে প্রতিসারী পাত সীমানা বলে। বৈজ্ঞানিকগণ পাতের এইরূপ চলনের কারণ হিসেবে ভূ-অভ্যন্তরস্থ পরিচলন স্রোতের (কনভেকশনাল কারেন্ট) কথা উল্লেখ করেছেন। পরিচলন স্রোত ঊর্ধ্বগামী হয়ে বিপরীত দিকে চলনে পাতকে বিপরীত দিকে চালিত করে।

চিত্র- প্রতিসারী পাত সীমানা

উদ্ভূত ভূমিরূপ :
শৈলসিরা – যখন দুটি সামুদ্রিক পাত স্থানচ্যুত হয়ে পরস্পরের বিপরীত দিকে সরে যেতে থাকে তখন তাদের সীমান্তে বিকর্ষণের চাপ অনেকাংশ হ্রাস পায়। চাপ হ্রাসের কারণে ঐ সময় ভূ-গর্ভস্থ পদার্থ তরল পদার্থে পরিনত হয়। ঐ সকল তরল পদার্থ (লাভা) বাইরে এসে পাতসীমার শূন্যস্থানে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এভাবে ক্রমাগত লাভা নিঃসরন হয়ে সমুদ্রগর্ভে বিস্তীর্ন অঞ্চল লাভা দ্বারা আবৃত করে দেয় ও সমুদ্রগর্ভে কঠিন তলদেশ গঠন করে। দীর্ঘ দিন পাত সীমানায় লাভা সঞ্চিত হলে তা উঁচু হয়ে মহাসাগরীয় শৈলশিরা গঠন করে যা সুনামির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

সামুদ্রিক শৈলশিরা (submarine ridge): গভীর সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীর মত উঁচু, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত ভূ-ভাগকে সামুদ্রিক শৈলশিরা বলে। কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ শৈলশিলাগুলো পর্বতশ্রেণীর মত সমুদ্র তলে অবস্থান করে।

3. সংরক্ষনশীল বা প্রতিগামী পাত সীমান্ত (Transform Plate Boundary) :

অনেক সময় দুটি পাত পরস্পরের পাশাপাশি বিপরীত দিকে চলমান হয়। তখন এ পাতদ্বয় একে অপরের সঙ্গে বিনা সংঘর্ষে নিজেদের মধ্যে পাশাপাশি স্থান পরিবর্তন করে বিপরীত দিকে চলতে থাকে, এরকম পাত সীমানাকে সংরক্ষনশীল বা প্রতিগামী পাত সীমান্ত বা Transform Plate Boundary বলা হয়।

এই পাত সীমায় কোনো নতুন পাত সৃষ্টি হয় না আবার কোন পাতের বা ভূ-ত্বকের ধ্বংস হয় না। কারণ পাশ্ববর্তী পাতগুলির পরস্পর সংঘর্ষ এবং বিপরীতমুখী না হওয়ার জন্য এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে এরূপ চলনে দুই পাতের পাশাপাশি চলনে ঘর্ষণের ফলে ভূমি আলোড়িত হয়ে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে দেখা যায়।

Plate 2
Plate 1
Lithosphere
Lithosphere
Asthenosphere
Asthenosphere
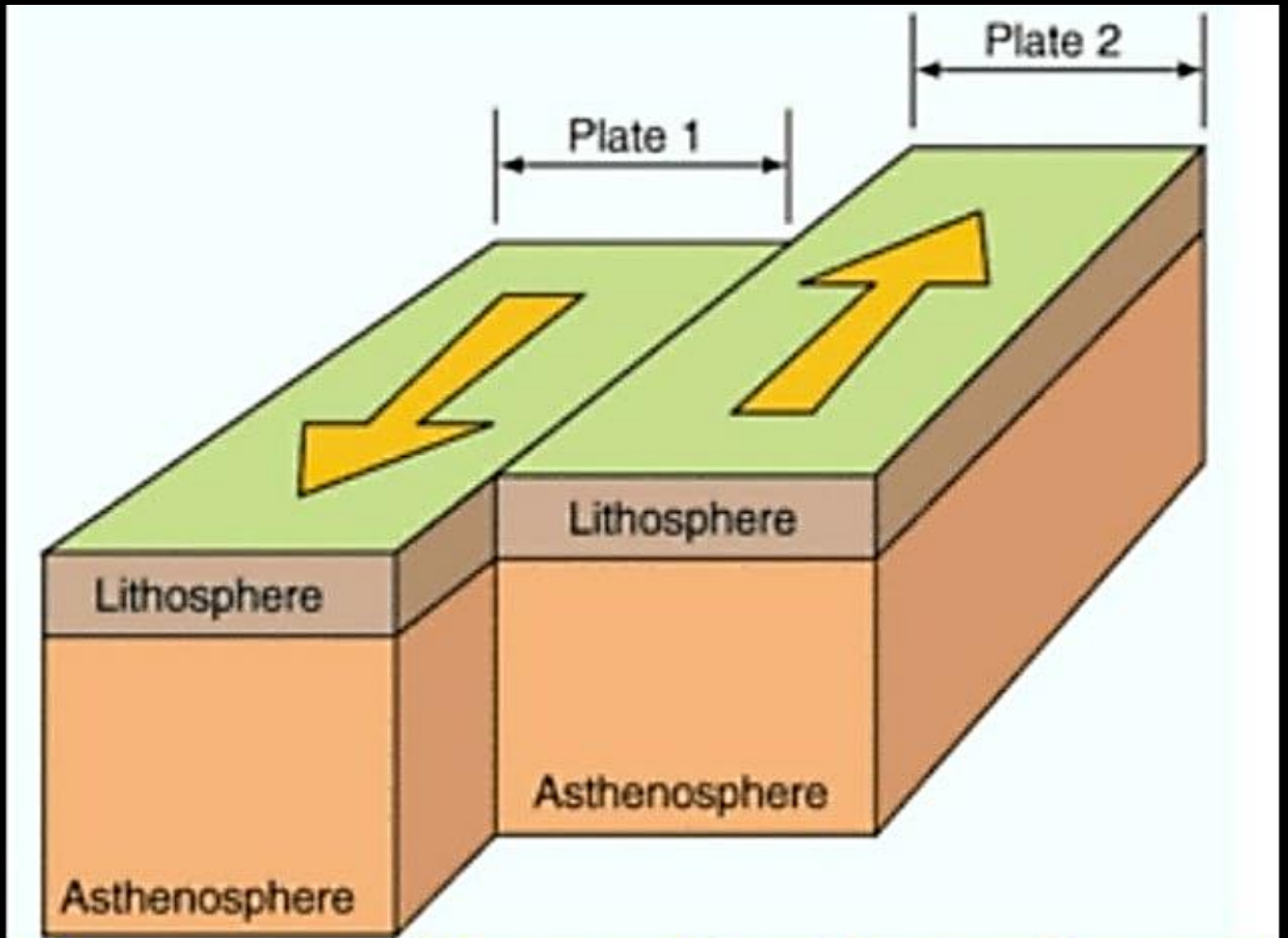
চিত্র- সংরক্ষনশীল বা প্রতিগামী পাত সীমান্ত

অনেক সময় দুইয়ের অধিক প্লেটের মাঝে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ হয়ে ভূমিকম্প হয়ে তারপর সুনামি হতে পারে।

সমুদ্রতলে উঁচু ভূমির উত্থান কীভাবে সুনামি সৃষ্টি করে ? টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া ও ঘর্ষণের কারণে
সাগরতলের কোনো অংশ হঠাৎ উঁচু হয়ে যাওয়া এবং সমুদ্রতলের কোনো অংশ ভূমিকম্পের কারণে নিচু হয়ে গেলে সমুদ্রের সে স্থানের ওপরের ঢেউয়ের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।
টেকটোনিক প্লেটগুলোর ধাক্কার কারণে সমুদ্রতল কেঁপে উঠে সমুদ্রতলে ভূমিকম্প সৃষ্টি করে। এতে তার ওপরে থাকা জলরাশিও কেঁপে উঠে এবং নিচের উত্থিত সমুদ্রতলের ঊর্ধ্বমুখী ধাক্কায় ওপরের পানি আরও ওপরে উঠে যায়। যার ফলে চারপাশে নিচু জলীয় অংশ সৃষ্টি হয়। ফলে পানি সে নিচু হওয়া জলীয় স্তরকে সাম্যাবস্থায় আনতে উঁচু অংশের চারপাশে অগ্রসর হতে শুরু করে। পুকুরে ঢিল ফেললে যেভাবে ঢেউ সৃষ্টি হয় সেরকমভাবে ঢেউ চতুর্পাশে অগ্রসর হয়।
এভাবে অগ্রসর হতে হতে এক সময় তীরবর্তী শহর, বন্দর সবকিছু ভাসিয়ে দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই আপনি যদি কোনো পুকুরে নেমে, সে পুকুরের মাঝখানে গিয়ে পুকুরের সে অংশটা কোনো উপায়ে উঁচু করে দেন তাহলে কি পুকুরের সে অংশের পানি আগের মতোই স্থির অবস্থানে থাকবে না কি ওই উঁচু করে দেওয়া স্থানের ওপরের পানি আরও উঁচু হবে ? অবশ্যই আরও উঁচু হবে। শুধুই কি পানি উঁচু হয়ে বসে থাকবে না কি চারপাশের নিম্নবর্তী এলাকায় পানির প্রবাহ ছুটে যাবে ?

হ্যাঁ, পানি চারদিকেই ঢেউ আকারে ছুটে যাবে এবং ঢেউয়ের উচ্চতা যদি বেশ উঁচু হয়, তবে সে ঢেউ এমনকি পুকুরের পাড়েও কিছুটা উঠে যেয়ে পাড়কে ভিজিয়ে দিতে পারবে। এ জিনিসটাই সমুদ্রে ঘটে থাকে।
তবে এ সুনামির সাথে জোয়ার-ভাটাকে মিলাবেন না আবার। জোয়ার-ভাটা হয় চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণে আর সুনামি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু কিছু কারণে। আর জোয়ার-ভাটার ঢেউয়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এত দীর্ঘ হয় না। আর জোয়ার-ভাটা হওয়ার পেছনে সুনামির কোনো কারণ জড়িত নেই।

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়ার পেছনে মেকানিজম নিয়ে এখনো গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। মত বিরোধ রয়েছে প্রচুর। তবে কিছু বিষয় যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মোটামুটি বিজ্ঞান সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত।

২। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত (Volcanic Eruption) দ্বারা সুনামি:

সাগর কী?

স্বল্প-আয়তনের জলাধার হলো সাগর। সিংহভাগ সাগরই মহাসাগরে উন্মুক্ত থাকে এবং আংশিকভাবে, কখনো কখনো ব্যতিক্রম হিসেবে পুরোপুরি ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। মহাসাগর থেকে সাগরের প্রধান পার্থক্য তাদের আয়তনে।
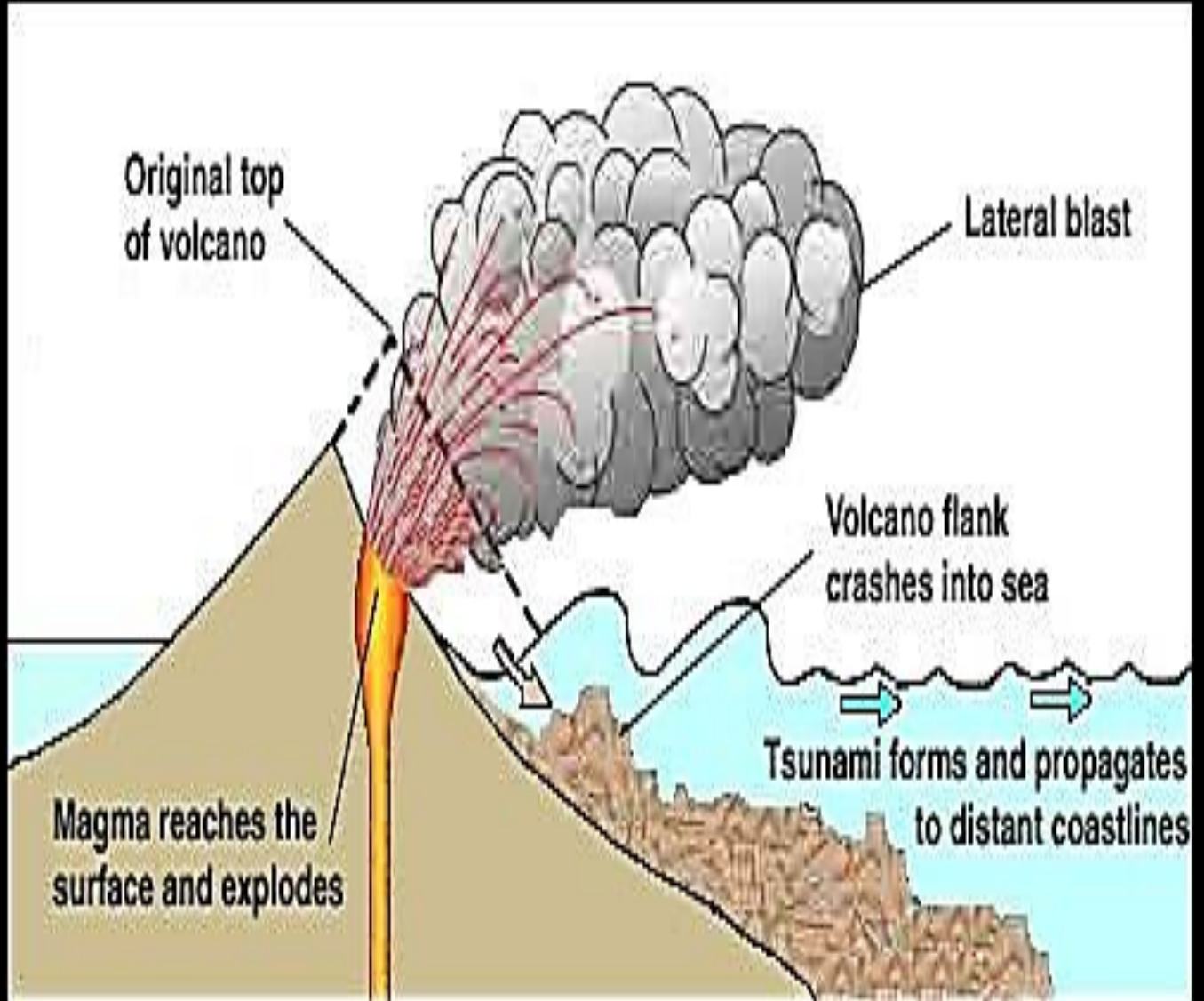
ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ও ধ্বংসাত্মক সুনামিগুলোর নাম নিলে ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৩ এ ইন্দোনেশিয়ার সুনামিটার নাম সহজেই মনে পড়ে যাওয়ার কথা। এ সুনামিতে প্রায় ৩৬,৪১৭ জন লোক মারা গিয়েছিল। এ সুনামিতে ঢেউয়ের উচ্চতা সর্বোচ্চ ১৩৫ ফুট পর্যন্ত হয়েছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৯০ সালে গ্রিসের মিনোয়ান সভ্যতার ধ্বংসের পেছনেও Aegean সাগরে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকেই সম্ভাব্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

এক্ষেত্রে সমুদ্রতীরবর্তী বা সমুদ্রের কোনো দ্বীপে থাকা আগ্নেয়গিরিতে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে।

এ পর্যন্ত প্রায় ৯১০টি ছোটো-বড়ো সুনামি এ কারণেই ঘটেছে।

অনেক কারণেই আগ্নেয়গিরির উদগিরণ ঘটতে পারে। আর সে উদগিরণের মাত্রা যদি প্রবল মাত্রায় হয় এবং লাভার স্রোত যদি সমুদ্রতলে জমা হয় তবে সমুদ্রের সেখানে ম্যাগমা এসে জমা হয়ে উঁচু আগ্নেয় ভূমিরূপ সৃষ্টি করবে। আর সে ভূমিস্তর যদি যথেষ্ট

উঁচু হয়ে যায় তবে সেখানে থাকা সমুদ্রের পানিতে (overlaying water) ভূমিকম্পের মতো আলোড়িত হয়ে সুনামি সৃষ্টি করবে।
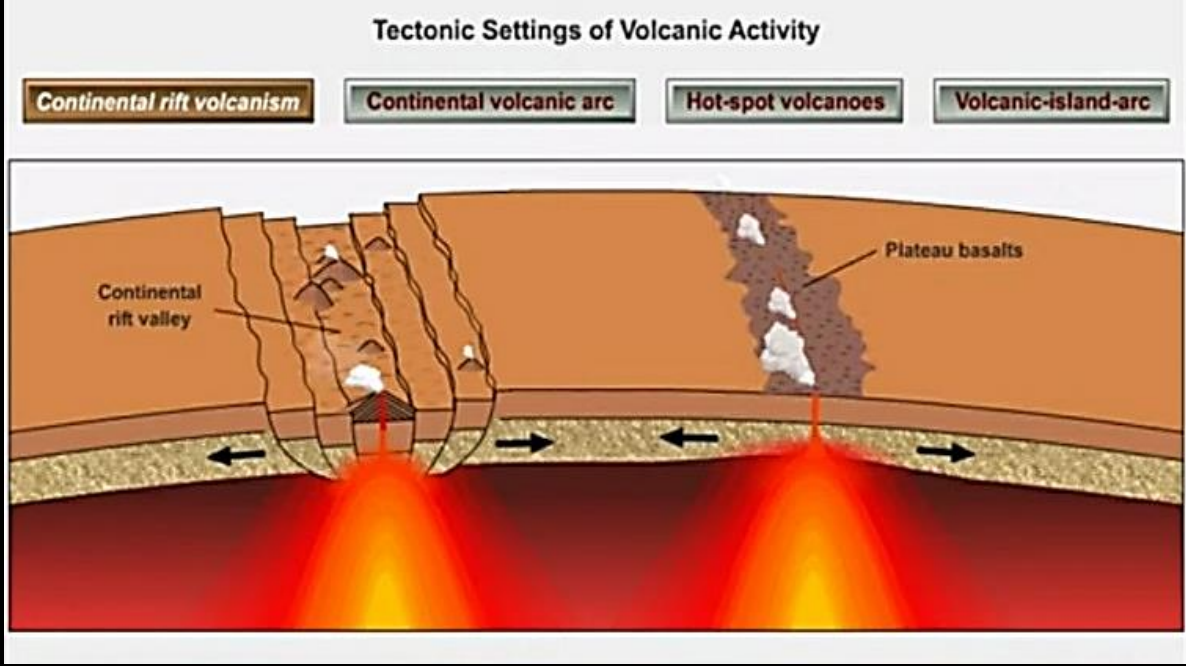
কখনো কখনো সমুদ্র তীরবর্তী বা দ্বীপের আগ্নেয় পাহাড়-পর্বতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত সৃষ্টি হয়ে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা ম্যাগমা নিকটবর্তী সমুদ্রের ওপরে ভেসে যায়। তারপর সমুদ্রের পানিতে নেমে সেখানে সেসব ম্যাগমা ঠান্ডা হয়ে সমুদ্রতলে নতুন ভূমি গঠন করে সমুদ্রতলের উচ্চতা হঠাৎ করে অনেক উঁচু করে দেয়।
অথবা সমুদ্রতলে প্লেটগুলোর ফাটল দিয়ে মাঝেমাঝে ম্যাগমা ভূগর্ভ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সমুদ্রতলে সেসব ম্যাগমা জমা হয়। সেখানে যথেষ্ট ম্যাগমা জমে গেলে নতুন উঁচু ভূমি বা শৈলশিরা সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে সমুদ্রের সেখানের পানির ওপর তার প্রভাব দৃশ্যমান হয়।

সেখানের ঢেউ ভূমিকম্পের সময়ের মতো উঁচু হয়ে সমুদ্রে সুনামি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

ভূমিকম্পের সময় সমুদ্রতল উঁচু হয়ে যেভাবে সুনামি সৃষ্টি করে, সেভাবে আগ্নেয়গিরির উদগিরণেও ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে পারে।
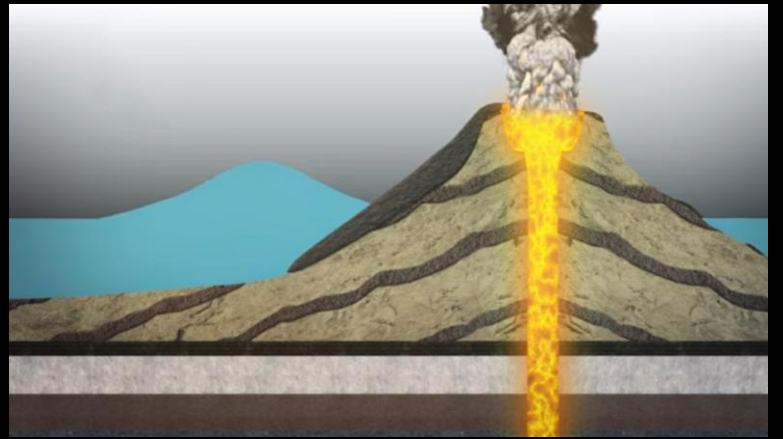
তাছাড়া প্রতিসারী পাত সীমানায় (Divergent Plate Boundary) দুটো প্লেটের বিপরীতমুখী চলনে দুটি প্লেটের মাঝে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয়। প্লেট দুটোর মাঝে ঘনত্ব কমে যায় বা মাঝখানের সে অংশের ক্রাস্ট ছিদ্র হয়ে ভূগর্ভ থেকে ম্যাগমার উদগিরণ ঘটতে পারে এবং সেখানে ম্যাগমা জমে উঁচু হয়ে সেখানকার জলীয় অংশে আন্দোলন সৃষ্টি করে সুনামি সংঘটন করতে পারে।

৩। ভূমিধ্বস (Landslide) :

কোনো কারণে সমুদ্র তীরবর্তী বা দ্বীপের পাহাড়-পর্বত হতে বৃহৎ শিলাখণ্ড নিকটবর্তী সমুদ্রের ওপর ধসে পড়ে সুনামি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সাধারণত ভাঁজ পর্বতের নিকট অধিক ভূমিকম্প হয়।
তাছাড়া অনেক সময় সমুদ্রতলের বিশাল এলাকার ভূমিস্তর আলগা হয়ে যায় এবং কখনো হালকা কোনো ভূকম্পনে সেখানের সে সমুদ্রতল ধ্বসে যায়

যা সমুদ্রের উপরিতলের পানিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সে আলোড়ন যথেষ্ট বেশি হলে তা সুনামির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।
৪। হিমবাহের প্রভাবে :

কখনো কখনো প্রকাণ্ড হিমবাহ পর্বতগাত্র হতে হঠাৎ নিচের সমুদ্রে পতিত হয়। এতে সাগরজলে সুনামির পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

৫। উল্কাপাত (Meteorites) দ্বারা সুনামি:

কখনো যদি কোনো সমুদ্রে বা জলরাশির ওপর উল্কা পতিত হয় তাহলে সেটা ভূমিকম্পের মতোই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উল্কাটা যথেষ্ট বড়ো হলে মুহূর্তের মাঝেই তা সাগরে সুনামি সৃষ্টি করতে যথেষ্ট। এক্ষেত্রে উল্কার কারণে সাগর জলের আলোড়নই সুনামি সৃষ্টির মূল কারণ।

সুনামির ঢেউ :
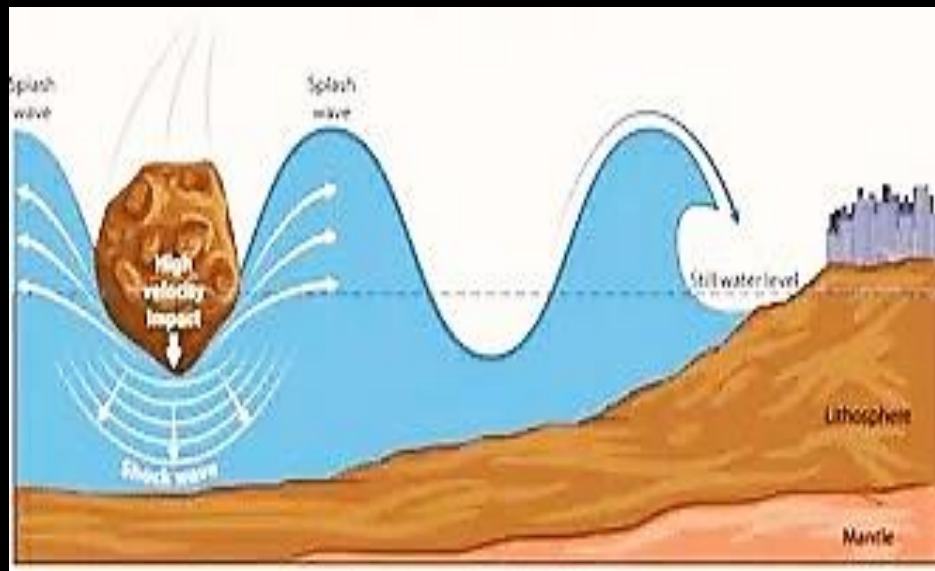
সাগরতল কিন্তু সর্বত্র সমান নয়। তীর থেকে যতই নিচে নামবেন ততই এর গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। সুনামি যখন গভীর সমুদ্র থেকে তীরমুখী হয়ে এগিয়ে যায় তখন তীরের দিকে সমুদ্রের তলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে যাওয়ায় সুনামি তীরের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে যাওয়া পৃথিবীর সমুদ্রতলের ভূস্তর দ্বারা এর গতি বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে সুনামির গতি ধীরে ধীরে কমে যায়, কিন্তু সে সমুদ্রতলের সাথে ধাক্কা খেয়ে সুনামির ঢেউয়ের উচ্চতা আরও বেড়ে যায়। কারণ সমুদ্রের গভীর দিয়ে প্রবাহিত ঢেউ যখন সমুদ্রতলের বাধার কারণে সামনে এগিয়ে যেতে বাধার মুখোমুখি হয়, তখন সে গভীর জলের ঢেউগুলো ওপরের পানিকে আরও ওপরে ধাক্কা দেয় যাতে সে গভীর ঢেউগুলোর সম্মুখমুখী রাস্তায় প্রবাহিত হওয়াটা সহজ হয়। এর ফলে ওপরের ঢেউ আরও ওপরে যেয়ে সুনামির ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়িয়ে দেয় এবং আরও ধ্বংসাত্মক রূপে পরিণত করে।
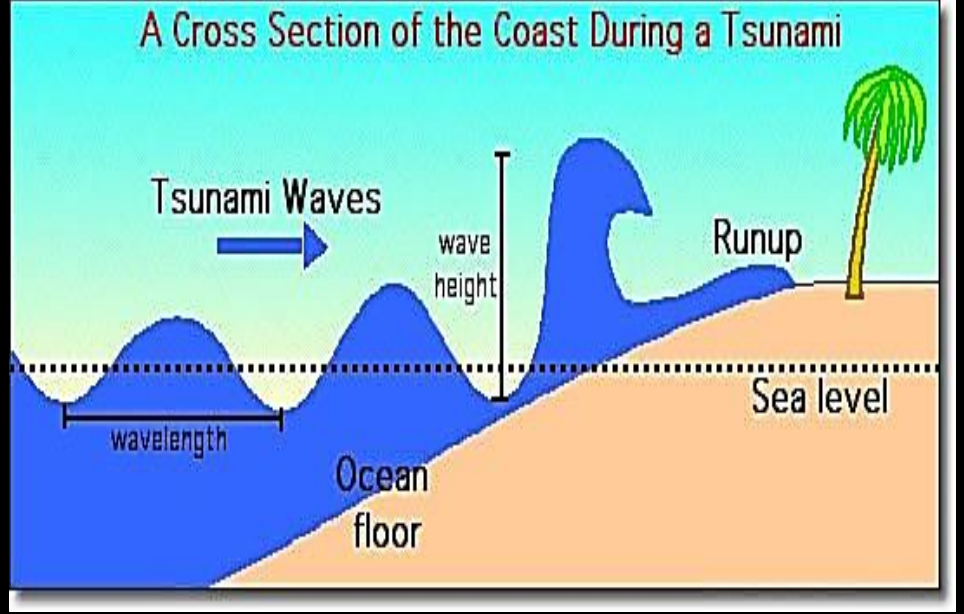
তার মানে, সুনামি তীরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সুনামির শক্তি ধীরে ধীরে কমে কিন্তু উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

উপসাগর কী?

ইংরেজি দুইটা শব্দ bay এবং gulf উভয়ের অর্থই বাংলায় উপসাগর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও এদের মধ্যে পার্থক্য ততটা সুনির্দিষ্ট নয়। এরা উভয়ই সাগরের তুলনায় ছোটো, গভীর লবণাক্ত পানির আধার। বে এবং গাল্ফের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়-

১। গাল্ফ মহাসাগরের অংশ যা স্থলভাগে প্রবেশ করে, বিধায় এটি ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বে তুলনামুলক বেশি পরিবেষ্টিত থাকে।

২। বে আয়তনে গাল্ফের তুলনায় অনেক ছোট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক মিটার বিস্তৃত বে দেখা যায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গাল্ফ এবং বে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। উভয়কে আলাদা করে ডিফাইন করার চেষ্টা হলেও তাদের এত এক্সেপশন রয়েছে যে এদের আলাদা করে চেনা সহজ না। তাই আমরাও উপসাগর নামে এদের উভয়কেই চিনব। তিনদিকে ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত লবণাক্ত পানির আধার হলো উপসাগর।

ANATOMY OF A TSUNAMI

1 The tsunami formed when an earthquake vertically shifted the seabed by several metres, displacing hundreds of kilometres of sea water

2 Large waves began rippling across the ocean, away from the earthquake's epicentre

3 In deep water, the tsunami moved at speeds of up to 800 km/h. When it approached shallower coastal areas, it slowed down but increased in height

Sea level
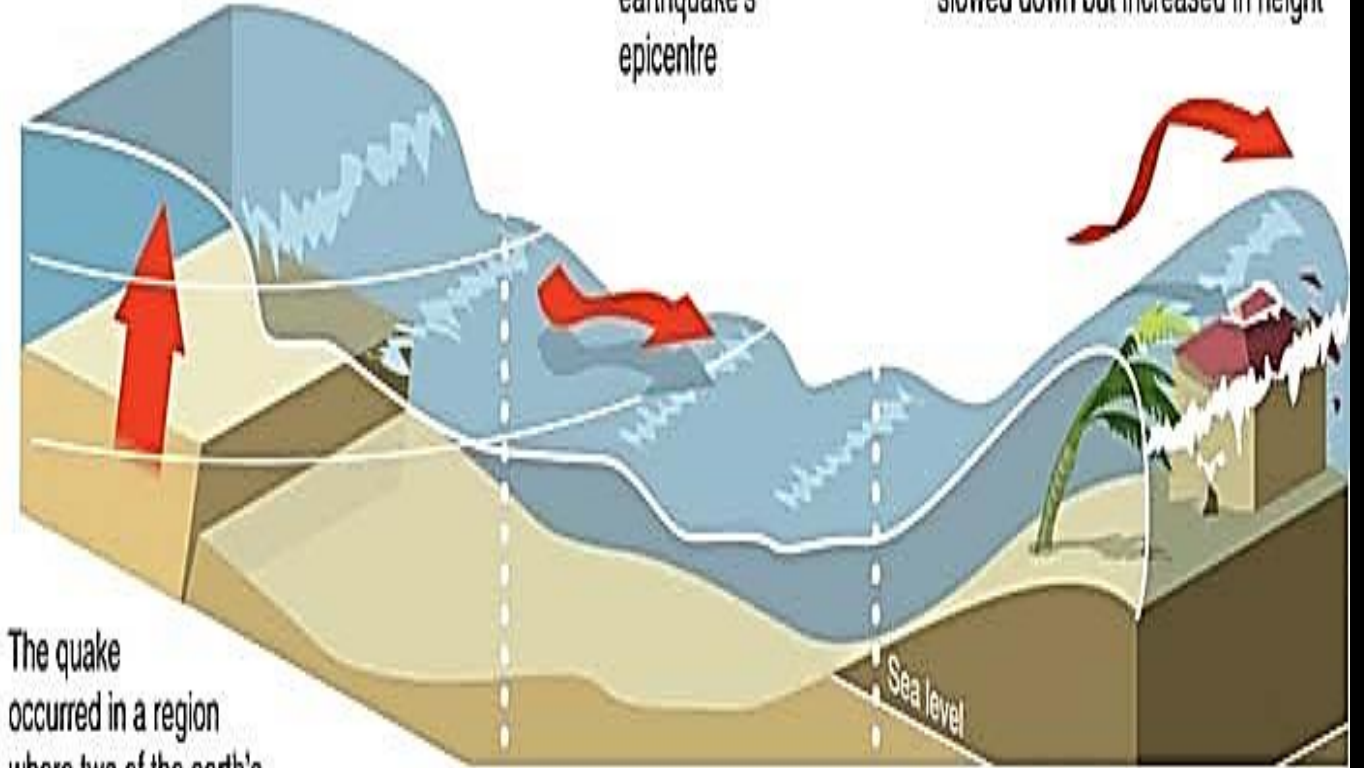
The quake occurred in a region where two of the earth's tectonic plates push together, forcing one underneath the other

সুনামি যে সর্বদা বিশাল ঢেউ হয়ে আসে এমনটাও ঠিক নয়। কখনো কখনো এমনও হতে পারে, সমুদ্রের গভীরে থাকাকালীন সুনামির ঢেউটি জাহাজের নিচ দিয়ে চলে গেছে অথচ টেরই পাওয়া যায়নি। এর মূল কারণ হলো সমুদ্রের নিচ অনেক গভীর হয়ে থাকে এবং ফুলে উঠা পানি সুনামি হওয়ার মতো ভয়ংকর পরিবেশ হওয়ার আগেই সহজেই স্থিতাবস্থায় আসার মতো তল পেয়ে গেছে হয়তো।

এভাবে সুনামি সৃষ্টি হয়। আর কিছু সুনামি আমাদের জন্য নিয়ে আসে অবর্ণনীয় ভয়ংকর পরিস্থিতি।

এ ধরনের আকস্মিক সুনামিতে উপকূলীয় অঞ্চলে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

মেগাথ্রাস্ট ভূমিকম্প ও সুনামি :

২০০৪ সালের ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ। এদিন ইন্দোনেশিয়ার উত্তরাঞ্চলের দ্বীপ সুমাত্রার আচেহতে আঘাত হানে ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প *মেগাথ্রাস্ট*। এর পরপরই সৃষ্টি হয় ভয়াবহ সুনামি যা সোমালিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

সুনামিটি ভারত মহাসাগরের অনেক দেশেই আঘাত হানে। কেবল ইন্দোনেশিয়াতেই ১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়। নিহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল আচেহ প্রদেশে। এ সুনামিতে বিভিন্ন দেশের আরও প্রায় ৫০ হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়। সব মিলিয়ে আনুমানিক মৃতের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়িয়ে যায়। এটাকে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগগুলোর একটি হিসেবে ধরা হয়।

১০৯০ মিটার গভীরতায় কমলা সুন্দরীর দেখা পাওয়া যাবে। এই মাছকে কমলা সুন্দরী বলার কারণ এর নাম 'Orange Roughy'। এই মাছ সম্পর্কে একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো এটি মাঝারি আকৃতির মাছ হলেও এরা প্রায় ২০০ বছর বাঁচে। সমুদ্রে খুব কম প্রাণীই আছে যারা এ কাতারের প্রাণী।

হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট

নাঈম হোসেন ফারুকী

১।

বহুদিন ধরে আমরা গভীর সমুদ্রে নামছি আর নামছি। আমরা পার করে এসেছি আলোর রাজ্য। দেখে এসেছি টোয়াইলাইট জোনের দানবদের। ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার মিডনাইট জোনে ভূতুড়ে সব প্রাণীকে।

আজকে আমরা তলার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।

এই জায়গাটা ভয়ংকর। আপনার আশেপাশে কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে আগ্নেয়গিরির মতো কতকগুলো জিনিস। ভকভক করে ধোঁয়া বের হচ্ছে সেগুলো দিয়ে। আপনার সাবমারসিবল এই জিনিসের বেশি কাছে যাওয়া উচিত হবে না। ওই জিনিস বিষাক্ত। কালো ধোঁয়ার সাথে বের হচ্ছে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড। আর নানান জাতের ভয়ংকর গ্যাস। শুধু যে বিষাক্ত তাও না। পানি এখানে টগবগ করে ফুটছে। তাপমাত্রা কোথাও ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোথাও ৪০০ ডিগ্রি। প্রচণ্ড চাপে পানি বাষ্প হতে পারছে না। কয়েকশ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। আপনার হাড়গোড় কাগজের মতো গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
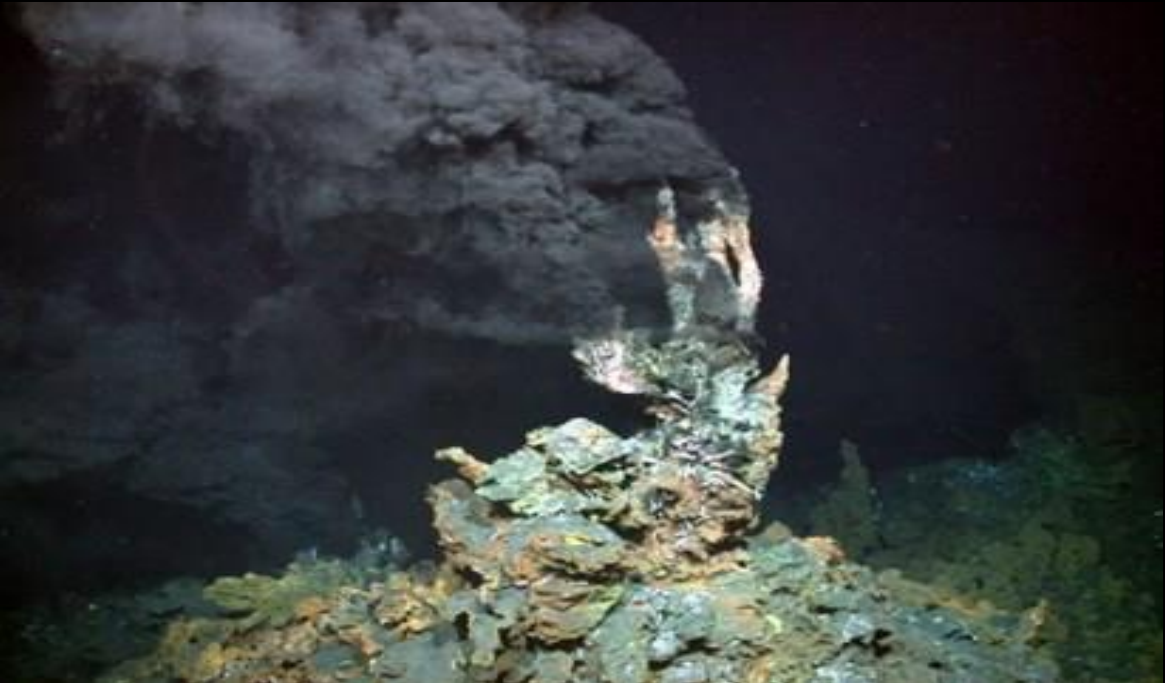
প্রচণ্ড তাপমাত্রা, ভয়ংকর চাপ, বিষাক্ত পানি। এই জায়গায় প্রাণের বেঁচে থাকা অসম্ভব–এই চিন্তা করে আপনি যদি ঘুরে যান, বিশাল একটা জিনিস মিস করবেন। গভীর সমুদ্রের ওই দোজখতুল্য আগ্নেয়গিরি আসলে প্রাণের স্বর্গরাজ্য। ওই ভেন্টগুলোর প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা ছেয়ে আছে নানান জাতের আজব প্রাণীতে।

ওই দেখেন পম্পেই ওয়ার্ম, ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে ইতালির পম্পেই নগরী ধ্বংস হয়েছিল মনে আছে ? সেই নগরীর নামে এদের নাম।

ওই দেখেন জায়ান্ট টিউব ওয়ার্ম। ছয় ফুট লম্বা, লাল টকটকে, নরকের সাপের মতো প্রাণী। ভয়ংকর বিষাক্ত পানির প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা দখল করে তিড়বিড় করে নড়ছে। এদের পেট নেই, মুখ নেই, চোখ নেই। এরা খাবার শুষে নেয় চামড়া দিয়ে।

আজকের আধুনিক মহাসাগরগুলোর মাতা প্যান্থালাসা সুপারওসিয়ান। সুদূর অতীতে পৃথিবীর সকল জলভাগ এবং স্থলভাগ একত্রে যুক্ত ছিলো যা টেকটনিক প্লেটের সরণে আজকের খণ্ড খণ্ড ভূমি, মহাসাগর, সাগরের রূপ নিয়েছে। ভবিষ্যতে পুনরায় সকল মহাসাগর এবং ভূ-ভাগ একত্র হবে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

আছে পাম ওয়ার্ম। ফুলের মতো মুখে ৫টা করে পাপড়ি। বিষাক্ত ধাতুর সমুদ্রে মহানন্দে আছে।

শুধু কি ওয়ার্ম ! মাছ আছে, শামুক আছে। আছে হাজার হাজার রোমশ কাঁকড়া। ইয়েতির মতো ঘন রোমে ঢাকা এদের দাঁড়া। অনেকে এদের নাম দেয় ইয়েতি ক্র্যাব। সেই সাথে আছে অক্টোপাস। গভীর সমুদ্রের অন্য জায়গার চেয়ে ৬০ হাজার গুণ বেশি প্রাণী ভিড় করে আছে ওই ভয়ংকর এলাকায়।

প্রশ্ন হলো, কী আছে ওখানে?

২।

ওইখানে নিকষ কালো অন্ধকারে, সূর্যের আলো থেকে বহু দূরে বাস করে কেমোসিন্থেটিক ব্যাকটেরিয়ারা। তারা অক্সিজেনের প্রায় অনুপস্থিতিতে সূর্যের আলো থেকে বহু দূরে বসে বিষাক্ত সালফার দিয়ে তৈরি করে পুষ্টিকর

খাবার। তাদের একেকজনের সহ্য ক্ষমতা অসাধারণ। অনেকে ৳১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ও বংশ বিস্তার করে।

যদি কোনো দিন সূর্যের আলো নিভে যায়, ডাঙার গাছগুলো সব মরে যাবে। একে একে মরবে সব প্রাণী। শুধু বেঁচে থাকবে গভীর সমুদ্রের সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ওই আজব ব্যাকটেরিয়ারা আর তাদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা ওয়ার্ম আর মাছেরা।

বারবার যখন পৃথিবীর প্রায় সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, টিকে গিয়েছিল ওই জীবজগৎ। বিজ্ঞানীদের ধারণা আজ থেকে ৩৭০ কোটি বছর আগে এমনই কোনো এক হাইড্রোথার্মাল ভেন্টে প্রচণ্ড চাপ আর তাপে, ভয়াবহ বিষাক্ত পরিবেশে জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম প্রাণের।

সে গল্প না হয় আরেকদিন বলা যাবে।

ব্রাইন পুল

সব্যসাচী দাশ নির্ঝর

না, না, চিন্তা করবেন না। আপনাকে ফেসবুক চ্যালেঞ্জ হিসেবে ব্রাইনের মাঝে সাঁতার কাটতে হবে না! এটা আর যাই হোক, সুইমিং পুল তো নয়-ই। এটা আসলে পুল বলতে আমরা যা বুঝি তাও না। তাহলে জিনিসটা কী?

আগে আসি ব্রাইন শব্দের অর্থে। ব্রাইন হলো NaCl এর সম্পৃক্ত দ্রবণ। আর পুল হলো পুকুর সদৃশ কিছু একটা। ব্রাইন পুল হলো সি-বেড এর উপর একটা বড়ো জায়গা জুড়ে ব্রাইনের হ্রদ। বলে নেই, ব্রাইন হলো লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণ। ব্রাইন পুলের পানি সাধারণত এর চারপাশের পানি থেকে ৩-৮ গুণ বেশি ঘন হয়।

তো, এটা কীভাবে তৈরি হয়? এটা কি নতুন কোনো পদ্ধতি না কি লবণ সংরক্ষণের?

না। প্রথমত, এটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়। চলুন দেখে নেই ‘পুল’ টি কীভাবে তৈরি হয়!

ধরা যাক, কোনো একটি উপসাগরের আশেপাশে প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে মাটি উপরে উঠে এলো; অর্থাৎ একে ঘিরে একটি দ্বীপ গড়ে উঠল। তো এই উপসাগর যেহেতু অন্য জলাশয় বা মহাসাগরের সাথে যোগাযোগ হারাল তাই একসময় এর পানি বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। আমরা জানি, সমুদ্রের পানিতে শুধু পানি নয় বরং এর সাথে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, লবণ, বালু ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে; পানির পরে লবণের পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশি। তো লবণের সাথে এসব পদার্থ মিলে বড়ো পরিমাণের লবণের বিশাল স্তর-স্তূপ তৈরি হয়।

তো ভূ-প্রাকৃতিক কারণে- ওই স্থানে টেকটনিক প্লেটের স্থানান্তরের ফলে যদি ফাটল সৃষ্টি হয়; তবে ঐ ফাটলে আশেপাশের সমুদ্রের পানি প্রবেশ শুরু করে এবং লবণের পুরো স্তরটাই সমুদ্রে চলে যায়। লবণের মণ্ডে লবণের পরিমাণ, ঘনত্ব আসলে অনেক বেশি থাকে। ফলে এরকম হয় না যে : পানির চলাচল শুরু হলো আর মণ্ডের লবণ সাথে সাথে দ্রবীভূত হয়ে গেল পানির সাথে, সব লবণ পুরোপুরি সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত হতে আরও সময়ের প্রয়োজন।

সমুদ্রের পানির সাথে প্রচুর পরিমাণে মাটি, বর্জ্য, পলিও মিশে থাকে। ফলে লবণের ঐ স্তরের উপর মাটি জমে পুরু মাটির দেয়াল তৈরী হয় সমুদ্রের পানি ও লবণের মাঝে। যা লবণকে পানির সাথে মিশে যাওয়ার পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। এরপর পানির সাথে আরো পলি এসে জমে আর ক্রমাগত লবণের

উপর চাপ বাড়তে থাকে আর এর ফলে লবণের জমাট বাঁধা স্তূপ সমুদ্রের আরও গভীরে তথা তলদেশে নেমে যেতে থাকে। একে বলা হয় 'সল্ট টেকটনিক'।

সল্ট টেকটনিকের উপর মাটির পরিমাণ আরও জমতে থাকে। ফলে লবণের চাদরের উপর মাটির চাপ বৃদ্ধি পায়। এই চাপের পরিমাণ অসম, কোথাও মাটির স্তর বেশি পুরু ও ভারী, কোথাও কম পুরু ও হালকা। ফলে লবণের চাদরের কোনো কোনো জায়গায় বেশি নেমে যায় আর কোনো কোনো জায়গায় গম্বুজের মতো উঁচু হয়ে থাকে। সে গম্বুজ যখন তার উপরের অপেক্ষাকৃত হালকা পলির স্তরের উপরের পানির সংস্পর্শে আসে তখন লবণ সেখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে মিশতে শুরু করে এবং সেখানে একটি স্থানীয়, অতিরিক্ত লবণাক্ত এবং আলাদা ঘনত্বের একটি হ্রদ বা জলাশয় তৈরি হয়। এই জলাশয়কেই 'ব্রাইন পুল' বলে।

লবণের এই গম্বুজ উপরের পলির আস্তরণ ভেদ করে যেতে গিয়ে অনেকসময় হাইড্রোকার্বনের স্তূপ বা একসাথে জমা হাইড্রোকার্বনকে আঘাত করে। ফলে এর ঘন পানিতে মিথেনের বুদবুদ হয়ে উঠে এসে 'ব্রাইন পুল'-এর তীরে এসে জমা হয়। আর ব্রাইন পুলের তীরে সাধারণত ঝিনুক দেখা যায়; যারা এই অবস্থায় টিকে থাকতে পারে এবং এদের সাথে 'কেমোসিন্থেটিক' ব্যাকটেরিয়ার সিম্বায়োটিক সম্পর্ক তৈরি হয়। সেসব ব্যাকটেরিয়াগুলো মিথেনের সদ্ব্যবহার করে; কার্বন সুগারে পরিণত করে।

তবে শুধু লবণের পানি বলে এ পানি সাধারণ নয়। এ পানি মূলত খুবই বিষাক্ত! এতে অনেকসময় হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন ইত্যাদি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এমনকি গভীর জলের বেশিরভাগ প্রাণী এই পুলের পানিতে ডুব দিলে বা পুলে ঢুকলে সাধারণত মারা যায়। যে-কোনো প্রাণী পুলের ভেতর ঢুকলে 'টক্সিক শক' খেতে পারে! বোঝাই যাচ্ছে, উদ্ভিদের পক্ষেও এই জল ক্ষতিকর। এজন্য এই পুল বেশ কয়েকটা খেতাবও অর্জন করেছে- "Jacuzzi of despair", "pit of despair", "hot tub of despair"। সাধারণত এই জলে শুধু 'এক্সট্রিমোফাইল' জীবরাই টিকে থাকতে পারে।

তো ব্রাইন পুল কোথায় কোথায় তৈরি হয়েছে এ পর্যন্ত?

'ব্রাইন পুল' সৃষ্টি হয়েছে এরকম সুপরিচিত জায়গা হলো : 'Gulf of Mexico', 'The Red Sea', 'The Mediterranean Sea'।

মারিয়ানা ট্রেঞ্চের নাম শোনেনি এমন বান্দা হয়তো স্যাটেলাইট দিয়ে খুঁজতে হবে। কেনই-বা চিনবে না? জলভাগের সবথেকে গভীর অঞ্চল যে এটা। অর্ধচন্দ্রাকৃতির এই খাত মারায়ানা আইল্যান্ড থেকে কিছুটা পূর্বে, উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এই অঞ্চল দৈর্ঘ্যে ২,৫৫০ কি.মি. লম্বা এবং প্রস্থে ৬৯ কি.মি. চওড়া। এমন নয় যে এই পুরো অঞ্চলটাই সমান গভীর। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের একটা অংশের নাম চ্যালেঞ্জার ডিপ। এর গভীরতা প্রায় ১১,০৩০ মিটার (কয়েক মিটার কমবেশি হতে পারে)। এটাই এখন অবধি জানা সর্বোচ্চ গভীরতা। এই গভীরতা ঠিক কতটা বেশি তা অনুভব করার সহজ একটা উপায় আছে। আপনি হিমালয় পর্বতটাকে নিয়ে এই চ্যালেঞ্জার ডিপে বসিয়ে দিন। হিমালয় পর্বতের উচ্চতা প্রায় ৮,৮৪৮ মিটার। প্রায় ২,০০০ মিটার পানির নিচে তলিয়ে থাকবে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া, মাউন্ট এভারেস্টের উপরিভাগ। এই মারিয়ানা ট্রেঞ্চে রয়েছে আরেকটি অঞ্চল যেটি প্রায় ১০,৭১৪ মিটারের মতো গভীর। জলভাগের তৃতীয় সর্বোচ্চ গভীর অঞ্চল, নাম সিরেনা ডিপ।

লেখক- প্রজেশ দত্ত

আরও পড়ুন মারিয়ানা স্নেইলফিশ

উত্তর-পশ্চিম মহাসাগর থেকে এবার যদি প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যাই তবে দেখা মিলবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সামুদ্রিক খাদের- টোঙ্গা ট্রেঞ্চ; নিউজিল্যান্ড এবং টোঙ্গার মাঝে অবস্থিত এলাকা। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৫৫০ কি.মি.। এই ট্রেঞ্চের সবথেকে গভীরতম পয়েন্টের নাম হরিজন ডিপ। প্রায় ১০,৮০০ (কম-বেশি হতে পারে) মিটার গভীর এই অঞ্চল। পৃথিবীর সবথেকে গভীর তিনটি পয়েন্ট এই মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত। লেখক-প্রজেশদত্ত।

ব্যাঙাচি

প্রচলিত ভুল ধারণা: তিমি একটি বিশাল বড়ো মাছ

না, পানিতে বাস করলেই সবকিছু মাছ হয়ে যায় না। যেমন চিংড়িকে সবাই মাছ ভাবলেও এটা মাছ না। তেমনই তিমিও কোনো মাছ না। তিমি একটি-

স্তন্যপায়ী প্রাণী

ব্যাঙাচি
গড় গভীরতা: ৪২৮০ মিটার
পানির আয়তন : ১৭০,০০০,০০০ ঘনমাইল
সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল: ৬৩,৮০০,০০০ বর্গ মাইল
বৃহত্তম মহাসমুদ্র যা পৃথিবীর ৩২% জায়গা জুড়ে আছে।
প্রশান্ত মহাসাগর
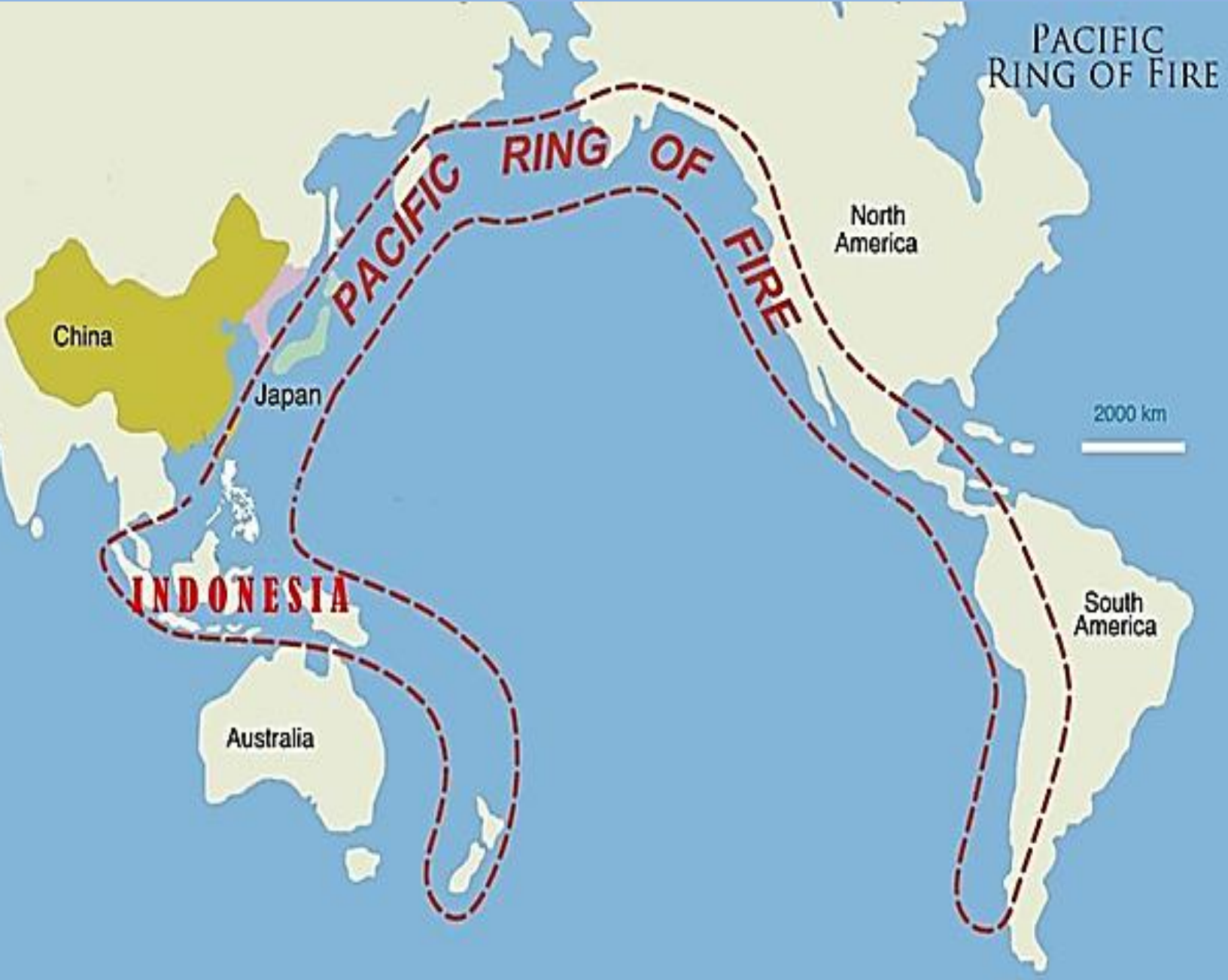
প্রশান্ত মহাসাগরের অববাহিকাতে রয়েছে পৃথিবীর ৭৫% এরও বেশি সক্রিয় এবং ধ্বংসাত্মক আগ্নেয়গিরি। এইসব আগ্নেয়গিরির সাথে রয়েছে সামুদ্রিক খাত। গভীর সব খাত, ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির সারি নিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার কি.মি. জায়গা জুড়ে গঠিত এই এলাকার নাম "রিং অভ ফায়ার"। প্রায় ৪৫২ টা আগ্নেয়গিরির অবস্থান এখানে। ভৌগোলিক প্লেটের সংঘর্ষ এবং মুভমেন্টের ফলে কালের প্রবাহে এই ভলক্যানিক বেল্ট, আর্ক এবং সামুদ্রিক খাতের সৃষ্টি। ঘোড়ার ক্ষুরের নালের মতো আকৃতি এই রিং অভ ফায়ারের।

লেখক- প্রজেশ দত্ত
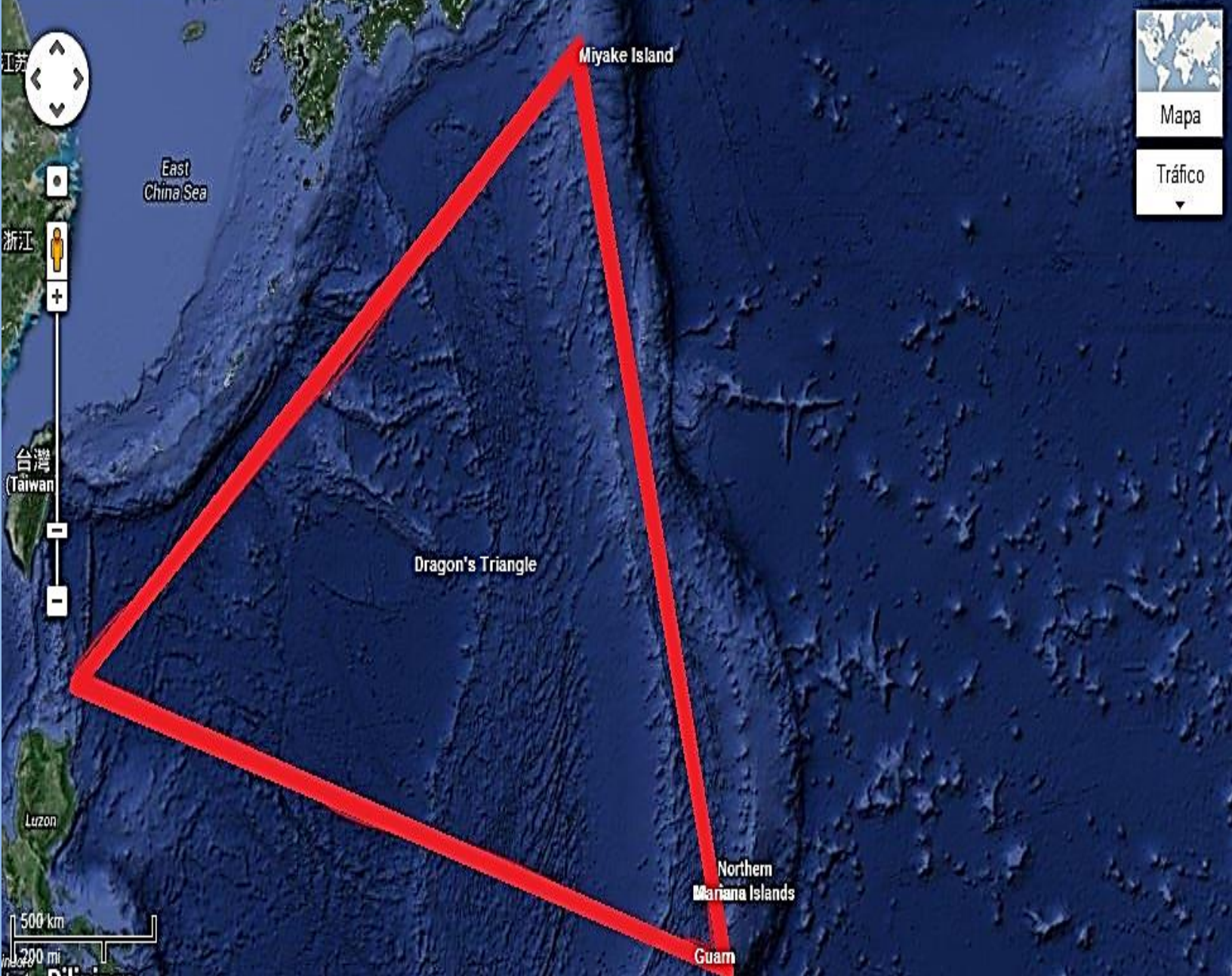
ড্রাগন ট্রায়াঙ্গল প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। টোকিয়ো থেকে দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের এমন এক এলাকাকেও মা নো উমি বলে চিহ্নিত করা হয় । একটা যাত্রীবাহী জাহাজ মিকুরাজিমা নামক স্থানের আশেপাশে অবস্থানরত অবস্থায় স্থলের সাথে সকল প্রকার নেটওয়ার্ক কানেকশন হারিয়ে ফেলে ৪ জানুয়ারি, ১৯৫৫ তে। তখন থেকে ফলাওভাবে ঐ স্থানকে "শয়তানের এলাকা" এলাকা হিসেবে প্রচার করা শুরু হয়, যদিও মাত্র এগারো দিন পর ১৫ জানুয়ারি জাহাজটিকে সহী-সালামত পাওয়া যায়। এরপর সমুদ্রে বেশ কিছু জাহাজ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা চিহ্নিত করা হয় যা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের আশেপাশেই ঘটেছে। এমন পরিসংখ্যানে চিন্তিত হয়ে জাপানের সরকার হারিয়ে যাওয়া জাহাজগুলোর রহস্য উদঘাটনের জন্য একটা জাহাজ পাঠায় নয়জন সাইন্টিস্ট এবং বাইশজন ক্রু মেম্বার নিয়ে। কিন্তু অনুসন্ধানকারীদের দল কোনোরকম চিহ্ন ছাড়াই গায়েব হয়ে যায় সমুদ্রে।

The Devil’s Sea

প্রচলিত ধারণা: হাঙর অনেক দূর (প্রায় ১ মাইল) থেকে রক্তের গন্ধ পায়

না, হাঙরের ঘ্রাণশক্তি এতটাও তীব্র না। এমনকি পরীক্ষা করে দেখা গেছে রক্তের প্রতি হাঙরের চেয়ে অন্য ছোটো মাছের আগ্রহ বেশি। তবে আপনার রক্ত সমুদ্রের পানিতে মিশে কয়েক মাইল দূরে প্রবাহিত হলে, দূর থেকেই হাঙরসহ নানা প্রাণীর এই রক্তের উপস্থিতি জানার সম্ভবনা রয়েছে। এর মানে এই নয় যে তারা কয়েক মাইল দূর থেকে আপনার তাজা রক্তের ঘ্রাণ পাচ্ছে।

গড় গভীরতা: ৩৬৪৬ মিটার

সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল: ৪১,১০০,০০০ বর্গমাইল

পানির আয়তন: ৭৪,৪৭১,৫০০ ঘনমাইল

দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসমুদ্র যা লবণাক্ততায় হার মানিয়েছে অন্য সবাইকে। পড়ুন মিড আটলান্টিক রিজ।
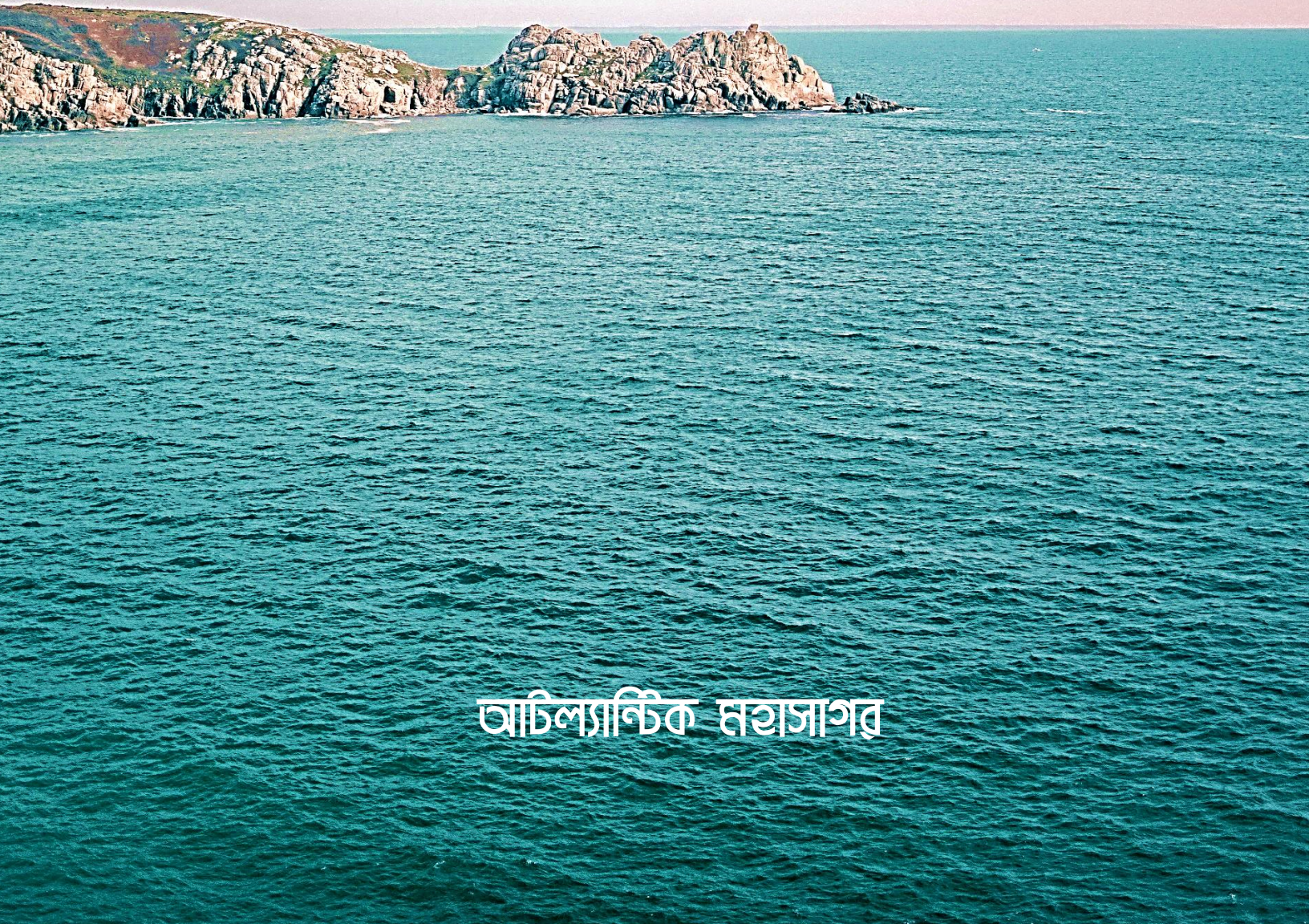
আটল্যান্টিক মহাসাগর

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নিয়ে প্রচলিত রয়েছে অনেক কাহিনী। আটল্যান্টিক মহাসাগরের এই অঞ্চলের রহস্য গল্পগলো আসলে কতটা বাস্তব আর কতটা ভুয়া? জানতে হলে পড়ুন ব্যাঙাচির প্রথম সংখ্যা।

Devil’s Triangle

গড় গভীরতা ৩৯৬০ মিটার

সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ২৭২৪০০০০ বর্গমাইল

পানির আয়তন ৬৩০০০০০০ ঘনমাইল

তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর যা ১৯.৮% পানি ধারণ করে রয়েছে।

ভারত মহাসাগর

গড় গভীরতা: ৩২০০ মিটার

সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল: ২০.৩৩ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার

পানির আয়তন: ৭১৮০০০০০ ঘনকিলোমিটার

অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর

ব্যাঙাচি
গড় গভীরতা: ১২০৪.৮৭৪ মিটার
সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল: ১৪.০৬ মিলিয়ন
বর্গকিলোমিটার
পানির আয়তন: ১৮৭৫০০০০
ঘনকিলোমিটার
আর্কটিক মহাসাগর

ব্যাঙাচি

০১
• মারিয়ানা ট্রেঞ্চ
০২
• টোঙ্গা ট্রেঞ্চ
০৩
• ফিলিপাইন ট্রেঞ্চ
০৪
• কারিল-ক্যামচাটকা ট্রেঞ্চ
০৫
• কামাডিক ট্রেঞ্চ
০৬
• ইজু-ওগাসুয়ারা ট্রেঞ্চ
০৭
• জাপান ট্রেঞ্চ
০৮
• পরতো রিকো ট্রেঞ্চ
০৯
• সাউথ স্যান্ডউইচ ট্রেঞ্চ
১০
• পেরু-চিলি ট্রেঞ্চ
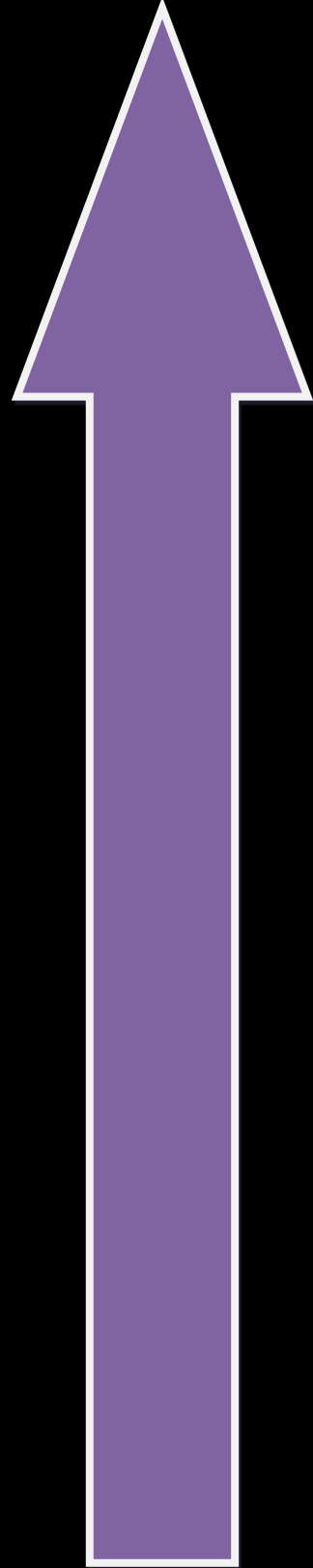
সাগরের রসায়ন

পার্থিব রায়

"Water, water, everywhere

nor any drop to drink."

-The Rime of the Ancient Mariner (1798),

Samuel Taylor Coleridge.

এমন ধারার কথা আমাদের বাংলাতেও আছে-

"চারিদিকে শুধু জল আর জল, জল দেখে মোর চিত্ত হইয়াছে বিকল"।

আমরা এখনো যারা সাগরের ধারেকাছে যাইনি তাদের মনে হতেই পারে, কবিরা কেন এমন কথা বললেন ! সাগরের জল কি সত্যিই এত বিস্বাদ ? খাওয়ার অযোগ্য ? বিষয়টি বোঝার জন্য একটা কাজ করা যায়। ১ লিটার জলে আনুমানিক 27-28 গ্রাম খাদ্য লবণ (NaCl) গুলে তা খেয়ে দেখা। তবে কাজটি না করাই বোধহয় ভালো হবে। আমার অভিজ্ঞতা মোটেও আনন্দদায়ক নয়। এই হিসেব আন্দাজ করার জন্য ঠিক আছে, তবে একেবারে নির্ভুল নয়। কারণ সাগরের জলে আরও অনেক পদার্থ মিশে থাকে। তাই সাগরের জল খেলেই ব্যাপারটা ঠিকঠাকভাবে বোঝা যাবে।

আমাদের এই পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে সাগরের অস্তিত্ব রয়েছে। মহাকাশের সাথে রহস্যময় দুনিয়া হিসেবে সাগরের নাম আমার কাছে খুব মানানসই মনে হয়। আমরা অবশ্য সবসময় সাগর-টাগর নিয়ে তেমন একটা ভাবি না। তারপরও আমাদের মাথায় সাগর নিয়ে কখনো কখনো নানা রকম প্রশ্নের উদয় হয়। সাগরের জল নোনতা কেন ? সাগরের জলে কী কী পদার্থ মিশে রয়েছে ? কোথা থেকে এসব পদার্থ এলো ? সেসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে চাইলে সাগরের জলের রসায়নের দিকে একটু নজর দিতে হবে।

শুধু জলের কথা: এ কথা আমরা সবাই জানি যে, জলের এক একটা অণু তৈরি হয় ১টা অক্সিজেন পরমাণুর সাথে ২টা হাইড্রোজেন পরমাণুর বন্ধনের ফলে। আর এই বন্ধনই জলের যত বিচিত্র গুণাগুণের

আধার। জল এত সুন্দরভাবে অন্যান্য পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে যে জলকে আমরা সর্বজনীন দ্রাবক নামে ডাকি। কিন্তু কেন সে অন্যান্য পদার্থ (দ্রব) দ্রবীভূত করতে এক্সপার্ট ? এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে পোলারিটির কাছে। এখন পোলারিটি আবার কী জিনিস ? আয়নিক, সমযোজী বন্ধন আমরা সবাই বুঝি। পোলারিটিকে আমরা এদের মাঝামাঝি অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। পোলারিটি বিষয়টা আমরা জলের (H2O) গঠনের দিকে তাকালে আরও ভালো বুঝব। অক্সিজেন একটি অধাতু; স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় একটি গ্যাস, যার শেষ কক্ষপথে রয়েছে ৬টি ইলেকট্রন। অর্থাৎ, তার কেবল দুটি ইলেকট্রন প্রয়োজন হয় রাসায়নিকভাবে সাম্যাবস্থায় আসতে। আবার হাইড্রোজেনও অক্সিজেনের মতো আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে অধাতু ও গ্যাস, যার ১ম কক্ষপথ পূরণের জন্য হয় একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে, নয় ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু যখন ২টা হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন এক জায়গায় জড়ো হয়, তখন তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে যে, “চল, ইলেকট্রন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে না থেকে তাদের ভাগ করে নিই” । অর্থাৎ তারা সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। অক্সিজেনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা (সাধারণ অর্থে ইলেকট্রনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা) 3.44, যা হাইড্রোজেনের চেয়ে 1.22 একক বেশি। তাই অক্সিজেন চেষ্টা করে শেয়ারড ইলেকট্রনগুলোকে কিছুটা নিজের দিকে টেনে নিতে। সমযোজী বন্ধনের মতো তা সমবণ্টিত হয় না। অক্সিজেন হাইড্রোজেনের এই ইলেকট্রন টানাটানিতে ইলেকট্রন কিছুটা অক্সিজেনের দিকে সরে আসে। আর H2O অণুর দু-প্রান্তে বা দুই পোলে বিপরীতধর্মী আংশিক আধানের সৃষ্টি হয়। অক্সিজেনের প্রান্তে নেগেটিভ, হাইড্রোজেন দুটোর প্রান্তে পজেটিভ চার্জের জন্ম হয়। এই আংশিক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানকে যথাক্রমে +δ ও-δ লিখে প্রকাশ করা হয়। মূলত জলের মতো আর যেসকল অণুর ক্ষেত্রে এরকম আংশিক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের সৃষ্টি হয়, তাদের এই বৈশিষ্ট্যকেই পোলারিটি বলে আর সেসকল অণুর নাম পোলার যৌগ।
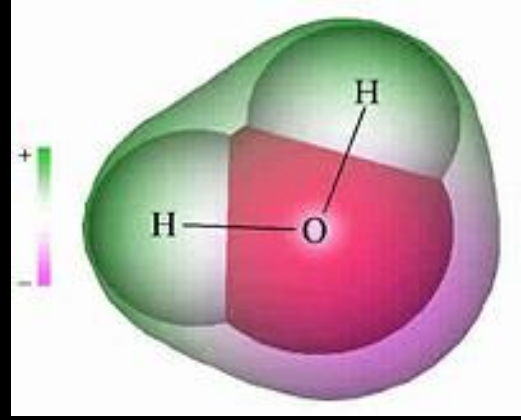
এখন দেখে নেওয়া যাক কেমন করে লবণের কেলাস পানিতে দ্রবীভূত হয়। জলে আয়নিক যৌগ মেশালে তারা তাতে দ্রবীভূত হয়ে যায় (ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু সমযোজী যৌগ, যেমন : চিনি জলে দ্রবীভূত হয়)। আমরা জলে লবণ হিসেবে নিলাম সোডিয়াম-ক্লোরাইড, যা জলে দ্রবীভূত হয়ে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হয়। প্রথমেই বলে রাখি, কঠিন NaCl কেলাস আকারে থাকে। আর এটি একটি আয়নিক যৌগ। পরস্পর বিপরীতধর্মী আয়ন মিলে এর এক একটা অণু তৈরি হয়, তাই এদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল সমযোজী যৌগের মতো

মোটেও ঢিলেঢালা নয়, অনেক শক্তিশালী। এদের ভাঙতে প্রচুর তাপের প্রয়োজন হয়।
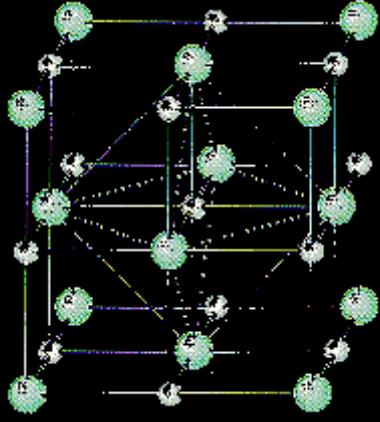
অনেকেই ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে যান, জলে তো বাইরে থেকে তেমন কোনো শক্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে জলে NaCl কেমন করে ভেঙে আয়নে পরিণত হচ্ছে ? আবার চলে যেতে হবে সেই পোলারিটির কাছে। যখনই NaCl এর কেলাস পানিতে মেশানো হয় তখন তাকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরে জলের অণু। জলের অণুর আংশিক ধনাত্মক প্রান্ত আর আংশিক ঋণাত্মক প্রান্ত এদের বিপরীতধর্মী আয়নগুলোকে আকর্ষণ করতে থাকে এবং এই আকর্ষণের টানে NaCl এর Na+ আর Cl- আয়নগুলো তখন ভাঙতে শুরু করে। এরপরের ঘটনা আরও মজার। তারা কিন্তু জলের আয়ন H+ ও OH- আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে HCl ও NaOH গঠন করে না। তারা সুন্দরভাবে জলের অণু দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকে। যেমন : Na+ আয়নের চারদিকে থাকে অনেকগুলো জলের অণুর আংশিক ঋনাত্মক আধানযুক্ত O প্রান্ত। ঠিক উলটা ঘটনা ঘটে Cl- আয়নের বেলায়। তাকে ঘিরে রাখে H2O এর আংশিক ধনাত্মক আধানযুক্ত H প্রান্ত। এভাবেই জলের পোলারিটি অন্যান্য দ্রব দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। বুঝতেই পারছেন যদি জলের পোলারিটি না থাকত তাহলে তা লবণ বা অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত করতে পারত না।

তবে কোনো একটা পদার্থ কোনো দ্রাবকে কতটুকু দ্রবীভূত হবে, তার একটা সীমা আছে–যাকে দ্রবণীয়তা বলা হয়। দ্রবণীয়তার চেয়ে বেশি দ্রব দিলে জল কিন্তু তাদের আর আয়নে পরিণত করতে পারে না। তখন তারা অধঃক্ষিপ্ত হয়। এ বিষয়টির সাথে লবণাক্ত জলের বাষ্পায়ন হয়ে লবণ অবশিষ্ট থাকার বিষয়টির সম্পর্ক আছে। ১ কেজি জলে কক্ষ তাপমাত্রায় আমাদের খাদ্য লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) সর্বোচ্চ ২৬৫ গ্রাম পর্যন্ত মেশালে তা জলে পুরোপুরি মিশে যাবে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি লবণ দিলে তা আর ওই দ্রবণে পুরোপুরি মিশবে না, অধঃক্ষেপ (তলানি) হিসেবে তা পাত্রের নিচে পড়ে থাকবে আর দ্রবণটা সম্পৃক্ত থেকে হয়ে যাবে অসম্পৃক্ত দ্রবণ। ১ কেজি জলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের এই ২৬৫ গ্রাম পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভালোভাবে দ্রবীভূত হওয়ার বিষয়টিকে বলে NaCl এর দ্রবণীয়তা। এখন মনে করি, একটি পাত্রে ১ কেজি জল নিয়ে তাতে ২৬৫ গ্রাম খাদ্য লবণ সম্পূর্ণ ভালো করে গুলিয়ে রোদে রেখে দিলাম। এক্ষেত্রে জলের অণু বাষ্পায়িত হতে শুরু করবে আর পাত্র ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, সাথে সাথে পাত্রের জলের পরিমাণ ১ কেজি থেকে কমতে শুরু করবে। কিন্তু লবণের আয়ন তো আর বাষ্প হয়ে বেরোতে পারবে না, তাই তার পরিমাণ একই থাকবে। যারা

দ্রবণীয়তার কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝেছেন, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখানে ব্যাপারটা কী হয়। জলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তাতে NaCl যতটুকু দ্রবীভূত থাকতে পারে, দ্রবণে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে NaCl রয়েছে। তাই অতিরিক্ত Na+ ও Cl- আয়ন আবার আয়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে NaCl এ পরিণত হয়ে পাত্রে তলানি হিসেবে জমতে শুরু করে। জল যদিও সর্বজনীন দ্রাবক, তবে কিছু কিছু পদার্থ কখনোই তার মাঝে দ্রবীভূত হয় না। যেমন : তেল জলে কখনো মেশে না। এক্ষেত্রে তৈরি হয় মিশ্রণ। এতে অবশ্য ভালোই হয়। এরকম না হলে সামুদ্রিক প্রাণিদেহের তৈলাক্ত পদার্থগুলো জলে মিশে একাকার হয়ে যেত, যা তাদের জীবন ধারণে বাধার সৃষ্টি করত।

সাগরের জলের রাসায়নিক গঠন :

সাগরের জলের মধ্যে নানারকম জৈব-অজৈব পদার্থের দেখা পাওয়া যায়। মিথেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, সোডিয়াম আয়ন, ক্লোরাইড আয়ন থেকে শুরু করে সিলিকন, গোল্ড, ইউরেনিয়াম আয়ন। এরা কীভাবে এলো ? এদের অনুপাত কী ? এসব নিয়েই সাগরের জলের রসায়ন।

লবণাক্ততার মূলে যারা :

জলের রাসায়নিক গঠন হয়তো অনেকেই জানেন, তারপরও সাগরের জল নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন শুধু জল নিয়ে কিছু কথা না বলে থাকা যায় না। শুধু জল নিয়ে আলোচনা শেষ, এবার আমরা দেখব সাগরের জলে কী আছে। আমরা সবাই জানি, সাগরের জল খুবই নোনতা, তাই এটা বোঝা স্বাভাবিক যে তাতে লবণ থাকে। এই লবণের মাত্রা অর্থাৎ, লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয় Salinity নামক একটি রাশির মাধ্যমে, সংক্ষেপে একে S দ্বারা বোঝানো হয়। এর একক g/kg (কম বেশি পরিমাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা parts per hundred/thousand/million/billion একক ব্যবহার করেন)। সব সাগরের স্যালিনিটির মান একরকম না, আবার সাগরের বিভিন্ন স্তরেও তা ভিন্ন ভিন্ন। আবার মোহনার কাছাকাছি অঞ্চলে, হিমবাহের কাছে লবণাক্ততার মান তুলনামূলকভাবে কম থাকে। তাই আমরা গড় মানের কথা বলব। সাগরের জলের লবণাক্ততার মান গড়ে প্রায় 35g/kg (3.5pph=35 ppt)। কী পরিমাণে লবণ থাকে তা বুঝতে পারছেন ? এখন এই লবণের সবই কি NaCl ? না, সব সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ নয়–$MgSO_4$, KCl, $CaSO_4$ সহ আরও অনেক লবণ সাগরের জলে পাওয়া যায়। আর এখানে উল্লেখ্য, জলে লবণের অণু আয়ন হিসেবে থাকে অর্থাৎ Na^+, Cl^-, SO_4^{2-}, Ca^{2+} আয়ন হিসেবে থাকে-NaCl, $CaSO_4$ অণু হিসেবে নয়।এখন দেখে নেওয়া যাক, সাগরের অগাধ জল নিজের মধ্যে এই 35 গ্রামের মধ্যে কোন কোন লবণের আয়ন আগলে রাখে। প্রথমেই বলতে হয় Na^+ ও Cl^- আয়ন দুটোর কথা। এদের পরিমাণ যৌথভাবে প্রায় 85%। Mg^{2+} ও SO_4^{2-} আয়নের পরিমাণ প্রায় 10% আর বাকি 5% এর মধ্যে রয়েছে Ca, Br, CO_3^{2-}, HCO_3^-, K^+ সহ আরও বেশ কয়েকটি আয়ন।

নিচের ছকে সামুদ্রিক জলে বিদ্যমান বিভিন্ন আয়নের পরিমাণ দেখানো হলো :

প্রধান উপাদান	পরিমাণ (g/kg এককে)
ক্লোরাইড	18.980
সোডিয়াম	10.556
সালফেট	2.649
ম্যাগনেশিয়াম	1.272
ক্যালসিয়াম	0.400
পটাশিয়াম	0.380
বাইকার্বনেট	0.140

গৌণ উপাদান	পরিমাণ(g/kg এককে)
ব্রোমিন	0.065
স্ট্রনশিয়াম	0.008
বোরন	0.004
সিলিকন	0..003
ফ্লোরিন	0.001

ট্রেস উপাদান	পরিমাণ (mg/1000kg এককে)
নাইট্রোজেন*	280
লিথিয়াম	125
আয়োডিন	60
ফসফরাস	30
লোহা	6
জিঙ্ক	110
অ্যালুমিনিয়াম	2
ম্যাঙ্গানিজ	2
সীসা	0.04
পারদ	0.03
সোনা	0.0013

- এখানে নাইট্রোজেন একটি পুষ্টি উপাদান (নাইট্রেট),জলে দ্রবীভূত গ্যাস নয়।

ফেইসবুকে একটা ফ্যাক্ট টাইপের পোস্ট আপনারা সবাই হয়তো দেখেছেন। সেখানে একটা মাছের ছবি দিয়ে নিচে লেখা থাকে, "এই মাছটির মুখমন্ডল মানুষের মতো।" হ্যাঁ, ৬৬৬০ মিটার গভীরতায় 'Blob fish' নামক এই মাছকে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারব।
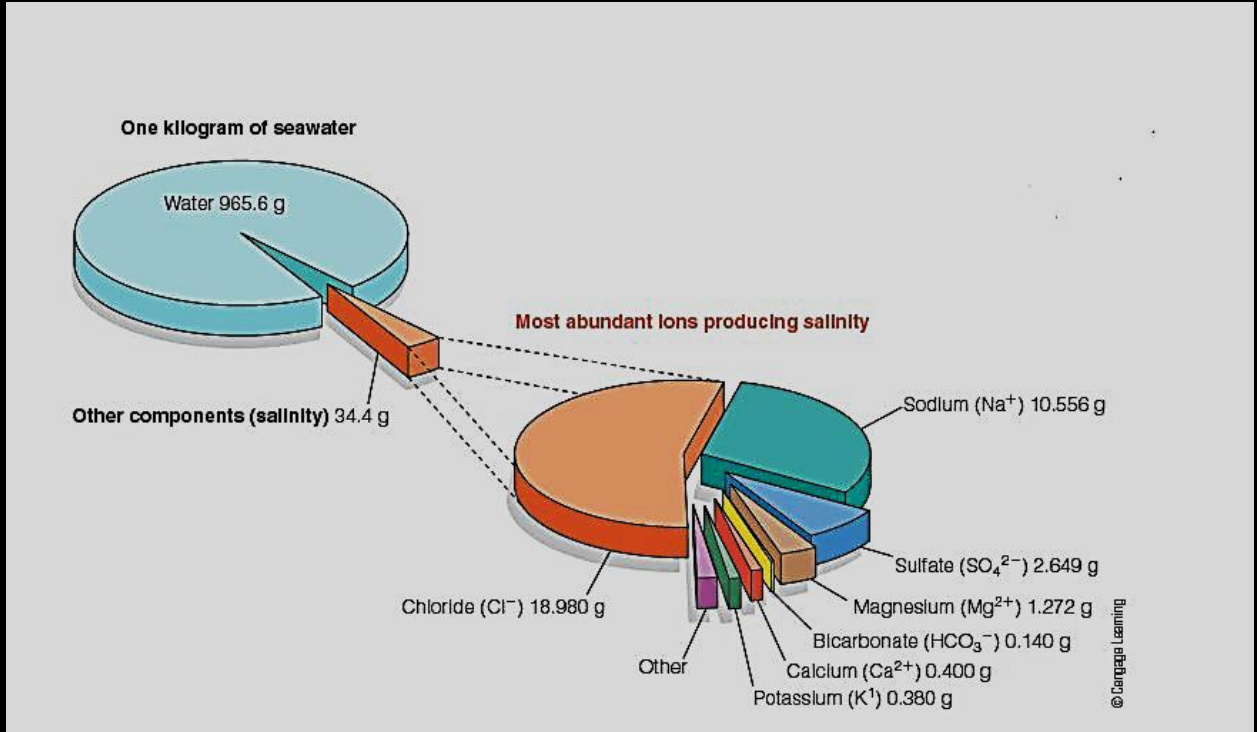
চিত্রে 34.4% স্যালিনিটির জন্য আয়নগুলোর পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

লবণাক্ততা (Salinity) কেমন করে পরিমাপ করা হয় ?

অনেকেরই মনে হতে পারে, এটা পরিমাপ করা কোনো কঠিন কাজ নাকি ! একটা পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল নিয়ে শুকিয়ে নিলে অর্থাৎ তার বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া ঘটালেই তো লবণ পড়ে থাকবে পাত্রে, সেই লবণের ওজন মাপলেই তো কেল্লাফতে, লবণাক্ততার মান বেরিয়ে আসবে। প্রথমে এমন ধারণা আমার মনেও এসেছিল কিন্তু ব্যাপারটি আসলে এরকম সহজ নয়। সমস্ত জল শুকিয়ে যাবার পরও কিছু কিছু লবণ জলের অণু ধরে রাখে। এখন উপায় কী ? তাপ দিলেই তো জলের অণু বের হয়ে যাবে, তাই না ? হ্যাঁ, জলের অণু বের হবে ঠিকই, তবে তার সাথে সাথে কার্বনেট মূলকের লবণ ভেঙে কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য পদার্থও বের হয়ে যাবে। এতে লবণের পরিমাণ সম্পর্কে নির্ভুল হিসাব পাওয়া যাবে না, তবে আন্দাজ করা যাবে।

তাহলে বিজ্ঞানীগণ কেমন করে লবণাক্ততার নির্ভুল মান বের করেন ? শুনলে হয়তো অবাক হবেন এই জেনে যে, সমুদ্রের জলে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরিমাপ

করার মাধ্যমে লবণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। 1978 সালের দিকে ওশানোগ্রাফাররা লবণাক্ততা পরিমাপে PSS বা Practical Salinity Scale এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। পটাশিয়াম ক্লোরাইডের আদর্শ দ্রবণে সাগরের জলের নমুনা নিয়ে তার মাঝে বিদ্যুৎ চালনা করে পরিবাহিতার অনুপাত থেকে স্কেলে লবণাক্ততার মান প্রকাশ করা হয়। আর এই PSS এ স্যালিনিটি নির্ণয় করা হয় salinometer নামের একটি ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস ব্যবহার করে। প্রথমে সমুদ্র থেকে জল সংগ্রহ করা হয় (এক্ষেত্রে সাধারণত বিশেষ ধরনের বোতল ব্যবহার করা হয়, যাদের সমুদ্রের মাঝে নির্দিষ্ট গভীরতায় ডুবিয়ে সেখানকার জল সংগ্রহ করে আবার নৌযানে ফিরিয়ে আনা হয়)। তারপর তার মধ্যে স্যালিনোমিটার প্রবেশ করানো হয়। স্যালিনোমিটারের সার্কিট প্রথমেই জলের তাপমাত্রার সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেয় এবং সেন্সর ব্যবহার করে পরিবাহিতাকে লবণাক্ততায় রূপান্তরিত করে। এই লবণাক্ততাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে PSU (Practical Scale Unit) একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তবে এই একক তেমন একটা ব্যবহৃত হয় না। নমুনায় যত বেশি লবণ তথা তাদের আয়ন থাকবে, পরিবাহিতার মানও তত বাড়বে আর সাথে লবণাক্ততার মান। আর আয়ন যত কম হবে, পরিবাহিতা তত কম হবে, তাই লবণাক্ততার মানও হ্রাস পাবে। এভাবেই স্যালিনিটি নির্ণয় করা হয়। তবে নমুনার তাপমাত্রা এবং তার মাঝে থাকা আয়নগুলোর চলাফেরার ওপরও পরিবাহিতার মাত্রা নির্ভর করে, তাই এদের ভিন্নতাও লবণাক্ততার পরিমাণে প্রভাব ফেলে থাকে।

তবে সাম্প্রতিককালে PSS এর বদলে RSS ব্যবহারের চল বেড়েছে। RSS হলো Reference Salinity Scale, যার একক হলো g/kg।

স্যালিনিটি বিষয়টা দিয়ে সাগরের অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, কারণ এর ওপর বেশ কিছু ব্যাপার-স্যাপার নির্ভরশীল। প্রথমেই আসব সাঁতার কাটার ব্যাপারে। যারা সাগর ও নদী দুইয়েই সাঁতার কেটেছেন, তারা হয়তো লক্ষ করেছেন নদীর চেয়ে সাগরে ভেসে থাকাটা একটু বেশি সহজ। কিন্তু কেন ? এর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ঘনত্বের কাছে। নদীর ঘনত্বের চেয়ে সাগরের ঘনত্ব বেশি (সাগরের জলের ঘনত্ব 1.020 থেকে 1.029kg/m^3 এর মধ্যে থাকে। বিশুদ্ধ জলের ঘনত্ব 1kg/m^3 আর নদীর জলের সামান্য বেশি)। সাগরের লবণাক্ততা বেশি হলে আর ঘনত্ব বাড়লে ভেসে থাকতে সুবিধা হয়, কারণ দ্রবণে বেশি ঘনত্বের বস্তু সর্বদা নিচের দিকে যেতে চায়। আর কোনো জলাধারের জলের ঘনত্ব যদি খুবই বেশি হয় তাহলে আপনি এমনিতেই ভেসে থাকবেন যেমনটা মৃতসাগরের ক্ষেত্রে দেখা যায়। জর্ডানের মৃতসাগরের গড় লবণাক্ততার পরিমাণ 34%, যেখানে সাগরের গড় লবণাক্ততা মাত্র 3.5%(মৃতসাগরের এত বেশি লবণাক্ততার কারণ জলের অধিক হারে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া সংগঠন আর অল্প পরিমাণে লবণগুলোর অধঃক্ষিপ্তকরণ)। ঘনত্বও লবণাক্ততার সাথে সাগরের জলের চেয়ে প্রায় 121% বৃদ্ধি পেয়ে ঘনত্ব হয় 1.24 kg/m^3। তাই সেখানে ভেসে থাকাটা সহজ।

জলের তাপধারণ ক্ষমতার সাথেও স্যালিনিটির সম্পর্ক রয়েছে। সাগরের লবণাক্ততা যত বেশি হবে,

তার তাপধারণ ক্ষমতা তত হ্রাস পাবে। অর্থাৎ, শুধু জলের তাপমাত্রা ১ ক্যালভিন বাড়াতে যত তাপের প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে কম তাপেই সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা ১ ক্যালভিন বাড়ানো যাবে। আর লবণাক্ততা যত কম হবে, তাপধারণ ক্ষমতা তত বাড়বে।

আরেকটা ব্যাপারে লবণাক্ততার প্রভাব দেখার মতো একটা বিষয়। হিমাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক। আমরা জানি, অবিশুদ্ধ পদার্থের হিমাঙ্ক-স্ফুটনাঙ্ক বিশুদ্ধ অবস্থার চেয়ে কম-বেশি হয়। কারণ তাদের ভেতরের ভেজাল জাতীয় পদার্থগুলো এদের আন্তঃআণবিক বলের বিচ্ছিন্নকরণে বা সংযোজনে বাধার মতো কাজ করে। এই জন্য কখনো কখনো সমুদ্রপৃষ্ঠে জলের হিমাঙ্ক -২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে দেখা যায়। ফলে স্ফুটনাঙ্কের মানও বেড়ে যায়। তবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ এতই অল্প যে, তা হিসাবের মধ্যে আসে না। আমরা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসই সাগরের জলের স্ফুটনাঙ্ক ধরি। তবে এটা সমুদ্রের উপরিভাগের ক্ষেত্রেই বেশি ভালোভাবে প্রযোজ্য। কারণ আমরা সমুদ্রের যত গভীরে যাব, তত চাপ বাড়বে। আর চাপের বিষয়টাও গলনাঙ্ক-স্ফুটনাঙ্কের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। যত চাপ বাড়বে, গলনাঙ্ক তত কমবে আর স্ফুটনাঙ্কের মান তত বাড়বে।

সাগরের লবণের উৎস সন্ধানে :

জন্মলগ্ন থেকে আমাদের পৃথিবী মোটেও এমন {সসাগরা ছিল না। উত্তপ্ত আগুনের গোলার ওপরের অংশটুকু ঠান্ডা হয়ে পৃথিবীর বহিরাবরণের সৃষ্টি হয়। এরপর তাতে একসময় সাগরের জন্ম হয়। সাগরের জন্ম কীভাবে-তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। উল্কা-গ্রহাণু থেকে জল এসেছে না কি পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বাষ্প বের হয়ে বহু বছর ধরে চলা বিরামহীন বৃষ্টিপাত সাগরের জন্মের কারণ-সে ব্যাপারে আমরা এ লেখায় মাথা ঘামাব না। তবে আনুমানিক 4.3 থেকে 3.8 বিলিয়ন বছর আগে এই পৃথিবীতে সাগরের দেখা মেলে। কিন্তু সেই আদিম সাগরে কি লবণ ছিল ? না, সেই আদি সমুদ্র একেবারে প্রথম দিকে লবণহীন ছিল। এখানে আমাদের ভাবনার বিষয় হলো এত লবণ এলো কীভাবে ? স্যার অ্যাডমন্ড হ্যালি প্রথম এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। সময়টা তখন ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ। হ্যাঁ, হ্যালির ধূমকেতুর সেই হ্যালি সাহেবই এ বিষয়ে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, লবণ আর অন্যান্য খনিজ বৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষয়ে নদী হয়ে সাগরে মিশেছে। তাই সাগর এত লবণাক্ত। তিনি আরও একটা বিষয় নিয়ে কথা বলেন। বদ্ধ বড়ো জলাশয়গুলো সাগরের চেয়ে বেশি লবণাক্ত। অবশ্য তিনি এই বেশি লবণাক্ততার কারণ উল্লেখ করেননি। যাহোক, সাগরের জলের লবণাক্ততার উদ্ভব নিয়ে তিনি ঠিকই ছিলেন, তবে তাঁর কথাই শেষ কথা নয়। আরও কিছু কথা বাকি আছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকেও বিভিন্ন পদার্থ আগ্নেয়গিরির হাইড্রোথার্মাল

ভেন্ট থেকে বেরিয়ে জলের সাথে মিশে থাকে। জলে মিশে থাকা প্রধান দুটো আয়ন সোডিয়াম আর ক্লোরাইডের উৎপত্তি কীভাবে-সেটাই উদাহরণস্বরূপ এখন দেখে নেওয়া যাক। সোডিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে হ্যালির কথা ঠিক আছে–সোডিয়াম আয়ন সাগরের ভেতরের, বাইরের বিভিন্ন পাথর ক্ষয়ে জলে মিশেছে। কিন্তু টেকটনিক প্লেটের বিচ্যুতির সময় বিভিন্ন মহাসাগরীয় রিফট বা ফাটল, হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে ক্লোরাইড আয়ন জলের মাঝে তার জায়গা করে নিয়েছে। এমনকি জল নিজেও এভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে আসতে পারে, আবার ভেতরে ঢুকেও যেতে পারে। CO2, S, H, Fe, N, Mg- এদের সব কয়টাই এভাবে সাগরের মাঝে ধরণীর ভেতর থেকে আসে। আবার ক্যালসিয়াম আয়ন পাথরের ক্ষয় থেকে জলে জায়গা করে নেয়। সাগরে নিমজ্জিত চুনাপাথর গরম জলে, বিশেষ করে মহাসাগরীয় ফাটল বা আগ্নেয়গিরির নিকটবর্তী স্থানে ভেঙে ক্যালসিয়াম আয়নে রূপ নেয়।

শার্কের দুনিয়ায় আপনাদের আবারো স্বাগত ! সমুদ্রে অনেক প্রজাতির হাঙর আছে। ইতোমধ্যে তাদের কয়েকটাকে নিয়ে লিখেছিও। এখন পরিচয় করিয়ে দেবো ১১৯৫ মিটার গভীরতায় থাকা 'Frilled Shark' কে। লেখক- টি আর এস তানভীর আহমেদ।

Figure 7.5 Processes that regulate the major constituents in seawater.
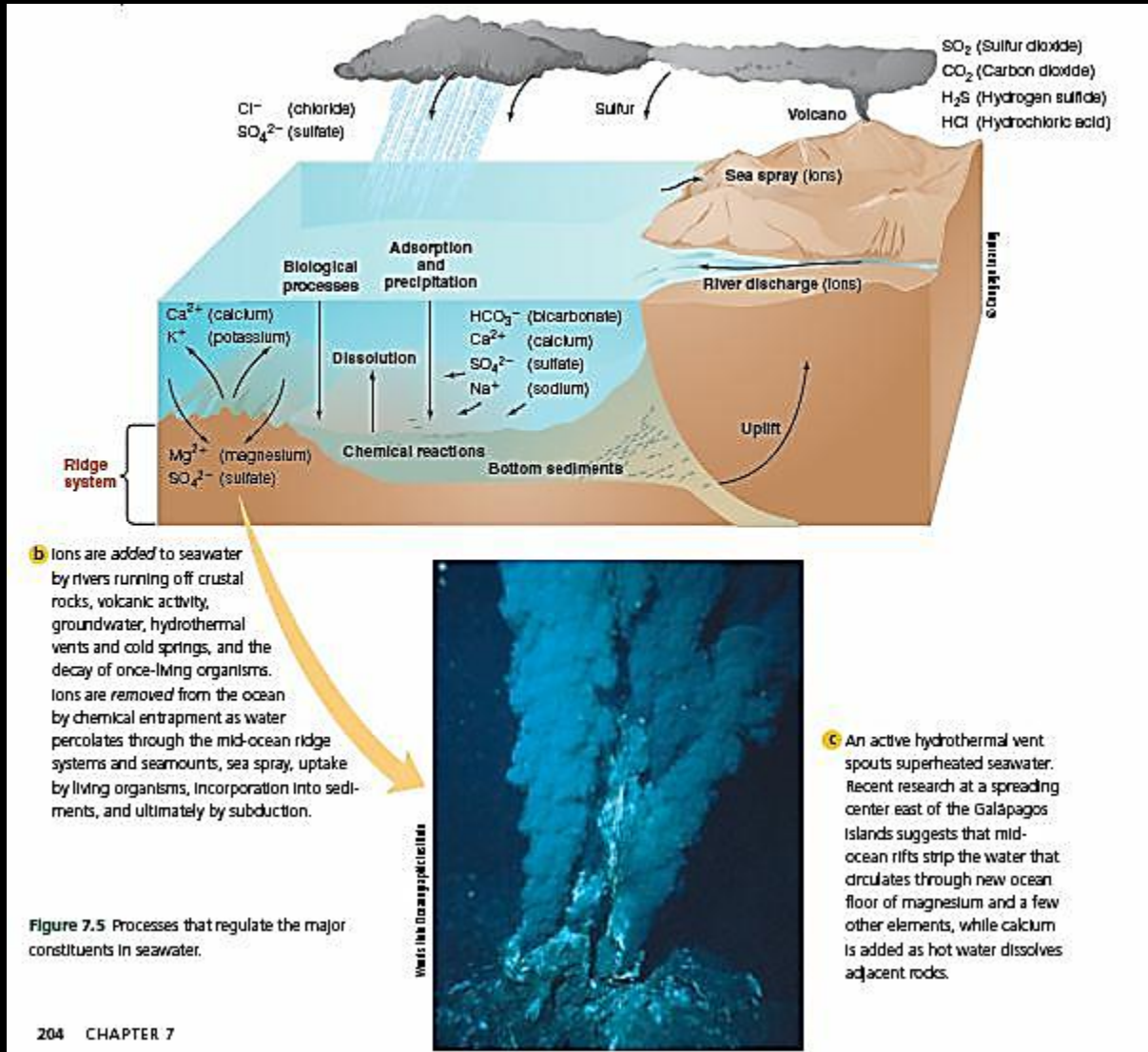
ফর্কহ্যামারের নিয়ম :

সময়টা ১৮৬৫ সাল। সমুদ্র নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। রসায়নবিদ জর্জ ফর্কহ্যামার কয়েকটি সাগরের জলের নমুনা পরীক্ষা করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, মহাসাগরগুলোর লবণাক্ততায় নয়-ছয় হতেই পারে। কিন্তু প্রধান প্রধান আয়নের অনুপাত একইরকম, কোনো পরিবর্তন নেই। তার মানে-আমি ভারত মহাসাগর থেকেই জল নিই কিংবা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিই, সব জায়গায় সোডিয়াম ক্লোরাইডসহ আরও কয়েকটি আয়নের অনুপাত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে (ছক লক্ষণীয়)। সাগরের জলের এইসব মেইন মেইন পদার্থের ধ্রুব অনুপাতের বিষয়টিকে 'The principle of constant proportion' বা 'Forchhammer's principle' নামে ডাকা হয়। কিন্তু ফর্কহ্যামারের প্রিন্সিপাল প্রথমেই সবাই মেনে নেননি। কারণ তিনি সকল

মহাসাগরের জলের নমুনা ব্যবহার না করেই এই ধ্রুবতার ধারণা দেন। এই ধ্রুবতা প্রমাণের ক্ষেত্রে ইংরেজ রসায়নবিদ উইলিয়াম ডিটমারের নাম স্মরণ করতে হয়। তিনি HMS challenger এর সাথে ৬০ বছর ঘুরে বিভিন্ন সাগর-মহাসাগরের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং পরীক্ষা করে প্রধান আয়নগুলোর অনুপাতের ধ্রুবতার বিষয়টি প্রমাণ করেন। যাহোক, ফর্কহ্যামার নিয়ম সম্পর্কে যখন কথা হচ্ছে তখন তার ব্যাপারে কিছু কথা না বললেই নয়। নদী আর সাগরের জলের মাঝে সিলিকা এবং ক্যালসিয়াম আয়নের অনুপাতের পার্থক্য প্রথম লক্ষ করেন ফর্কহ্যামার। নদীর জলে এ দুটি আয়নের অনুপাত সাগরের জলের আনুপাতিক হার থেকে বেশি। আর সামুদ্রিক জীবেরা যে ক্যালসিয়াম আয়ন জল থেকে নিয়ে তাদের খোলস, কঙ্কাল ইত্যাদি তৈরি করে, সে বিষয়টিও ফর্কহ্যামারের নজরেই প্রথম আসে।

সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো সাগরের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সংকট দেখা দিতে পারে।অম্লীয় জলে উৎপাদক ফাইটোপ্লাংকটনের সংখ্যা কমে যাবে।এর জন্যে অন্যান্য প্রাণীর বেঁচে থাকার রসদ অক্সিজেনের ভান্ডারে টান পড়বে। আবার জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দ্রবণীয়তার চেয়ে বেশি হয়ে গেলে হিতে বিপরীত হতে বেশি সময় লাগবে না।সাগর কার্বন রিসার্ভারের মতো কাজ না করে কার্বন এমিটার রূপে যে ভোল বদল করবে,বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করবে,যা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ক্ষতিকর প্রভাবকে আরো তরান্বিত করবে।এজন্যই ওসান এসিডিফিকেশনকে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের টুইন বলা হয়।
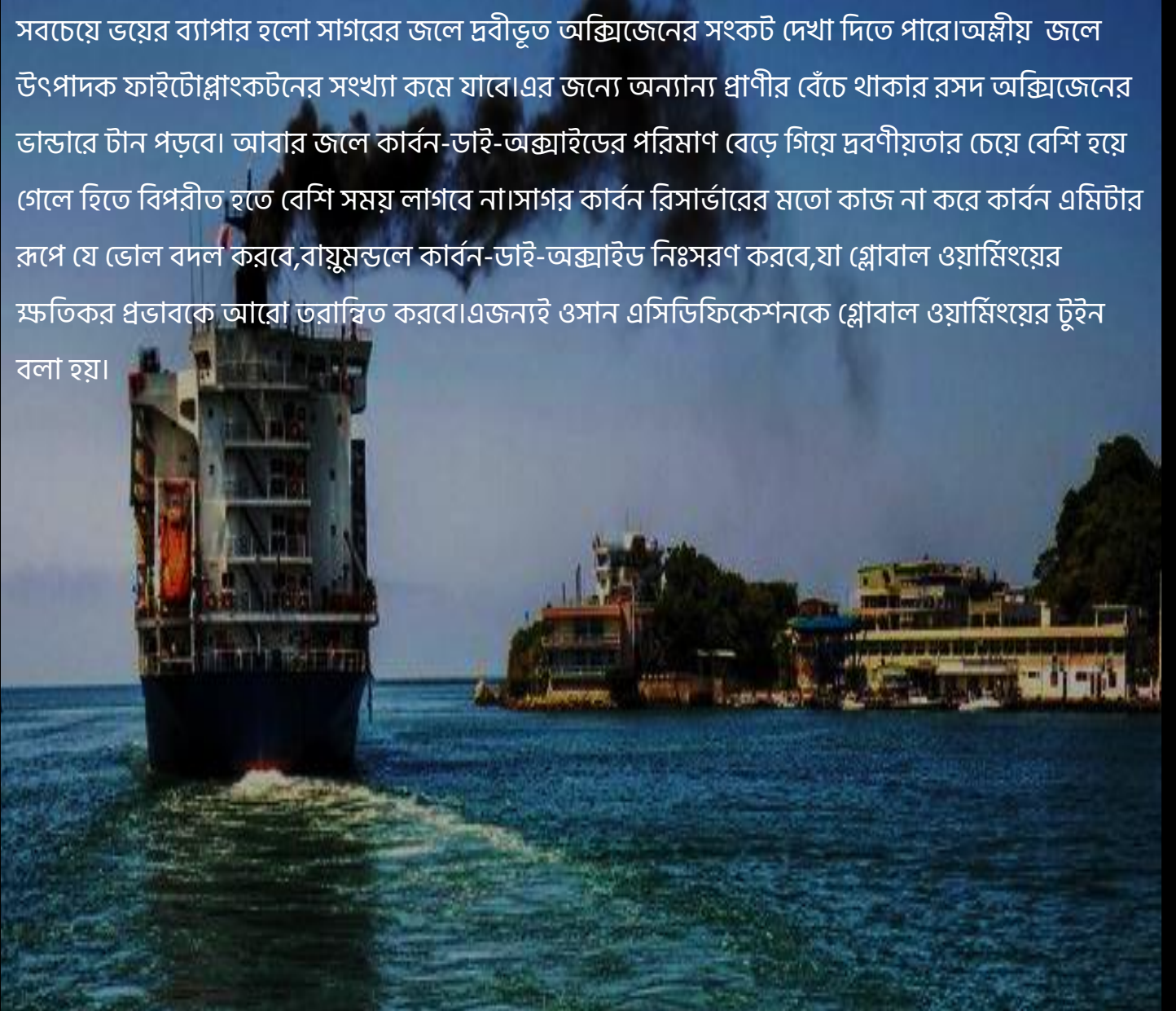
সাগরের রাসায়নিক গঠনের অনুপাতের সাম্যাবস্থা ও রেসিডেন্স টাইম:

লবণের আয়ন আর অন্যান্য পদার্থ যে প্রতিনিয়তই সাগরের জলে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, সে সম্পর্কে জানার পর মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে সাগরে লবণের পরিমাণ কি বেড়ে যাওয়া উচিত নয় ? তাহলে আবার অনুপাত ঠিক থাকে কীভাবে ?

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ভূগোলবিদরা 'Steady State Ocean'-এর ধারণা দেন, যা বলে- সমুদ্রে যে হারে বিভিন্ন আয়ন প্রবেশ করছে, প্রায় সেই হারেই কোনো না কোনো ভাবে এই আয়নগুলো সরে যাচ্ছে। কয়েক বছর পর T.F.W. Barth এই ধারণাকে আরও পোক্ত করার জন্য রেসিডেন্স টাইমের ধারণা নিয়ে আসেন। এখন এই রেসিডেন্স টাইম আবার কী জিনিস ? নাম শুনে তো থাকার সময় মনে হচ্ছে ! হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, রেসিডেন্স টাইম থাকার সময়ই নির্দেশ করে, সাগরের মাঝে কোনো পরমাণুর থাকার সময়। এমনকি জলেরও রেসিডেন্স টাইম আছে। কারণ সে-ও পানিচক্রের মাধ্যমে সমুদ্র থেকে সরে যায়, আবার ফিরে আসে। সাগরে কোনো পরমাণু বা আয়নের রেসিডেন্স টাইম বের করার জন্য একটা সূত্র আছে। কী সেই সূত্র ?

কোনো অণু/পরমাণু/আয়নের রেসিডেন্স টাইম = সাগরে ওই পদার্থের মোট পরিমাণ ÷ নির্দিষ্ট সময়ে ওই পদার্থ সাগরে প্রবেশ বা নির্গমন হার।

এ সূত্র দিয়ে আমরা বরং জলের অণুর রেসিডেন্স টাইম বের করে দেখি জলের একটা অণু সাগরে কত সময় পর্যন্ত থাকে। পৃথিবীর সকল সাগর-মহাসাগরে আনুমানিক প্রায় ১৩৭০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার জল রয়েছে। আর প্রতি বছর প্রায় ৩৩৪০০০ কিউবিক কিলোমিটার জল বাষ্পায়িত হয় অর্থাৎ, সাগর থেকে বেরিয়ে যায়। তাহলে এখন জলের রেসিডেন্স টাইম বের করা যাক। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, একক হবে বছরে, কারণ নির্দিষ্ট সময় হিসেবে আমরা বছর ধরেছি।

Residence Time of H_2O =1370000000÷33400 years

≈4117years

≈4100years

এই সূত্র ব্যবহার করে সাগরে বিদ্যমান বিভিন্ন পদার্থের রেসিডেন্স টাইম ছকে দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, লোহা-এদের রেসিডেন্স টাইম তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সেখানে সোডিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম এদের রেসিডেন্স টাইম অনেক বেশি।

রাসায়নিক ক্রিয়াকর্মের ওপর এসব পদার্থের রেসিডেন্স টাইম নির্ভর করে। প্রতিনিয়ত এসব পদার্থ যেমন সাগরের জলে মিশছে, তেমনি আলাদা হয়ে

যাচ্ছে। সালফেট, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি আয়নের সংখ্যাধিক্য হয়ে এদের পরিমাণ স্ব-স্ব দ্রবণীয়তার চেয়ে বেশি হলে তারা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে সমুদ্র তলে পলি, পাথর ইত্যাদি গঠন করে। আবার সামুদ্রিক জীবগুলোর দেহের ভেতরে ঘটা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেও জলে এইসব পদার্থের ইনপুট-আউটপুট চলতে থাকে।

উপাদান	রেসিডেন্স টাইম (বছরে)	উপাদান	রেসিডেন্স টাইম (বছরে)
ক্লোরাইড	100000000	কার্বনেট	110000
সোডিয়াম	68000000	সিলিকন	20000
ম্যাগনেশিয়াম	13000000	জল	4100
পটাশিয়াম	12000000	ম্যাঙ্গানিজ	1300
সালফেট	11000000	অ্যালুমিনিয়াম	600
ক্যালসিয়াম	1000000	লোহা	200

দ্রবীভূত গ্যাসের কথা:

শুধু যে লবণের আয়ন সাগরের জলে মিশে আছে, তা নয়। সাগরের অথই জলের হাতছানিতে O_2, N_2, CO_2—এসব গ্যাসের দেখাও পাওয়া যায়। এরা সমুদ্রের জলে সহজেই দ্রবীভূত হতে পারে। তবে ঠান্ডা জলে গরম জলের চেয়ে এসব গ্যাস বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। কারণ তাপমাত্রা যত কমে জলে গ্যাসের দ্রবণীয়তা তত বাড়ে। একইভাবে তাপমাত্রা কম থাকলে এই গ্যাসগুলো ধরে রাখবার ক্ষমতাও বেড়ে যায়। এ তিনটি গ্যাসই জীবজগতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। CO_2, O_2 গ্যাসগুলো কেমন করে আসে সেটা সম্পর্কে আমাদের সবারই মোটামুটি ধারণা আছে। সাগরের বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক শ্রেণীর সদস্য যেমন : জলজ উদ্ভিদ, শৈবাল, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদি সালোকসংশ্লেষণের সময় অক্সিজেন তৈরি করে। আর বাস্তুতন্ত্রের খাদক দলের অংশীদাররা এই অক্সিজেন ব্যবহার করে আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড তৈরি করে। আবার নাইট্রোজেন তৈরি করে অল্প

পরিমাণ। কার্বন-ডাইঅক্সাইড আসছে ভূ-অভ্যন্তর থেকে হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট, ভল্কানিক ইরাপশন এবং মহাসাগরীয় ফাটল বা রিফট দিয়ে। কিন্তু N, CO2, O2 এসব জলে দ্রবীভূত হয়। এসব গ্যাসের প্রধান উৎস এদের বলা যায় না। এদের সবাই বায়ুমণ্ডল থেকে সাগরের জলে প্রবেশ করে। অনেকেই এখন ভাববেন, তাহলে কেন বলা হয় বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের একটা বিরাট উৎস হলো সাগর ? এই মুহূর্তে আবার ফিরে যেতে হবে সেই তাপমাত্রার ব্যাপার-স্যাপারের কাছে। সাগর যে শুধু দুহাত ভরে বায়ুমণ্ডল থেকে বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে নেয় তা নয়, সে সেগুলো আবার ফিরিয়েও দেয়। সাগরের যেসব অঞ্চলের জলের তাপমাত্রা বেশি, যেমন : বিষুবরেখা বরাবর অ্যাটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর-এসব জায়গার জলে বেশি গ্যাস দ্রবীভূত হতে পারে না। আর যদি জলের মধ্যে বেশি পরিমাণে এসব গ্যাস হয়ে যায় তাহলে তা বুদবুদ আকারে সাগরের জল থেকে বিদায় নেয়।

কিন্তু সাগরের যেসব অঞ্চলে জলের তাপমাত্রা কম/ঠান্ডা, সেখানে বাতাস থেকে বেশি পরিমাণে গ্যাস জলে প্রবেশ করে। যেমন : উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর-এসব জায়গায় জলে দ্রবীভূত গ্যাসের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। ছকে কোন তাপমাত্রায় কতটুকু গ্যাস দ্রবীভূত হতে পারে, এ বিষয়টি দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, জলে নাইট্রোজেন, অক্সিজেনের চেয়ে সাগরের জল বেশি পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত করতে পারে। আর যতটা জলে দ্রবীভূত হয়, তার সবটা আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে পারে না। কারণ জলে মিশবার পর কার্বন-ডাইঅক্সাইড জলের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড তৈরি করতে পারে, যা ভেঙে কার্বনেট ও হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয় যা সামুদ্রিক জীবেরা তাদের খোলস, কঙ্কাল ইত্যাদি গঠনে কাজে লাগায়। আবার এদের মৃত্যুর পর খোলস সমুদ্রতলে পড়ে থাকে যা পলি থেকে পাথর যে-কোনোটায় রূপ নিতে পারে। এভাবে অপসারণের কারণে যে হারে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সাগরে দ্রবীভূত হয়, সে হারে আর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে পারে না। আবার সামুদ্রিক সালোকসংশ্লেষণকারীরা কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণু গ্রহণ করে অক্সিজেন অণু তৈরি করে। এক্ষেত্রেও কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পায়, এই কারণে সাগরকে 'কার্বন রিজার্ভার' নামেও ডাকা হয়।

যেসব প্রাণী কোটি কোটি বছর পরেও এখনও পৃথিবীতে টিকে আছে যেখানে তাদের অন্য প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত, তাদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়। ৬২০০ মিটার গভীরতায় বসবাসকারী একটি মাছ যাকে বলা হয় 'গবলিন শার্ক', (Goblin Shark) তাকে নিয়ে কথা বলছি। এরা পৃথিবীতে ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর ধরে টিকে আছে। এটি মিটসুকুরিনিডি স্পিসিস বা পরিবারের একমাত্র জীবিত থাকা প্রাণী। গোলাপি রঙের এই প্রাণীটিকে ধরা নিষেধ, তবুও মাঝেমধ্যে এরা উপরিভাগে উঠে এলে জেলেদের জালে ধরা পড়ে। বিস্তারিত পড়ুন

TABLE 7.5 The Solubility of Gases Decreases as Temperature Increases

Temperature	Solubility (mL/L at atmosphere pressure and salinity of 33‰)[a]		
	N_2	O_2	CO_2
0°C (32°F)	14.47	8.14	8,700.0
10°C (50°F)	11.59	6.42	8,030.0
20°C (68°F)	9.65	5.26	7,350.0
30°C (86°F)	8.26	4.41	6,600.0

[a]Figures are given at *saturation*, the maximum amount of gas held in solution before bubbling begins.

Source: F.G. Walton-Smith, *CRC Handbook of Marine Science* (Cleveland, OH: CRC Press, 1974). Table created by Tom Garrison.

এবার আসি অক্সিজেনের কথায়। ছোটোবেলায় কোন বইতে পড়েছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না, তবে কী পড়েছিলাম তা মনে আছে ঠিকই। সাগরকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। কেন ? সে যে হারে অক্সিজেন নেবে সে হারেই কি তার আবার বায়ুমণ্ডলে তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত না ? তা উচিত, তবে আগে যে বললাম, সালোকসংশ্লেষণকারীরা অক্সিজেন অণু তৈরি করে। এর কিছুটা প্রাণীরা তাদের ফুলকার সাহায্যে নিজ দেহে গ্রহণ করে (সামুদ্রিক কোনো জীবই জলের অণু ভেঙে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না, তাদের নির্ভর করতে হয় দ্রবীভূত অক্সিজেনের ওপর)। তবে এরপরও অক্সিজেন অণুর পরিমাণ অঞ্চলভেদে দ্রবণীয়তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তখন অতিরিক্ত অক্সিজেন অণুগুলো বুদবুদ আকারে বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে শামিল হয়। অর্থাৎ, সাগর আমাদের বিশুদ্ধ অক্সিজেন জোগানের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে, তাই তার এই রকম নামকরণ। এবার আসা যাক দ্রবীভূত গ্যাসদের পরিমাণের কথায়। প্রতি লিটার সাগরের জলে প্রায় 02 থেকে 22 মিলিগ্রাম গ্যাস দ্রবীভূত থাকে। আশা করি আমরা বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসদের পরিমাণের কথা জানি; বাতাসের ৭৮% নাইট্রোজেন, ২৮%অক্সিজেন আর মাত্র ০.০৪% কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কার্বন-ডাইঅক্সাইডের এই কম পরিমাণের জন্য দায়ী স্থলজ উদ্ভিদ, যারা সালোকসংশ্লেষণের সময় CO2 ব্যবহার করে এর পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

এখন দেখার বিষয় হলো, জলেও কি এইসব গ্যাসের পরিমাণের অনুপাত ঠিক থাকে ? না, আশা করি জলে এদের দ্রবণীয়তার বিষয়টি সবার মনে আছে। জলে দ্রবণীয়তার ওপর এই অনুপাত নির্ভরশীল। কিন্তু সাগরে ৪৮% নাইট্রোজেন, ৩৬% অক্সিজেন

আর ৬৫% কার্বন-ডাইঅক্সাইড। তবে অক্সিজেনের পরিমাণ সাগরের গভীরতার সাথে পরিবর্তন দেখা যায়। সাগরের ওপরের দিকে ২০ কি.মি. পর্যন্ত অক্সিজেন লেভেল বেশি কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০ কি.মি. গভীরে যাবার পর থেকে অক্সিজেন লেভেল কমতে থাকে প্রায় ৫০০ কি.মি. গভীরতা পর্যন্ত। কারণ এখানে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদকের সংখ্যা কম কিন্তু প্রাণীদের সংখ্যা বেশি, যারা অক্সিজেন ব্যবহার করে। তবে ৫০০ কি.মি. থেকে আরও গভীরে গেলে অক্সিজেন লেভেল আবার বাড়তে শুরু করে। প্রাণীদের সংখ্যা হ্রাস আর বেশি ঘনত্বের অক্সিজেনপূর্ণ জলের নিচের দিকে নেমে আসা এই O_2 লেভেল বৃদ্ধির জন্য দায়ী। তবে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একদম উলটো। সাগরের ওপরের স্তরে কার্বন লেভেল খুবই কম। থ্যাংকস টু দ্যা ফটোসিন্থেসাইজারস। কিন্তু যত গভীরে যাওয়া যাবে, তত CO_2 লেভেল বাড়তে থাকে।
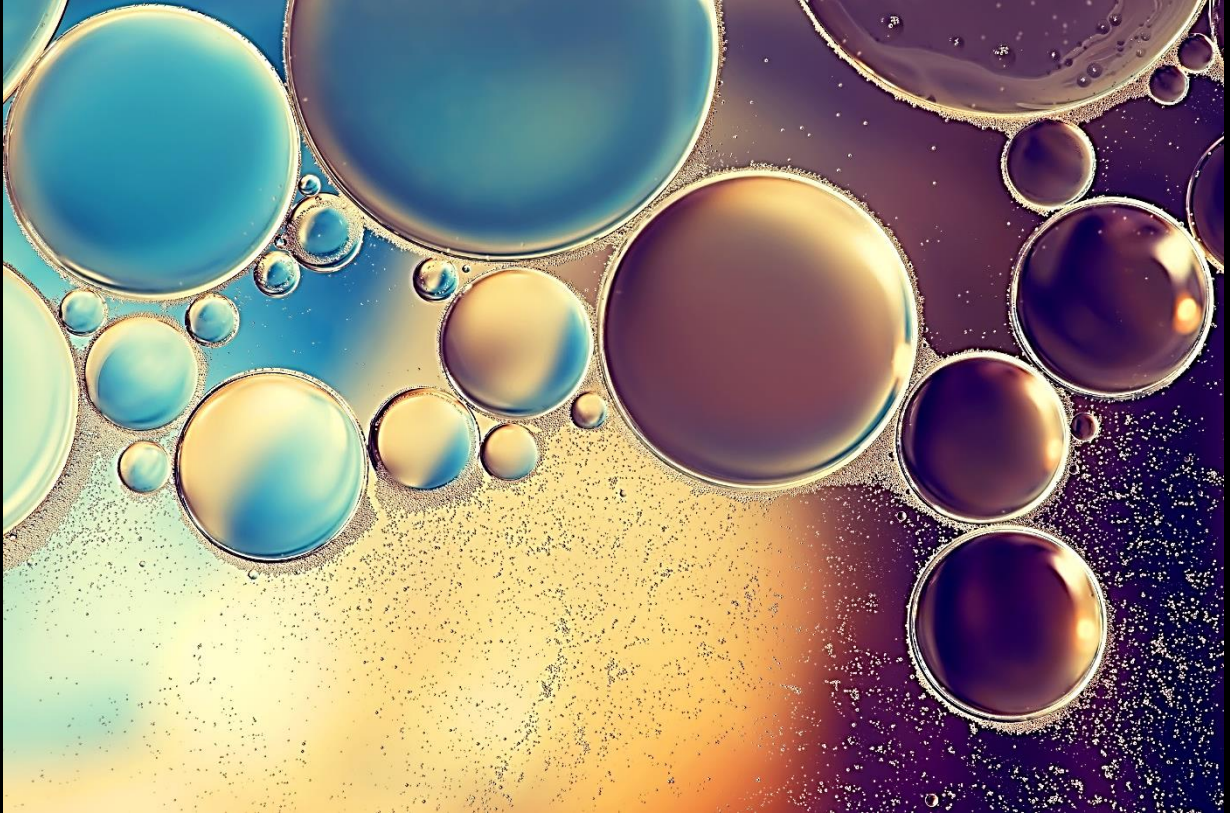
সাগরের pH:
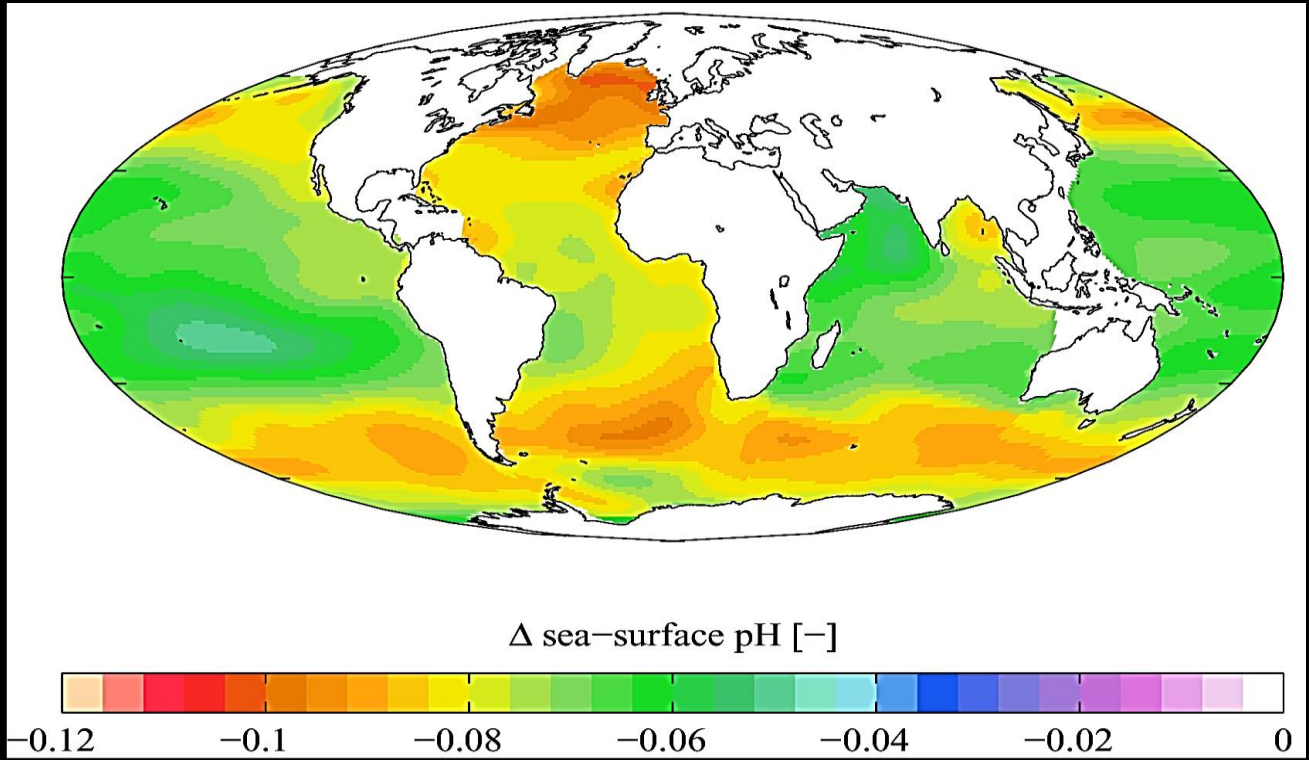
এতক্ষণ আমরা সাগরের জলের নানান গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করেছি। কেবল এড়িয়ে গিয়েছি pH প্রসঙ্গ। এবার সময় হয়েছে সাগরের জল আসলে কেমন-তা নিয়ে কথা বলার। সাগরের জল ক্ষারীয়। pH স্থানভেদে 7.7 থেকে 8.5 এর মধ্যে থাকে। এই ক্ষারত্বের জন্য দায়ী সাগরের জলের মাঝে দ্রবীভূত পদার্থগুলো। কিন্তু সাগরের pH এর কোনো ধ্রুবতা নেই। বিভিন্ন সময়ে এর মানের পরিবর্তন হয়েছে।

আর এই পরিবর্তনের সাথে জড়িয়ে আছে পানিচক্রের মতো আরেকটা চক্র, কার্বনচক্র–যে চক্রে সমুদ্র আর বায়ুমণ্ডলের মাঝে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আনাগোনা দেখানো হয়। বায়ুমণ্ডলের প্রায় ২৫% CO2 শোষণ করে সমুদ্র। এই CO2 জলে দ্রবীভূত হবার পর এর কিছু অংশ রূপ বদলে ফেলে। জল আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড মিলে তৈরি হয় কার্বনিক অ্যাসিড, যা ভেঙে বাইকার্বনেট আয়ন আর হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়। আর কিছু বাইকার্বনেট আয়ন ভেঙে কার্বনেট আয়ন আর হাইড্রোজেন আয়নে রূপ নেয়। এরা জলে থেকে যায় আর কিছু কার্বন-ডাইঅক্সাইড আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে, তবে যতটা গৃহীত হয় তার চেয়ে কম পরিমাণে। কারণটা আমরা আগেই জেনেছি।

এখন যদি কোনোভাবে সাগরে অনেক ক্ষারীয় পদার্থ মিশে pH বেড়ে যায়, তখন অতিরিক্ত OH- আয়নের সাথে মিশে pH স্বাভাবিক করার জন্য কার্বনিক অ্যাসিডগুলো ভেঙে অধিক হারে H+ আয়ন তৈরি

হয়। আবার সাগরে যদি অতিরিক্ত অ্যাসিডিটি দেখা দেয় তখন কার্বনেট আয়নগুলো বাইকার্বনেট, বাইকার্বনেট আর হাইড্রোজেন মিলে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয়, যা আবার কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। এভাবে H+ আয়নের পরিমাণ কমিয়ে pH স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার চেষ্টা চলে। আর সাগরের pH-এর মানের পরিবর্তনের সাথে সাথে এভাবেই জলে দ্রবীভূত কার্বন-ডাইঅক্সাইড, কার্বনিক এসিড, বাইকার্বনেট, কার্বনেটের পরিমাণের অদল বদল লক্ষ করা যায়–যেটা Revelle Factor দ্বারা প্রকাশ করা যায়। চিত্রে জেরাম প্লটে বাফার ফ্যাক্টরের একটা ছবি দেখানো হয়েছে। ক্ষারীয় অবস্থা থেকে জল যত অম্লত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, ততই কার্বনেট আয়নের পরিমাণ কমে গিয়ে বাইকার্বনেট আয়নের পরিমাণ বাড়ছে। জল যদি খুবই অম্লীয় হয়ে যায় তখন বাইকার্বনেট আয়নের পরিমাণ কমে গিয়ে CO2 এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। সহজ করে বলতে, ওপরের ঊর্ধ্বমুখী বিক্রিয়াগুলো বাম দিকে অর্থাৎ সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে সাগরের জলের অম্লত্ব বেড়ে গিয়ে দ্রবীভূত CO2 এর পরিমাণ যদি খুব বেড়ে যায়, সাগর কিন্তু সেসময় আর এই গ্রিনহাউজ গ্যাস শোষণ করতে পারবে না। সে কার্বন রিজার্ভারের তকমা পাল্টে হয়ে যাবে কার্বন এমিটার। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই দুর্বিষহ সময়ে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সুখকর নয়। মোদ্দাকথা, সাগরের জলের অম্লত্ব-ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণে, তার রসায়নে কার্বনচক্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
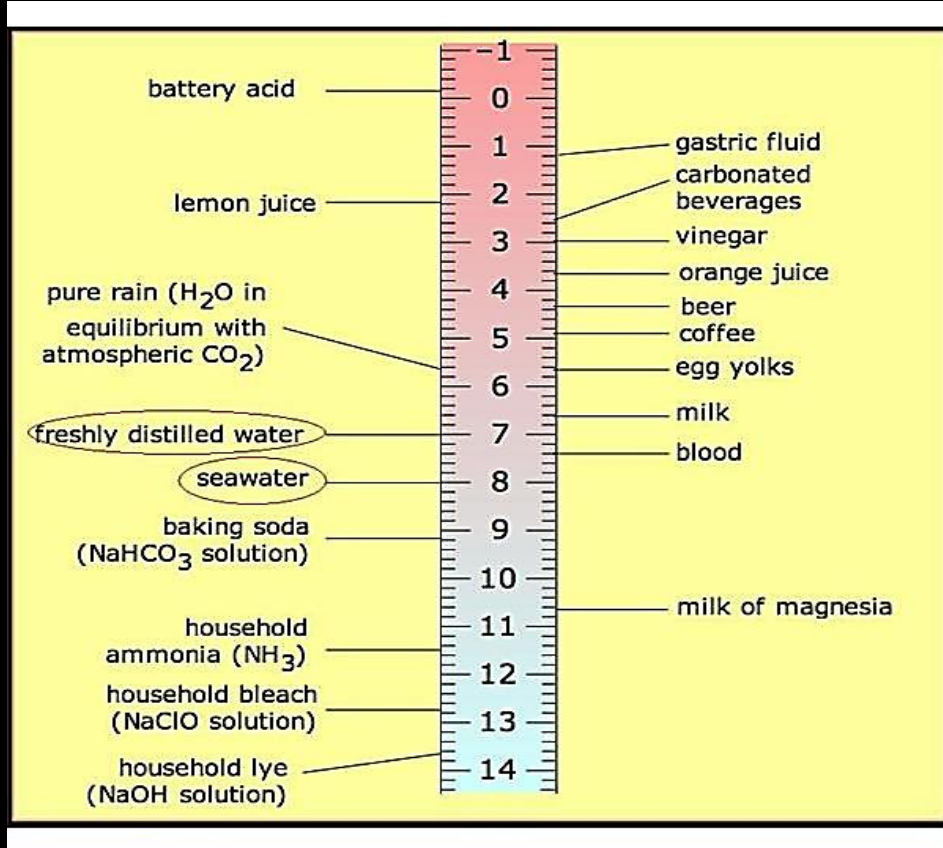
সাগরের যত গভীরে যাওয়া যাবে, তত কম pH এর দেখা পাব আমরা, কারণ গভীরতার সাথে সাথে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়।যেটা রেভেল ফ্যাক্টর অনুযায়ী CO_2, CO_3^{2-}, HCO_3^- হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন পরিমানে অবস্থান করে। যাইহোক, এখানে কথা হলো সাগরের সব উচ্চতায় $CaCO_3$পাওয়া যায় না।তার কারণ,তারা বিয়োজিত হয়।

সাগরের দেড় কিমি গভীরে গেলে শুরু হয় ক্যালসিয়াম স্যাচুরেশন হরাইজন,যাকে বলা হয় সাগরের অম্লীয়-ক্ষারীয় জলের সীমানা।এর পর থেকে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ কমতে থাকে।তাদের ক্ষয় শুরু হয়,যা গভীরতার সাথে আরো বেশি হারে শুরু হয়।আর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে চার কিমি অতিক্রম করলে সেই গভীরতাকে বলা হয়,CCD বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কমপেনসেশন ডেপথ।এর পরে pH মান ও চাপ এতো বেশি যে $CaCO_3$ আর যৌগাবস্থায় থাকতে পারে না,তারা খুব দ্রুত বিয়োজিত হয়ে Ca^{2+} ও CO_3^{2-}আয়নে রূপ নেয়।এই CO_3^{2-} আবার এক অণু জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে দুটো বাইকার্বনেট আয়ন সৃষ্টি করে।

$$CaCO_3 \rightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-}$$

$$CO_3^{2-} + H_2O + CO_2 \rightarrow 2HCO_3^-$$

এই CCD,ক্যালসিয়াম স্যাচুরেশন হরাইজনেও ওসান এসিডিফিকেশনের কুনজর পড়েছে।সাগরের pH কমে গিয়ে ইতোমধ্যে CCD এর সীমানা প্রায় ৫০-২০০ মিটার মতো উপরে চলে এসেছে,ভবিষ্যতে এই পরিমাণটা আরো বাড়তে পারে।তাই ক্যালসিফাইং জীবেরা এদিক দিয়ে খুব বিপদের মাঝে রয়েছে।খোলস ছাড়া অনেকেই বাঁচতে পারবে না।

ওশান অ্যাসিডিফিকেশন (Ocean Acidification):

কার্বনচক্রে মানুষ ব্যাপক হারে কার্বন-ডাইঅক্সাইড যোগ করতে শুরু করেছে ১৮ শতকের শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে। ১৮৫৯ সালের দিকে গ্রিনহাউজ ইফেক্ট, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদির ধারণা সামনে আসতে শুরু করে। গত শতকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে হইচই পড়ে যায়। হিমবাহ গলন, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হতে চলেছি আমরা। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল সমুদ্র এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনেকটাই কমিয়ে রাখবে। সাগরের রসায়ন নিয়ে গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে ভালো করে গবেষণা শুরু হলে আগের ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে শুরু করে। সাগরের pH এর মান গত আড়াইশ বছরে গড়ে 8.25 থেকে কমে গিয়ে 8.14 এ দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন মাত্র ০.১১ একক কমায় চিন্তার কী আছে ? তারা বরং pH নির্ণয়ের সূত্রটা মনে করুন।

$$pH=-\log H^+$$

pH এর মান বের করতে হয় জলে হাইড্রোজেন আয়নের মোলার ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদম ব্যবহার করে। আর এক্ষেত্রে অল্প একটু pH এর হ্রাস-বৃদ্ধিও অনেক। চলুন একটু অঙ্ক করে দেখি।

pH=8.25

or, $-\log H^+=8.25$

or, $\log H^+=-8.25$

or, $H^+=10^{-8.25}$ Mol

আবার

pH=8.14

or, $-\log H^+=8.14$

or, $\log H^+=-8.14$

or, H^+=10^8.14 Mol

অর্থাৎ, pH বেড়েছে ={(10-8.14)-(10-8.25)(10-8.25)100%

= 29%

অর্থাৎ, গত ২৫০ বছরে সাগরে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ প্রায় ২৯% বেড়েছে। আর সাথে সাথে pH এর মান কমেছে বা কিছুটা অ্যাসিডিটি বেড়েছে। এই অ্যাসিডিটি বাড়াটাই মহাদুশ্চিন্তার বিষয়। ২০০৩ সালে প্রথম আমরা ওশান অ্যাসিডিফিকেশন শব্দটার সাথে পরিচিত হই।

এখন দেখা যাক এতে দুশ্চিন্তার কী আছে। সাগরে কার্বনচক্রের কথা মনে করুন। H+ আয়ন কমানোর

জন্য কার্বনেট আয়নগুলো হাইড্রোজেন নিয়ে বাইকার্বনেট তৈরি হতে থাকে। আবার কার্বনেট আয়ন জল আর কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে ২টি বাইকার্বনেট আয়ন তৈরি করে। এখন সাগরের জলের pH নিয়ন্ত্রণে রাখার এই মরিয়া চেষ্টায় কার্বনেট বেচারার সংখ্যা কমতে থাকে। কার্বনেট আয়নের সংখ্যা কমে যাওয়াই অন্যতম এক চিন্তার বিষয়। কারণ ক্যালসিয়াম আয়নের সাথে কার্বনেট আয়ন ব্যবহার করে সামুদ্রিক জীবেরা তাদের খোলস, কঙ্কাল ইত্যাদি তৈরি করে। এখানে পর্যাপ্ত আয়নের সংখ্যা কম থাকায় এ কাজে অনেক সমস্যা হবে। তার ওপর pH আরও কমে গেলে তখন সামুদ্রিক প্রাণীদের খোলস তথা ক্যালসিয়াম কার্বনেটও ক্ষয়ে যেতে শুরু করে আর এই বিয়োজিত কার্বনেট হাইড্রোজেন নিয়ে বাইকার্বনেট হয়ে যেতে শুরু করে। তাই প্রবাল, শামুক, ঝিনুকসহ অন্যান্য ক্যালসিফাইং অর্গানিজমরা এখন চরম বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ কিন্তু শুধু তথ্য নয়। ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবালদের বৃদ্ধিতে ধীরগতি দেখা দিচ্ছে, যার কারণ ধরা হচ্ছে তাপমাত্রা ও অম্লত্ব বৃদ্ধি।

ধারণা করা হচ্ছে, ২১০০ সাল নাগাদ pH কমবে 0.3 থেকে 0.5 একক। বিজ্ঞানীরা ২১০০ সালে অনুমিত pH ও কার্বনেট লেভেলে pteropod বা টেরোপড (একটা সামুদ্রিক ছোট্ট শামুক জাতীয় প্রাণী, যাকে বলা হয় সমুদ্রের প্রজাপতি) রেখে তার ওপর পরীক্ষা করা হয়। ভয়ংকর ব্যাপার হলো, মাত্র ৪৫ দিনের মাঝেই তার খোলস জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

শুধু যে ক্যালসিফাইং অর্গানিজমদেরই বিপদের মুখোমুখি হতে হবে, এমন নয়। নন-ক্যালসিফাইং অর্গানিজমরাও সমস্যায় পড়বে। তাদের শিকার, গন্ধ বোঝার ক্ষমতা, এমনকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যাবে।

সাগরের গড় pH 7.8 এর কম ছিল সর্বশেষ আনুমানিক ৬৪-৬৭ মিলিয়ন বছর আগে, তবে সে সময় pH এর মান এখনকার মতো দ্রুত পাল্টায়নি। হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে, তাই অনেক জীবই মানিয়ে নেওয়ার সময় পেয়েছিল। তারপরও অনেক সামুদ্রিক প্রজাতি এই পরিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে এখন কয়েক শতকের মধ্যে সাগরের pH মানে, রসায়নে বদল ঘটেছে। তাই এক্ষেত্রে সামুদ্রিক জীবেরা পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে না। সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য কমে যাবে। আমাদের প্রোটিনের সোর্স, ওষুধ ইত্যাদি তৈরির একটা বড়ো অংশ আসে সামুদ্রিক জীব থেকে, যা আমরা হারাব। সাথে সাথে অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়বে। মানুষের কর্মসংস্থানের একটা বড়ো অংশ হারিয়ে যাবে। একমাত্র কার্বন নির্গমনের হার কমালেই ওশান অ্যাসিডিফিকেশন রেট কমানো যাবে। নইলে আমাদের একটা বড়ো এক্সটিংশন ইভেন্টের দর্শক হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

দক্ষিণ মহাসাগরের জীববৈচিত্র্য

ইমদাদুল হক আফনান

এটি দ্বিতীয় ছোটো মহাসাগর। সর্বোচ্চ গভীরতা ৭২৩৬ মিটার বা ২৩,৭৪০ ফুট (সাউথ স্যান্ডউইচ ট্রেঞ্চ)। এর মোট অ্যারিয়া ২০.৩৩ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। এর উল্লেখযোগ্য জীবপ্রজাতি হলো : দক্ষিণা এলিফান্ট সিল, ফুর সিল, ক্রিল, ১৮ প্রজাতির পেঙ্গুইন, harpagiferids, weddell seal ইত্যাদি।

I. Emperor penguin (এম্পেরর পেঙ্গুইন) :

এটি সকল জীবিত পেঙ্গুইন প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ও ভারী। লম্বায় প্রায় ১ মিটার এবং ভর হয় ২২.৭-৪৫.৪ কেজি। মাথা ও পিঠের পালক কালো। বুকের অংশ ফ্যাকাশে হলুদ, কানের নিচের অংশ উজ্জ্বল হলুদ। শিকার ধরার জন্য এরা ২০ মিনিট ডুবে থাকতে পারে এবং প্রায় ৫৩৫ মিটার গভীরতা অবধি ডুব দিতে পারে। এদের হিমোগ্লোবিনের বিশেষ ধরনের গঠনের ফলে এরা কম অক্সিজেন লেভেলেও অনেকক্ষণ টিকে থাকতে পারে, শক্তিশালী হাড় অনেকটুকু বায়ুচাপ সহ্য করতে পারে। অ্যান্টার্কটিক শীত সিজনে কেবলমাত্র এই প্রজাতিই ব্রিডিং করে। ব্রিডিংয়ের জন্য ৫০-১২০ কিলোমিটার বরফের পথ অতিক্রম করে। প্রায় ২০ বছর বেঁচে থাকে।

II. Antarctic toothfish (অ্যান্টার্কটিক টুথফিশ) :

এর বৈজ্ঞানিক নাম Dissostichus mawsoni। Dissostichus এসেছে গ্রিক 'dissos' (দ্বিগুণ) এবং 'stichus' (লাইন বা রেখা) থেকে। মিলিতভাবে এর দ্বারা দুইটি লম্বা পার্শ্বীয় রেখাকে বোঝানো হয়। এই মাছের ওপরের চোয়ালের বিশেষ ধরনের দাঁতের বিন্যাসের কারণে একে তিমির মতো দেখায়। এরা গড়ে ১.৭ মিটার লম্বা ও ১৩৫ কেজি ভারী হতে পারে। এটি মাঝ গভীরতার অন্যতম বড় মাছ হিসেবে অ্যান্টার্কটিকের ইকোসিস্টেমে তিমির মতো ভূমিকা পালন করে। এরা প্রায় ৫০ বছর বেঁচে থাকে।

সাগর থেকে আমরা অনেক কিছুই পাই।খাদ্য লবণের কথা না বললেও চলবে এখানে,কারণ আমরা সবাই এ সম্পর্কে জানি।সাগরের জল শুকিয়ে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করে আলদা করা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড।এছাড়াও $MgCl_2$,$CaCl_2$,KCl,$NaSO_4$ সহ আরো বেশকিছু লবণ সাগরের জল থেকে পাওয়া যায়।শধু লবণই নয়,বিভিন্ন ধাতু-অধাতুও বাণিজ্যিকভাবে সাগরের জল থেকে উৎপাদন করা হয়।সোডিয়াম,ম্যাগনেশিয়াম,ক্যালসিয়াম,পটাশিয়াম এসব ধাতুর একটা বড় অংশ আসে সাগরের জল থেকে।ব্রোমিন,ক্লোরিন এসব ধাতুও উৎপাদিত হয় সাগরের জল বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে।তবে সাগরের জলে মিশে থাকা সব মৌল আলাদা করা অত সহজ নয়।৭০ এর দশকে জাপান লিথিয়াম পৃথকীকরণের চেষ্টা করে,তবে তাদের সেই চেষ্টা মাঠে মারা যায়। তারও আগে ষাটের দশক থেকে সাগর থেকে ইউরেনিয়াম আহরণের ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়।প্রায় ৩০ বছর পর ৯০ এর দশকের শেষ দিকে জাপানে আলোর মুখ দেখে এই প্রজেক্ট।প্রজেক্ট আলোর মুখ দেখলেও,প্রজেক্টের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হন বিজ্ঞানীরা।এই প্রজেক্টে মাত্র ২ গ্রাম মতো ইউরেনিয়াম আলাদা করা সম্ভব হয়েছিল।

এবারে আসা যাক একটা কমন প্রশ্নের প্রসঙ্গে,সাগর থেকে কি সোনা আহরণ করা যায় না?হিসেব অনুযায়ী তো সাগরে আছে প্রায় ১৭৮১০০০০০০০কেজি সোনা,যার অর্থমূল্য প্রায় ৯১,৩০,৭৬৮ বিলিয়ন টাকা।সোনার খনি না খুঁজে জল থেকে আলাদা করে নিলেই তো হয়,তাই না?মজার ব্যাপার হলো এমন ধারণা জার্মানদের মনেও এসেছিল।তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঋণ শোধ করার জন্য এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখছিল। তবে তারা খরচের হিসেব-নিকেশ করে এই ভাবনাকে বাতিল করে দেয় ।তখন যে কারণ ছিল,এখনও প্রায় একই কারণ। সোনা আলাদা করার ব্যাপারটা এখনো খুব ব্যয়বহুল,এতো ব্যয়বহুল যে সোনা বিক্রি করেওখরচ উশুল করা যাবে না।খরচ বেশি হবে নাই বা কেন?আপনি প্রায় ৭৬,৯২৩১kg জল থেকে পাবেন মাত্র ১gram সোনা,তাই দিয়ে কি লাভ করা যাবে?

যেহেতু সাগরের জল থেকে আমরা কি পাই তাই নিয়ে কথা হচ্ছে,তাই একটা কথা না বললেই নয়।সাগরের জল থেকে খাবার জলও পাওয়া যায়।জলের চাহিদা মেটাতে ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে,যেখানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সাগরের নোনা জলকে আমাদের পানযোগ্য করে তোলা হয়।

সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড

জেনিথ রহমান

যদি বলি, আপনাকে নিয়ে যাব বিশ্বের দ্বিতীয় গভীরতম সোয়াচ দেখাতে—যাবেন তো ?

নাকি ভাবছেন কোথা থেকে না কোথায়-ই বা নিয়ে যাই ? খুব বেশি দূর নয়, এই ধরুন বাংলাদেশের কোথাও-ই। আপনাকে নিয়ে যাব চিরচেনা বঙ্গোপসাগরে। জি, ঠিক ধরেছেন। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত বিশ্বের ১১টি গভীরতম খাতের একটি 'সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড'। অন্য নাম 'গঙ্গা খাত'। অনেকের মতে এটি বিশ্বের ২য় গভীরতম সোয়াচ (Swatch)। অবাক হচ্ছেন ? দাঁড়ান ! দাঁড়ান !! অবাক হবার আরও যে অনেক কিছু বাকি।
চলুন তবে যাওয়া যাক আমাদের গন্তব্য 'সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড' এর পথে।
বাংলাদেশের একদম দক্ষিণে সুন্দরবন। আর ঠিক যেখানে সুন্দরবনের শেষ, সেখানেই শুরু বঙ্গোপসাগরের যাত্রা। আরও ১৮৫ কিলোমিটার এগিয়ে যাই চলুন। দেখতে পাবেন নীল জলরাশির এক নতুন দেশ, এক নতুন রাজ্য। নাম ? এটাই সেই 'সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড'—বাংলায় অর্থ দাঁড়ায় 'তল ছাড়া খাত'। বুঝলেন না ? মানে হচ্ছে, যার কোনো তল নেই। এর নাম রাখা নিয়ে এক রহস্য আছে। জানতে চান কী সেই রহস্য ?

১৮৬৩ সালে অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষ দিকে 'গ্যাডফ্লাই' নামের ২১২ টন ভরের এক গানবোট ভারত থেকে ইংল্যান্ডে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন নিয়ে যাবার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। সেই ডুবে যাওয়া নৌযানকে খুঁজতে এসেই সর্বপ্রথম দেখা মেলে এই গভীর খাতটির। ব্রিটিশরা তখন এর গভীরতা দেখে ভেবেছিল এই খাতের (সোয়াচ) কোনো তল নেই। এটা ভাবার কারণ হলো এই অঞ্চলের পানির গভীরতা হঠাৎ করেই অনেক বেড়ে গেছে। সেই থেকে এর নাম দেওয়া হয় ‘সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড’। অর্থাৎ তল ছাড়া খাত। সোজা কথায়, যে খাতের তল নেই। গবেষকরা এর একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত নামও দিয়েছেন-'সং'। না, গান এর ইংরেজি 'সং' এর কথা বলছি না। বলছি 'Swatch Of No Ground' থেকে আসা 'SONG' এর কথা। স্থানীয়রা একে 'নাই বাম' বলেই চিনে। কেন 'নাই বাম' ! কারণ তারা সাগরে ফুট কিংবা মিটারে হিসাব করে না। কীসে হিসাব করে বলুন তো? বাঁশের উচ্চতা অনুযায়ী 'বাম' দিয়ে। 'বাম', 'দশ বাম', 'বিশ বাম' আর ঐ জায়গা 'নাই বাম'—মানে এই জায়গাটির কোনো হিসাব নেই, যা কিনা মারিয়ানা ট্রেঞ্চের সাথে কিছুটা তুলনা করা যায়। বাংলায় বলা যায় অতলস্পর্শী। যা কোনো তলকে স্পর্শ করেনি।

কী ? যাবেন না সেই বিপুল পরিমাণ ধনরত্নের খোঁজে ?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ২৫ হাজার বছর পূর্বে তৈরি হওয়া এ খাতটি সামুদ্রিক অভয়ারণ্য। এছাড়াও এখানে এমন একটি বিষয় লক্ষ করা যায় যা পুরো বিশ্বে একমাত্র। অর্থাৎ পুরো পৃথিবীতে এমন দৃশ্য কেবল এখানেই ঘটে। এ নিয়ে কিছু বলার আগে এর সাইজ নিয়ে একটুখানি ধারণা দিই।

এর তলদেশ তুলনামূলকভাবে সমতল যা ৫ থেকে ৭ কি.মি. প্রশস্ত এবং এর প্রাচীরসমূহ ১২° কোণে হেলানো। সোপানের প্রান্তভাগে খাতের গভীরতা প্রায় ১,২০০ মিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা প্রায় ১,৩৪০ মিটার। গড়ে ৯০০ মিটার। সাগর অভিমুখে এই খাত প্রায় ১,৭৩৮ কি.মি. পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের মৎস্যভান্ডার হিসাবে পরিচিত এই গঙ্গা খাতে মাছের পাশাপাশি বিশালাকার তিমি, ডলফিন, হাঙরসহ বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর দেখা মেলে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে সব প্রাণী রয়েছে :

- ২ প্রজাতির তিমি
- ৬ প্রজাতির হাঙর
- ১০ প্রজাতির সামুদ্রিক পাখি
- ১ প্রজাতির কচ্ছপ
- প্রায় ৩০ প্রজাতির মাছ
- ৫ প্রজাতির shellfish
- 2 প্রজাতির seagrass

এ অঞ্চলের তিমিগুলো হলো : The common Minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*) এবং Bryde's whale (*Balaenoptera brydei*)। ডলফিনের মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে বড়ো ইরাবতী ডলফিন, ইন্দো-প্যাসিফিক ডলফিন (*Sausa chinensis*), ইন্দো-প্যাসিফিক বটেলনোজ ডলফিন (*Tursiops aduncus*) ও পাখাহীন ইম্পলাইস ডলফিন। আরও রয়েছে Hammer-headed shark (*Sphyrnidae*)। এছাড়া আরও বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল এই 'সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড'।

এটিই পৃথিবীর একমাত্র সোয়াচ যেখানে এই তিনটি স্তন্যপায়ী একত্রে দেখা যায়। জি, এটির কথাই এতক্ষণ বলছিলাম, যা আপনি আর কোথাও দেখতে পাবেন না। এটি তিমি, হাঙর, ডলফিন এবং কচ্ছপের প্রধান প্রজননক্ষেত্রও বটে।

এখানে আরও পাবেন বৃহৎ সামুদ্রিক পাখি The Masked booby (*Sula dactylatra*) যা 'Salidae' পরিবারের প্রাণী। একে অনেক সময় 'Blue-faced booby' নামেও ডাকা হয়।

এসে তো পড়লাম আমাদের গন্তব্যে। কিন্তু কী করে দেখা পাব সেই ডলফিন আর তিমিদের ?

সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর উড়ন্ত 'সী গাল' (Sea Gull) পাখির বিচরণ দেখে বুঝতে পারবেন ডলফিন বা তিমির অবস্থান। এটি 'Laridae' পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। 'সী গাল' পাখিকে পানির কাছাকাছি চক্কর দিতে দেখলেই ধরে নিবেন এখানে ডলফিন খেলা করছে। কী ? হলো তো ষোলোকলা পূর্ণ ?

কিন্তু আমরা যাবই বা কীভাবে সেখানে ? আচ্ছা, আমিই বলে দিই।

ঢাকা থেকে মংলা। সুন্দরবনের দুবলার চর বা সোনার চর থেকে এর দূরত্ব ৩০-৪০ কি.মি.। মংলা থেকে ট্রলারে করে সোজা 'সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড'। কেন ট্রলার ? সমুদ্রতীরের মানুষের জীবিকা নির্ভর করে মাছ ধরার ওপর। সেই মাছ

ধরতেই তারা ছুটে যান গঙ্গা খাতের কাছে। তাদের সাথেই যাওয়া যাবে সেখানে। এই অঞ্চলে একটা জায়গা আছে যেখানে রাতে মাছ ধরার ট্রলারগুলো অবস্থান করে। চাইলে একরাত কাটিয়েও আসতে পারেন ডলফিন বা বিশালাকার তিমির সাথে। কিন্তু এটি এখন মেরিন প্রটেক্টেড অ্যারিয়া। জনসাধারণের জন্য প্রবেশাধিকার সীমিত।
হ্যাপি জার্নি।

Reviewed game's name : **Hungry shark evolutio**n

Reviewer: Asif Aftab Shohag

Release Date : 10/24/2012

Genre : Action game

Developer : Future Games of London (FGOL)

Hungry Shark Evolution is Available on : IOS / Android

প্রথমেই বলব অফলাইন এই গেইমটির ধরণ নিয়ে।

নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে গেইমটি হাঙর কেন্দ্রিক। ক্ষুধার্ত হাঙর কেন্দ্রিক, যাকে বেঁচে থাকতে হলে খেয়ে যেতে হবে। হাঙরের খাবারের তালিকায় যা যা আছে তা খেতে থাকতে হবে এবং এর ফলে গোল্ড আর ডায়মন্ড জমা হবে, যা দিয়ে নতুন এবং শক্তিশালী হাঙর আনলক করা যাবে। একেক হাঙরের রয়েছে একেক রকম মাছ/প্রাণী খাওয়ার এবং সমুদ্রের আরও গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই গেইম খেলতে খেলতে শেখা যাবে সমুদ্রের প্রাণীদের সম্পর্কে। গেইমের মধ্যে সমুদ্রের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে নানান মাছ ও জীবজন্তু। কোনগুলো গভীর সমুদ্রের প্রাণী, কোনগুলো সমুদ্রের উপরিভাগে থাকে তা গেইমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। আবার কোন হাঙর সমুদ্রের গভীরে যেতে পারে আর কোন হাঙর পারে না, কোন হাঙর কী কী খেতে পারে তাও শেখা যাবে গেইম খেলতে খেলতে।

মিউজিয়াম অপশনে সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর নাম এবং ছবি দেওয়া আছে যা দেখে ওই প্রাণীর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ক্র্যাকেনসহ বেশ কিছু মনস্টার শার্ক এবং হাঙরকে আকাশে ওড়ানো, ভর্টেক্সের মাধ্যমে সমুদ্রে টর্নেডো তৈরির মতো অনেক ফিচার গেইমটাকে আরও ইন্টারেস্টিং করে তুলেছে। অ্যাক্সেসরি শপে রয়েছে এইসব আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র এবং এসব সম্পর্কে তথ্য। রয়েছে বেবি শার্ক, সমুদ্রের নকশাসহ আরও অনেক ফিচার।

বিভিন্ন হাঙরের খাদ্যশৃঙ্খল, সামুদ্রিক প্রাণীদের বিচিত্রতা, সব মিলিয়ে হাঙরের জীবন উপভোগ করার জন্যে **Hungry shark evolution** একটি পারফেক্ট গেইম।

ব্যাথিস্ফিয়ার, গভীর সমুদ্র দেখার প্রথম রোমাঞ্চ

এ আর মুবিন

একমাত্র মানবসম্প্রদায়ের মধ্যেই কিছু জিনিয়াসের দেখা মেলে, যারা পাগলামির সীমা অতিক্রম করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে! এই জিনিয়াস পাগলদের জন্যই বিজ্ঞান আজ লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়সম উচ্চতায় পৌঁছে গেছে! দিনশেষে এই অভাবনীয় উৎকর্ষের পেছনে কিছু একগুঁয়ে, পাগলাটে, কাজপাগল ও ভুলোমনা মানুষদের অবদানই সবচেয়ে বেশি। তাইতো কোনো এক পাগল হঠাৎ আনমনে গেয়ে উঠেছিলেন–বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের মেলা!

প্রকৃতিবিদ উইলিয়াম বিবে, ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি নিয়ে বারমুডার ননসাচ দ্বীপে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। উনার লক্ষ্য ছিল এখানকার গভীর সমুদ্রের ৮ বর্গমাইলের ভেতর যেসব প্রাণী আছে সেগুলোর ওপর রিসার্চ করা। সমুদ্রের গভীরে কী সব প্রাণী আছে সেগুলো জানার জন্য উনার মন খুব টানত। কিন্তু তখনকার দিনে জানালাবিহীন সাবমেরিনগুলো নামতে পারত ৩৮৩ ফুট অবদি! আর ভারী স্যুট-বুট পরে কোনো ডুবুরি ঝাপ দিতে পারত ৫২৫ ফুট পর্যন্ত, কিন্তু ভারী স্যুটের কারণে যেখানে নড়াচড়া করাই কষ্টকর সেখানে রীতিমতো পর্যবেক্ষণ করে ডাটা কালেক্ট করার স্বপ্ন দেখা তো বিলাসিতা। সুতরাং গভীর সমুদ্র লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাচ্ছিল। অনেক চিন্তাভাবনার পর উইলিয়াম বিবের মাথায় ক্যাপসুল

আকৃতির একটি সিলিন্ডারের নকশা আসে, যার ভেতরে বসে গভীর সমুদ্র পর্যবেক্ষণে যাওয়া যেতে পারে। তিনি এই ধারণাটি নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় আর্টিকেল আকারে প্রকাশ করেন। এই আর্টিকেলটি আরেক পাগলাটে ইঞ্জিনিয়ার ওটিস বার্টনের চোখে পড়ে যায়।

তিনি উইলিয়াম বিবেকে মেইলে জানিয়ে দিলেন– এত প্রচণ্ড চাপ ক্যাপসুল আকৃতির এই স্ট্রাকচার সহ্য করতে পারবে না। এবং এর সাথে বিকল্প কিছু নকশার আইডিয়াও পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বিবের কাছে মেইল মারফত আরো প্রচুর আইডিয়া আসছিল। ফলস্বরূপ বার্টনের আইডিয়া সেগুলোর নিচে চাপা পড়ে যায়! অবশেষে এক মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের মাধ্যমে দুজনের পারস্পরিক যোগাযোগ হয় এবং তারা একটি চুক্তি অনুসারে একসাথে কাজ করতে রাজি হলেন! চুক্তিটা হলো-

ওটিস বার্টন উনার জাহাজে করে উইলিয়াম বিবেকে নিয়ে যেখানেই সমুদ্র অভিযানে যান না কেন, সেই সব অভিযানের জাহাজের ভাড়া এবং সব খরচাপাতি উইলিয়াম বিবেকেই বহন করতে হবে।

তারপর? তারপর আর কী? একজন কাজপাগল প্রকৃতিবিদ এবং আরেকজন কাজপাগল ইঞ্জিনিয়ার একত্র হয়ে প্রথমেই গভীর সমুদ্রে যাওয়ার মিশনে নেমে পড়লেন।

১৯৩২ সালের ঘটনা। তাঁরা ব্যাথিস্ফিয়ার নামক একটি গোলাকার বস্তু বানালেন যার ভেতরে বসে রহস্যময় গভীর সমুদ্রের ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার ভেতরটায় উঁকি দেওয়া যাবে! এই গোলাকার আকৃতির ব্যাথিস্ফিয়ারের উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট, সমুদ্রতল পর্যবেক্ষণের জন্য তিন ইঞ্চি পুরো 'ফিউজড কোয়ার্টজ' নামক বিশেষ কাঁচের তৈরি ছোটো গোলাকার জানালা লাগানো ছিল। এই জানালার ওপর একটা স্পটলাইট বসানো ছিল গভীর অন্ধকার সমুদ্র দেখার জন্য। আর ছিল একটি দরজা।

সমুদ্রের নিচে যাবার কথা উঠলেই সবার আগে চলে আসে এর অসহ্য চাপের কথা, কথা হলো গভীর সমুদ্রে আসলে কী রকম প্রেশার? তাহলে আলোচনাটা সমুদ্রের ওপরিভাগ থেকেই শুরু করি। সমুদ্রপৃষ্ঠে, মানে সমুদ্রের পানি যে উচ্চতায় আছে সেখানে প্রতি বর্গইঞ্চিতে বাতাসের চাপ ১৪.৭ পাউন্ড, এর মানে সবদিক থেকে বাতাস আমাদের শরীরকে ১৪.৭ পাউন্ড প্রেশারে ঠেলছে, এটাকে বলে ১ বায়ুমণ্ডলীয় প্রেশার। তাহলে এই প্রেশারে আমরা কুঁকড়ে যাচ্ছি না কেন? কারণ আমাদের দেহের ভেতরের রক্ত-পানি আর কলকব্জাও ভেতর থেকে একই প্রেশারে বাতাসকে ঠেলছে, এই ভেতরের আর বাইরের ঠেলাঠেলিতে আমরা এখন সাম্যাবস্থার আছি, কোনো প্রেশার ফিল করছি না। (কথাটা আসলে হবে–"বাতাসের কোনো প্রেশার ফিল করছি না।" এছাড়া নিত্যদিনের প্রেশার, বিভিন্ন টেনশনের প্রেশার, ফ্যামিলির প্রেশার, গ্র্যাভিটির টানে পায়ের

ওপর সারা শরীরের প্রেশার তো প্রতিনিয়তই ফিল করে যাচ্ছি!!!)

যাইহোক, আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যতই নিচে নামব ততই আমাদের শরীরের ভেতরের প্রেশারের তুলনায় চারপাশের সমুদ্রের পানির প্রেশার শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আপনি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৩ ফুট নিচে গেলে আপনার ওপর সে যে প্রেশার দিবে সেটা সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রেশারের দ্বিগুণ। প্রতি ৩৩ ফুট নিচে যাওয়ার সাথে সাথে ১ বায়ুমণ্ডলীয় প্রেশার যোগ হবে। সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর খাদ মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতা ৩৬,২০১ ফুট। এই জায়গায় প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৮ টন প্রেশার। এই ভয়াবহ প্রেশারে আপনি কুঁচকে গুড়িয়ে পেস্ট হয়ে যাবেন।

তাহলে গভীর সমুদ্রতলে এত এত প্রাণী হেসে খেলে বেড়ায় কীভাবে? ওরা তো পচা পাইপের মতো চাপে পিষ্ট হয়ে ভেঙে গুড়িয়ে যায় না! আসলে এটাই সাইন্স। তিমির কথাই ধরা যাক, বেচারা মাছ না হয়েও তার প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য ২০ হাজার ফুট গভীরে চলে যেতে পারে! কীভাবে সম্ভব ভাই? সম্ভব, কারণ হলো তার দেহের স্ট্রাকচার। তার ফ্লেক্সিবল দেহটা সমুদ্রের অধিকাংশ লেয়ারে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। তার পাঁজরের

জয়েন্ট পয়েন্টগুলো ঢিলেঢালা আর কার্টিলেজ নরম হবার কারণে সংকোচন–প্রসারণ ঘটে তাই প্রচণ্ড প্রেশারেও মানিয়ে যায়। এদিকে আমাদের শক্ত পাঁজর এত চাপ নিতে পারবে না, ফেটে যাবে।

আবার ব্যাথিস্ফিয়ারে ব্যাক করি। ব্যাথিস্ফিয়ারের ভেতরে ছিল প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেনের বোতল, যোগাযোগের জন্য টেলিফোন এবং আলোকিত করার জন্য লাইট। ওহহো, ভেতরে থাকা ব্যাক্তিদের থেকে নিঃসৃত কার্বন–ডাই অক্সাইড শোষণ করার জন্য সোডা, চুন এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ট্রে ও রাখা ছিল। ব্যাথিস্ফিয়ারের সাথে বাঁধা থাকত ৩ হাজার ফুট লম্বা স্টিলের তার, যার অপর প্রান্ত সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের সাথে সংযুক্ত থাকত।

১৯৩০ সালের ২৭ মে ব্যাথিস্ফিয়ারের আবিষ্কারক ওটিস বার্টন এবং প্রকৃতিবিদ উইলিয়াম বিবে বারমুডা উপকূলে গিয়ে ব্যাথিস্ফিয়ারে চেপে পরীক্ষামূলকভাবে গভীর সমুদ্র থেকে ঘুরে আসেন। তারপর আসে ১৯৩২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলের সেই মাহেন্দ্রক্ষ। ব্যাথিস্ফিয়ারে চড়ে মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ১৫০০ ফুট নিচে নামেন দুজন। এর আগ পর্যন্ত মানুষ ডাইভিং স্যুট-বুট পরে বা সাবমেরিনে করে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ শ ফুট অবদি নামতে পেরেছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের রেডিয়ো মাধ্যমে এই ঘটনাটির লাইভ সম্প্রচার করা হচ্ছিল এবং তারা সমুদ্রের ১৫০০ ফুট নিচে থেকে টেলিফোনে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সরাসরি বর্ণনা দিচ্ছিলেন। সেই বর্ণনা প্রথমে ব্যাথিস্ফিয়ার থেকে তারের

মাধ্যমে ওপরে ভাসমান জাহাজের ট্রান্সমিটারে এবং সেখান থেকে সারাদেশে সম্প্রচার করা হয়।

গভীর সমুদ্র পর্যবেক্ষণের নেশা এই দুজনকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে পরবর্তী চার বছরে তারা আরো ৩০ বার গভীর সমুদ্রে নেমেছেন। স্বচক্ষে দেখে এসেছেন সেখানে বাস করা অদ্ভুত রহস্যময় সব প্রাণীদের, জেনেছেন তাদের বাস্তুতন্ত্র সহ আরো নানা বিষয়। ছিল প্রচণ্ড ঝুঁকি, ন্যূনতম ছোটো একটা ছিদ্র থেকেও মারাত্মক বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। কখনো কখনো উত্তাল সমুদ্রে তাড়াহুড়ো করে ব্যাথিস্ফিয়ার টেনে ওঠানোর সময় দুজন প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আহতও হয়েছেন। এসবে যেন তাঁদের মনোবল আরো বেড়ে যেত! ১৯৩৪ সালের ১১ আগস্ট তারা দুজন ২৫১০ ফুট গভীর পর্যন্ত নেমেছিলেন। ঠিক এর চারদিন পরই তারা আবার ৩০২৮ ফুট গভীরে ভ্রমণ করে আসেন। আর এর প্রায় ১৫ বছর পর বার্টন ৪৫০০ ফুট গভীরে গিয়ে নতুন রেকর্ড করেন।

প্রযুক্তির তুমুল অগ্রযাত্রায় ব্যাথিস্ফিয়ারের আজ প্রয়োজনীয়তা নেই, এর জায়গায় এসেছে অত্যাধুনিক সব সাবমার্সিবল। কিন্তু তাই বলে তো ভুলে গেলে চলবে না, রহস্যময় গভীর সমুদ্রে আলোর সার্চলাইট জ্বেলে চোখ মেলে তাকানোর ক্ষেত্রে এই ব্যাথিস্ফিয়ারই আমাদের অগ্রপথিক ছিল।

Sea Toad

সমুদ্র জিত সাহা

অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের হিমশীতল পানির নিচে আপনি ডুব দিয়েছেন, ছোট্ট সাবমেরিনে। আড়াই কিলোমিটার নিচে গিয়ে তল খুঁজে পেয়ে সেই তলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কোনো প্রাণীর দেখা পাওয়া যায় কি না দভেবে। ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ল ছোটো সাইজের এক প্রাণী, স্থির বসে আপনার দিকে বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে, নড়েচড়েও না। মরে গেল না কি ? আরও কাছে গেলেন আপনি, সাইজ ১২ ইঞ্চির বেশি হবে না। যতই কাছে যাচ্ছেন ততই কনফিউজড হচ্ছেন, ব্যাটার দেখি পা-ও আছে, ব্যাঙের মতো দেখা যায়। এত নিচে ব্যাঙ সম্ভব না কি) ! না এটা ব্যাঙ না, মাছ-ই। আপনি দেখা পেয়েছেন সমুদ্র তলদেশের অসীম ধৈর্যশীল শিকারি টোড ফিশ বা ব্যাঙ মাছের। এত গভীরে, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না; লাইফ খুবই চ্যালেঞ্জিং। খাদ্যের অভাব ! ফাইটোপ্লাঙ্কটন নেই, ছোটো-বড়ো, মাঝারি সব প্রাণীর খাবারের প্রচণ্ড অভাব এখানে। ওপর থেকে বিশাল প্রাণীর মৃতদেহ নিচে পড়ে, আর সেটার ওপর ভরসা করে থাকতে হয় বেশিরভাগ প্রাণীদের। এনার্জীর এরকম সংকটে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে একটুও শক্তি খরচ করা পোষাবে না। এখানকার প্রাণীগুলো সব তাই এরকম। তলদেশের জগতটা স্লো মোশনে চলে। এই ধরুন আমাদের ছোট্ট কিউট ব্যাঙ মাছের কথা। অসীম ধৈর্য নিয়ে মাটিতে বসে থাকতে থাকতে জেনারেশনের পর জেনারেশনের মিউটেশনে গজানো পা ন্যাচারাল সিলেকশনে টিকে গেল। বিবর্তিত হয়ে এখন হলো পা-ধারী মাছ! কারণটা স্পষ্ট, এত নিচে সাঁতার কাটার চেয়ে পা দিয়ে নড়াচড়া করতে কম শক্তি খরচ হয়, যেহেতু মাটিতে হেঁটে চলে। ফলে পা-ধারীগুলো টিকে গেল, পা-হীনগুলো না। যারা বলেন বিবর্তনে মাছের পা গজায় না কেন–আবার তাদের চোখে আঙুল দিলো ! এই প্রসঙ্গে গেলে আবার বিশাল আলাপ, পা-ধারী মাছের অভাব নাই। যাহোক, গভীর সমুদ্র প্রসঙ্গে আসি আবার। যা বলছিলাম, এখানকার প্রাণীরা অসীম ধৈর্য নিয়ে বসে থাকে, শিকার কখন কাছে আসবে আর ঝাঁপিয়ে পড়বে এই অপেক্ষায়।

Sixghill Shark

সমুদ্র জিত সাহা

সমুদ্র তলদেশে মাটির কাছ দিয়ে স্লো মোশনে সাঁতরে চলছে বিশালদেহী এক হাঙর। ৬ মিটার লম্বা দানবের শক্তি অপচয় করার মতো খাবার নেই, শেষ ক' মাস আগে খেয়েছে কে জানে। খিদে পেয়েছে, সামনে কিছু আসলে নিস্তার নেই। সামান্য আলোতে দেখার জন্য যথারীতি বিশাল বিশাল চোখ হয়েছে। সেই চোখে পড়ল তিমির মরদেহ, সার্ফেস থেকে কোনো কারণে মারা যাওয়া এক তিমির লাশ পড়েছে তলদেশে। ভোজনবিলাস চলছে সব মাছেদের, যোগ দিলো আমাদের দানবও। টন টন মাংস, সবার জন্য খাবার আছে। পেট ভরে খেয়ে নিল, হালকা মারামারির পর আরও কিছু শার্কের সাথে ভরা পেট নিয়ে আবার স্লো মোশনে সাঁতার শুরু করল। কে জানে আবার কত সপ্তাহ পর খেতে পারবে। শক্তি অপচয় করার কোনো মানেই হয় না।